

পরকায়া প্রেম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত



পরকীয়া প্রেম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রাপ্তিষ্ঠান
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :

শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :

অক্টোবর, ২০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণ :

মার্চ, ২০০৯

তৃতীয় সংস্করণ :

সেপ্টেম্বর, ২০১২

প্রচ্ছদ :

সত্য চক্ৰবৰ্তী

অলংকরণ :

শ্রীবিদ্যা অশোক

মুদ্রাকর :

হিন্দুস্থান আর্ট এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২৪, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : আশি টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

‘পরকীয়া’—এই শব্দটির মধ্যেই প্রচলিতভাবে
লুকিয়ে রয়েছে প্রেমের কথা, প্রেমের গন্ধ। মানুষের,
বিশেষ করে সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকার রঙে বইতে
থাকে যে প্রেমময় রসধারা, জীবনকে ঘিরে আমৃতু
যার প্রভাব থেকে যায়। রবীন্দ্র-শরৎ উভর বাংলা
সাহিত্যে বিশেষ করে কল্পোল এবং কল্পোল-পরবর্তী
সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে। আর
বর্তমান সমাজে তো কোনো প্রেমেই নিষিদ্ধের তকমা
নেই, এক কথায় সারা বিশ্বের প্রেম একমুখী। বর্তমানে
তথাকথিত ‘লিভ-টুগোদারের’ সময় তো প্রেম বড়ই
অসহায়—নির্লজ্জ। এত কিছুর পরেও পৃথিবীতে প্রেম
ছিল, আছে, থাকবে, তাই পৃথিবী যতই আগুনিক তথা
সভ্য হোক না কেন প্রেম এবং পরকীয়া প্রেম সব
যুগেরও অঙ্গ।

বর্তমান সংকলনটিতে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত
লেখকের লেখাকে স্থান দিতে পারা গেছে। যদি বর্তমান
সংকলনটি পাঠকদের ঢাপ্টি দিতে পারে তবেই আমাদের
শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করা হবে।

শ্যামাপদ সরকার

সূচীপত্র

মানভঞ্জন	৫
ল্যাভেন্ডার	১৫
চরিত্রহীন	২৪
নুরবানু	৩৩
রানী সাহেবা	৪২
সুবর্ণা	৫৯
স্বামী হওয়া	৬৫
ফিস্টাইল	৮৩
আমরা তিনি প্রেমিক ও ভুক্ত	৮৭
লোলিটা	১০০
প্রেমিক ও স্বামী	১০৭
প্রেমিক	১১৫
দিচারিতা	১২২
এক কস্বলের নীচে	১২৯
ব্যাভিচারিগী	১৩৬
পরকীয়া	১৫০
পরপুরুষ	১৫৬
করুণ শঙ্খের মতো	১৬৫
জ্যোৎস্নায় শঞ্চালিল	১৭২
একান্ত গোপনৈ	১৮২
অবৈধ	১৯১
পরকীয়া প্রেম	২০০
ডেকামেরন	২০৯
লাভ আভ সেৱ অফ এ গুড গাল.....	২২৫
টম জোন্স	২৩০
রোমান্স	২৩৬



মানভঙ্গন

রবীন্দ্রনাথ·ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে শুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ, ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট পাক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশবিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেডিং টাঙানো রহিয়াছে, কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ঘোড়শী গৃহস্থানিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেওয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাত আলোকরশ্মির ন্যায়, বিশয়ের ন্যায়, নিম্নাভঙ্গ চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছাসে আপনি আদ্যোপাস্ত ত্রঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহ্য বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিতে, তাহার চক্ষু চরণের উদ্ধাম ছন্দে, নৃপুরনিক্ষণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্ত ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছুল্লভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। আয় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বন্দে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়ইয়া সে ছাদের উপরে অকারণে চক্ষু হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনো এক অঞ্চল অব্যুক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যক্ষ

ন্তৃ করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গিতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী এক আনন্দ আছে, সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উন্নত রজন্মেতে অপূর্ব পুলক-সহকারে বিচির আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাতে গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহার সুলিলিত বাহুর ভঙ্গিটি পিঞ্চরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাতে সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, চরণাশুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘূরিয়া আঁচল ঘূরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা যিন যিন করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে, চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুস্তদস্তপঞ্জিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মন্তকের পশ্চাতে বেশীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া যখন হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনীগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ন্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পৃণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইঙ্গুল পালাইয়া তাহার সুপু অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রশ্যালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিত। ইঙ্গুলের বিশেষ বস্তুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তৃচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিযানেরও অস্ত্রাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তঙ্গায় শীত্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্ম তাহার ক্ষেত্রে বাসা করিল। তখন ক্রমে অঙ্গগুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিদ্বের একটা উন্দেজনা আছে, মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত

বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অঞ্চলের পরিমাণে সেই একজাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্সনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলি সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সেজন্য অনেক লোক বিষয়নাশ, খণ্ড, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কিব নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিবে অধিত্বীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্তব্যের প্রতি অঙ্গ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন ঘন্টাঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী, সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রতুপট্টীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আঙ্কেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত ; মাঝে মাঝে তাহারা প্রতিবাদ করিত এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না। সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অক্ত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতাঞ্জ কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—‘দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে’, এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলঙ্কারিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপদ্মবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুঠিত দাসের ছবি তাহার কঞ্জনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দৃটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন

সানুনাসিক কৃত্রিম কানুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে ‘প্রাণনাথ’ ‘প্রাণেশ্বর’ করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধূতির উপর ওয়েস্টকোট পরা, ফুলমোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী ‘এঙ্গেলেন্ট’ করিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনো তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর-কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সামুয় কৌতুহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশ্যে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রকুঁষ্ঠিত করিয়া রামনাম-উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মাজনীয় ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কর্দর্য মৃত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গিতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সমন্বেগে সেই একই রূপ বিধান হিঁর করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিপ করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুইয়া বারংবার কহিল, বন্ধুর্ধাবৃত দন্ধকাঠের মতো তাহার নীরস এবং কৃৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া জুলিতে লাগিল।

অবশ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উভ্যেজনা বেশি। তাহার হৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মন্দু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদ্যসংগীতমুখরিত দৃশ্যপটশোভিত রঞ্জত্বমি তাহার চক্ষে দ্বিশুণ অপরাপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অঙ্গপুর হইতে এ কোন এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রাণ্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন ‘মানভঙ্গন’ অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চতুর্থল দর্শকগণ মুহূর্তে হিঁর নিষ্ঠক হইয়া বসিল, রঞ্জমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্ৰজঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্ৰশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধৰনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহীন উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই

সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায় এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্তৃত হইয়া গেল ; মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বঙ্গনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ শাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভৌতিক্যে কানে কানে বলে, ‘বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো ; দাদাৰাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।’ গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে ; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থাইতেছে না ; কত অনুনয়বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে রাখা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই ; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে হ্রিয়ে করিল যে, এমন করিয়া নির্দূরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেবল দোর্দণ্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙমণ্ডের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ছান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল ; গিরিবালা মন্ত্রমুক্তির মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল অভিনয় বৃক্ষ ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে। রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, ‘বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।’

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিটচিমিট করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রাণে নির্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অঞ্চ অঞ্চ দুলিতেছে ; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য—যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটাদের মুখের রঙচঙ্গ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে

পাইল। কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমৃচ্ছ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্গিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুক্খদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত—বিশ্ববিজয়ীনী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথম যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উচ্চত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জজরিত চিন্তে মনে করিল, যদি কখনো এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রাপে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণখবের প্রাপ্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়া দুর্ভিত হইয়াছে। সে আপন প্রমত্নতার বড়ের মুখে ধূলিধৰজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাঁদের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নৃতন নৃতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উচ্চাদনা-সঞ্চার করিত—বলমল করিয়া, রুনুবুনু বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবুন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কঢ়ী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বসের সহিত বলিতেছিল, ‘আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।’ গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, ‘বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গান্টা গা।’

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাঁদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃদ্ধাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া হঠাতে গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধো অনেকখনি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া উর্ধ্বর্ষাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো শুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না, শিথিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না। কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, ‘কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী’ সংগীতহীন নীরসকষ্টে গোপীনাথ বলিল, ‘একবার চাবিটা দাও দেখি।’

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এতদিনের বিছেদের পরে এই কি প্রথম সন্তান্যণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়ায়ই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিন্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশ্চীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী ঝীকে বলে, ‘ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি।’ তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই—তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো হ হ করিয়া বহিয়া গেল—টব-ভরা ফুটস্ট বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উঠিলে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, ‘চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।’ আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহাতে সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, ‘আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।’

গিরিবালা কহিল, ‘আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা-কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।’

গোপীনাথ বলিল, ‘সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।’

গিরিবালা বলিল, ‘তবে আমি চাবি দিব না।’

গোপী বলিল, ‘দিবে না বৈকি। কেমন না দাও দেখিব।’ বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে চুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সের দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিদুরের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে ; চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি

ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল। গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, ‘চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।’ গিরিবালা উন্নতমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবক্ষ গলা হইতে কষ্টী, অঙ্গুলি হইতে আঁটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পম্পীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিষ্ঠক হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অথগু শাস্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অস্ত্বের চীৎকারধৰনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুস্থ জ্যোৎস্নানিশ্চিথিনী অক্ষয়াৎ তীব্রতম আতঙ্গে দীর্ঘ বিদীর্ঘ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদ্বারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অর্থচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আস্থহত্যা করিয়া এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না ; পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহ কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, ‘আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।’ তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলে নিষেধ করিল ; কিন্তু বাড়ির কঢ়ী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কতদিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব খিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে ‘মনোরমা’ নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্থরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনো নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশ্যে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মন্ত্রবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশেধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব হইতে নৃতন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অঙ্গর্ধান হইল তাহার আর সঙ্গান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ আকুলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নৃতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর থরে না। শত শত লোক দ্বারা হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর ধাকিতে পারিল না। বিদ্রোহে এবং কৌতুহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরঙ্গভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচন্দ বিনম্র সংকুচিতভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগ্রহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্ধলোভে কোনো এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই। আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে—তাহার নিরূপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মণিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গ্রহে পালিত হইয়াছে। বক্ষাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সঙ্গান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নৃতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানতঙ্গের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণে গোপীনাথ নিষ্ঠুর হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্ষাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা চুচাইয়া, গুপ্তের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনিবর্চনীয় গর্বে গৌরবে

গ্রীবা বক্ষিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্ঞপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সূনীঘর্কাল কম্পাওিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ‘গিরিবালা’ ‘গিরিবালা’ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাতে মর্মাণ্ডিক ত্রুক্ত হইয়া দর্শকগণ ইংরেজিতে বাংলায় ‘দূর করে দাও’ ‘বের করে দাও’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকষ্টে চীৎকার করিতে লাগিল, ‘আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।’

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।



ল্যাভেড়ার

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

সঞ্চাবেলাটা বেশ আনন্দে কাটল। ভদ্রলোক স্বয়ং ইংরেজী গান গেয়ে শোনালেন। হাসির গান, কিন্তু নিছক হাসির নয়। ফল্গু ধারার মতো প্রচম ছিল একটা করুণ মধুর সুর। আর তাঁর স্ত্রী শোনালেন সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত। ‘মায়ার খেলা’ তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রথম বয়সে। তারই অবিশ্বরণীয় অবশেষ। আর তাঁর দুই কন্যা শোনালেন মীরার ভজন। দিলীপকুমারের ঢঙে। মাতানো গানে ‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’। মনে মনে আমিও তাঁদের সঙ্গে মিলে গেলুম।

দেশবন্দনার রেশ যখন নিঃশেষ হয়ে এলো তখন আমি ধীরে ধীরে বিদায় নিতে উঠলুম। এসে ছিলুম তাঁদের ওখানে, কল’ করতে।

তার পরে তাঁরা চার জনে মিলে গাইলেন অতুলপ্রসাদের গান-পরিচয় দিতে ও নিতে। ভদ্রলোক ওখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল। আর আমি ভার্ম্যমাণ ভ্যাকেশন জজ।

“সে কী! আপনি খেয়ে যাবেন না?” বললেন ভদ্রমহিলা। “আপনার জন্যে সমস্ত তৈরি।”

আশ্চর্য হয়ে বললুম, “কিন্তু ওদিকে সারকিট হাউসে—”

“আমি আগে থাকতে বারণ করে পাঠিয়েছি।”

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমার হাঁড়ির খবর বার করেছিলেন। আমি যে নিরামিষ খাই তাও তাঁর অজ্ঞান নয়। আমার কোনো অজুহাত খাটল না। বসতেই হলো আবার।

খাবার টেবিলে দেখলুম ভদ্রলোক খোশগল্পের রাজা। মন্টেগোমরী কী বলেছিলেন চার্টলকে। চার্টল কী বলেছিলেন তার উত্তরে। এসব তো শুনতে হলোই, তার উপর শুনতে হলো স্টালিন কেমন হারিয়ে দিয়েছিলেন চার্টলকে ভোজন-প্রতিযোগিতায়। সে ভারী মজার কথা। তাঁর মতো রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারব না তো, গঞ্জটা মাটি করব। থাক, বলব না।

আহারাস্তে অমনি চলে যেতে নেই, একটু দেরি করতে হয়। বসবার ঘরের এক প্রাণে বিশাল বৃক্ষশেলফ ছিল। সেখানে গিয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ইংরেজী ও ফরাসী বই বেশীর ভাগ। কত কালের পুরানো বই। আজকাল সে-সব বই দেখাও যায় না। দেখতে দেখতে একখানা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ল্যাভেন্ডারের পঞ্জব। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। হাত দিলে গুড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাতে ল্যাভেন্ডারের পঞ্জব পড়তে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে নামিয়ে রাখলুম বইটা। অমনি তিনি ওখানা সরিয়ে রাখলেন একেবারে নাগালের বাইরে। একটা টুলের সাহায্যে।

হঠাতে তাঁর এই ব্যবহারে আমি হততস্ফ হয়েছিলুম। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার দুটি হাত ধরে মাফ চাইলেন। তখন তাঁর দুই চোখের চাউনি যা হলো তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কী যে করণ আর কাতর আর ত্বষিত! আবেগপূর্ণ কষ্টে বললেন, “আপনি এখনো যুবক। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে আপনার সামনে। আর আমি বিগতযৌবন। আমার জীবনও তো শেষ হয়ে এলো।”

কেন ও কথা বললেন ভাবছি। তিনি বলতে লাগলেন, “আমার জীবনে যা গেছে তা গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। ওই যে ল্যাভেন্ডার ও যদি ধূলো হয়ে ধূলোর সঙ্গে যায় তা হলে আর এ-জীবনে ল্যাভেন্ডার উপহার পাব না।”

এবার মার্জনা চাইবার পালা আমার। বললুম, “আমাকে ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারিনি। না বুঝে অপরাধ করেছি।”

“না, না, অপরাধ কিসের! বলতে গেলে আমারই অপরাধ, আমি ওটা অতিথির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। ক্ষমা করবেন তো!” রংধন কষ্টে আবেদন করলেন।

আমি তাঁর স্তুর কাছে বিদায় চাইলুম। ভদ্রমহিলা কফি তৈরি করছিলেন। শুনতে পাননি আমাদের কথাবার্তা। তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে দু'এক চুম্বক দিয়ে শুভরাত্রি জানালুম। তাঁকে ও তাঁর কন্যাদের। ভদ্রলোকের দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, “চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।”

এগিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সারকিট হাউস পর্যন্ত হাঁটলেন। বেশী দূর নয়, তা হলেও প্রত্যাশার বাইরে। সারকিট হাউসে পৌঁছে আমি বললুম, “বেয়াদবি মাফ করবেন। সারা সঞ্চ্চা মনে হচ্ছিল আপনার মতো সুবী কে! কিন্তু দেই ল্যাভেন্ডারের ঘটনার পর অন্য রকম মনে হচ্ছে। ওটা না ঘটলেই ভালো হতো।”

তিনি একটু বিশ্রাম করবেন বলে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, “সুখ অনেক

রকম আছে। এক রকম সুখ আজ আপনি দেখলেন। সত্যি তার মতো সুখ নেই।
কিন্তু সেও তার মতো নয়। সেই ল্যাভেডার উপহার পাওয়ার মতো।”

আমি তাঁকে একটু উক্ষে দিলুম। তিনি বললেন, “শুনবেন নাকি ও কথা?”

তিনি এক গ্লাস জল চেয়ে নিলেন; জল রাইল তাঁর হাতের কাছে। মাঝে
মাঝে ভিজিয়ে নেন আর গঞ্জ বলেন।

২

দু'চোখ বুজে দুই চোখের উপর দুই হাত রেখে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে
বসলে প্রথমটা সব অঙ্ককার দেখায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে
ফুটে ওঠে সাঁবোর শুকতারা। সাঁবোর শুকতারার মতো শুভ সুন্দর একখানি মুখ।
শুভ সুন্দর শুচি। অঙ্ককারে ঐ একটি মাত্র তারা।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পাঁচিশ বছর আগে। লগুনে তথনকার দিনে
আমাদের বাঙালী সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বেলসাইজ পার্কে মিস্টার
ও মিসেস তরফদারের বাড়ী। অত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা রিসিভ করতেন।
সকলে অবশ্য সব শনিবার যেত না। কিন্তু অন্য কোথাও এনগেজমেন্ট না থাকলে
আমি অন্তত আধ-ষষ্ঠার জন্যে হাজিরা দিয়ে আসতুম।

এমনি এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা। মিস তরফদারের বাঙালী বলে
তার পরিচয়। শুনলুম বেডফোর্ড কলেজে পড়ে। শনিবারটা আয়ই তরফদারদের
সঙ্গে কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার মেয়াদ। সাধারণতঃ ছাঁটার মধ্যে
ফিরে যায়। কিন্তু সেদিন কী জানি কেন আটটা পর্যন্ত আটকা পড়েছিল।

আমি উঠছি দেখে মিসেস তরফদার বললেন “বর্ণণ, তোমাকে একটা কাজ
দিতে পারি? কিছু মনে করবে না তো?”

“কাজ দেবেন, সে তো আমার সৌভাগ্য, মাসিমা। কিছু মনে করব কেন।”

“তা হলে শোন। এই যে পূরবী দেখছ একে পৌছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।
আজ এর খুব দেরি হয়ে গেছে। তুম যদি দয়া করে পৌছে দাও তো—”

“চিরকৃতজ্ঞ হবেন তো? আচ্ছা, আমি এই সুখকর কর্তব্য স্বীকার করছি।”

সেখানে আরো কয়েক জন গ্যালাট যুবা ছিল। তারা কেবল ফষ্টি-সষ্টি করতে
জানে, কিন্তু হাতের তাস ফেলে একজনও উঠবে না। বসে বসে দু'কথা শুনিয়ে
দিল আমাকে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে পূরবীকে তার ফারকোট গায়ে
দিতে সাহায্য করলুম ও বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলে ধরলুম।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল মনে আছে। ছাতা ছিল আমার সঙ্গে। তুলে ধরলুম
ওর মাথায়। ওর ছাতা ও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছল। ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবার
মতো সময় ছিল না। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে ওকে ধরতে হবে।

স্টেশনে পৌছে পূরবী বলল, “আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এটুকুরও দরকার ছিল না। তবে আপনি এই দিকে আসছিলেন বলে মাসিমা আপনাকে এ কাজ দেন। ঠাঁর মতে লগুনের রাস্তায় বিদেশিনী মেয়েদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয় এত রাত্রে।”

আমি বললুম, “মাসিমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।”

সেদিন আমি ওকে বেডফোর্ড কলেজ পর্যন্ত পৌছে দিলুম। পথে ওর সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা হলো। ভারী ভালো লাগল ওর সঙ্গ, ওর স্বত্ব। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের সুন্দর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে যাদের হয় না তারাই বেশী লেখাপড়া করে ও তাদের কেউ কেউ বিলেত পর্যন্ত আসে। কিন্তু পূরবীকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেল। সে ডানাকাটা পরী না হলেও তার রূপ দুর্দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো।

সেদিন বাসায় ফিরে গিয়ে সারা রাত তার কথা ভেবেছি ও তাকে স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে তার সঙ্গে আমার আলাপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আছে এর পিছনে গ্রহতারার চক্রান্ত। নইলে কেনই বা সে আটটা অবধি আটকা পড়বে, এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন তার পার্শ্বরক্ষী হতে হবে? অদৃষ্ট আমাদের দুর্জনকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। তা ছাড়া আর কী এর ব্যাখ্যা।

পরের শনিবারের জন্যে উৎকর্ষিত হয়ে কেমন করে যে সাতটা দিন পার করে দিলুম তার হিসেব নেই। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি যাবার জন্যে পূরবী তৈরি হয়ে বসে আছে। মাসিমা বললেন, “বরণ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো, একটু কিছু খাও। জিতেন সঙ্গে যাক পূরবীর।”

“না ; মাসিমা, কাউকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। এই তো সবে ছ’টা বাজল।” পূরবী একই যেতে উদ্যত।

এক খাব্লা চীনে বাদাম মুখে পুরে এক রাশ চকোলেট পকেটে ভরে হাঁড়মাউ করে আমি বললুম, “আমার খাওয়া হয়েছে, মাসিমা। আমিই যাচ্ছি এর সঙ্গে।”

জিতেন তো আমার দশা দেখে হেসে ফেলল। ঝুঁমাল দিয়ে আমার দুটো হাত বেঁধে বলল, “চলো, তোমাকে পুলিশে দিয়ে আসি বমাল সমেত।”

মাসিমা বললেন, “বমাল মানে কি চকোলেট না—” পূরবীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

কয়েক শনিবার পরে পূরবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচ জনে মেনে নিল। পূরবী আমার গার্ল, আমি তার beau ; আমাদের বিয়ে হবে একদিন-না-একদিন। উৎসাহ এল মাসিমার কাছ থেকে। কিন্তু পূরবী এ বিষয়ে নীরব। সে কিন্তু আমার সঙ্গেই মেশে সব চেয়ে বেশী, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায়,

বাসের উপর তলায় বসে শহরে বেড়িয়ে আসে। অর্থাৎ আমার সঙ্গে এমন একটা দুরত্ব রেখে চলে যে আমি অবাক হয়ে যাই তার ব্যবহার দেখে। আর পাঁচ জনে আমাকে মনে মনে হিংসা করছে, কিন্তু আমি কি তাদের হিংসার ঘোগ্য!

ভেবেছিলুম পূরবীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, আমার সঙ্গে এনগেজমেন্ট সম্বন্ধে তার কী মত। কিন্তু কিছুতেই ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না। শেষে একখানা চিঠি লিখে সাত পাঁচ ভেবে ডাকে দিলুম।

জীবনে সেই আমার প্রথম প্রেমপত্র। তাতে শুকে কী বলে সমোধন করেছিলুম, শুনবেন? এঙ্গেল বলে। বলা বাহ্যিক চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা।

পূরবী তার উপরই দিল না।

পরে যেদিন দেখা হলো জানতে চেয়েছিলুম চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে কি না। ওর মুখখানা আরম্ভ না হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, “তুমি কি জানতে না যে আমি হস্টেলে থাকি? আর কখনো অমন কাজ করো না।”

প্রথম পত্রের এই পরিণামের পর দ্বিতীয় পত্র লিখতে আমার সাহস হয়নি। কাজ কী এনগেজমেন্টের প্রসঙ্গ তুলে? বাক্সে না হোক, কার্ডে কি আমরা এনগেজড নই? পূরবী আমায় বাক্য দেয়নি, আমিও দিইনি তাকে। কিন্তু আমরা তো পরম্পরের মন বুঝি। তবে আর কী? লোকটা আমি কৃত্রিমতার পক্ষপাতী নই।

এনগেজড না হয়েই আমরা এনগেজড বলে বক্রমহলে গৃহীত হলুম। তবে নিজেদের কাছে ঠিক এনগেজডের অধিকার পেলুম না। চুম্বন করতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা বেধ করেছি। এঙ্গেলকে চুম্বন করতে সাহস হয়নি। যদি সে কিছু মনে করে। যদি বলে, “আমি কি এতই সুলভ? আমাকে তুমি কী পেয়েছ?”

আগনাকে খুলে বলতে দোষ নেই। আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণ প্রেটোনিক। তা বলে কম সত্য বা কম গভীর নয়। তাকে না দেখতে পেলে আমার আপ বেরিয়ে যেত। দেখা হলে আপ ফিরে আসত। তার চোখে মুখে যা লক্ষ্য করেছি তা আমার সঙ্গ পেয়ে সহজ আনন্দ। সে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখের তারা জুলে উঠত। অনেক সময় ভেবেছি এ কি প্রেম, না এক প্রকার বক্সুতা? কিন্তু পরীক্ষায় ফেলে দেখেছি প্রেমই বটে। একবার কেলসাইজ পার্কে যাইনি। সে ছুটে এসেছিল হাইগেটে আমার বাসায় আমার খৌজ নিতে।

তখনকার দিনে মেলামেশা অত অবাধ ছিল না। সেইজন্যে আমার বাসায় তার ছুটে আসা বলতে কতখানি ত্যাগবীকার ও বিপদবরণ বোঝায়, তা একালের ছেলেমেয়ের ক্ষমনার অতীত। আমার ল্যাভলেজী তো স্ফটিত। পরে আমাকে বলেছিল, “মেয়েটি দেখছি মরিয়ার মতো প্রেমে পড়েছে তোমার। আহা! কী মধুর মেয়েটি!”

ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে উপহার দিয়েছিল, সেটা ল্যান্ডলেডির নজর
এড়ায়নি। বুড়ি বলল, “এর মতো উপহার তোমার কী আছে দেবার? বাজার
থেকে কিনে দিতে যে-কোন লোক পাবে?”

বললুম, “আমি তো বুনতে জানিনে। আঁকতেও জানিনে ছাই। আমি আর
কী দিতে পারি?”

বুড়ি বলল, “তুমি তো বেশ রাঁধতে পারো দেবি। রঁধে খাওয়াও না কেন
ওকে?”

চমৎকার আইডিয়া। পরের শনিবার নিমন্ত্রণ করলুম পূরবীকে। সে খুশি হয়ে
এলো। এখন থেকে প্রায় শনিবার ওর নিমন্ত্রণ মধ্যাহ্ন ভোজনের। তারপরে
মাসিমার ওখানে। রাঙ্গাটা অবশ্য একতরফা নয়। সেও যোগ দিত। কী যে আনন্দ
পেয়েছি সেই কয়েক মাস! যতই ওর সঙ্গে মিশতে পাই, ততই বুঝতে পারি
ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে সারা জীবনটা কেটে যাবে কয়েকটা মাসের মতো।

পূরবী কিন্তু বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কথা উঠলে এড়িয়ে যায়।
আমি যদি বলি, আমাদের দু'জনের এই আনন্দকে জীবনব্যাপী করতে হলে বিয়ে
না করে উপায় কী, সে বলে, আছা বিয়ে-পাগলা বুড়ো যা হোক।

কিছুদিন পরীক্ষা নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলুম। দেখা হয়নি। পরীক্ষার পরে তরফদার
মাসিমা বললেন, “এবার তো দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো তোমার। তার
আগে একটু ঘোরাঘুরি করবে না?”

আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। কন্টিনেন্ট ঘূরতে চাই। কিন্তু পূরবী কি যেতে
রাজী হবে? সে না গেলে আমি কী করে যাই? তার কাছাকাছি থাকতে হবে
যে। পূরবীর পড়া আর এক বছর বাকী। সে আপাতত দেশে ফিরছে না। একা
ফিরতে হবে আমাকেই। সেইজন্যেই এই দুটি মাস তার কাছাকাছি থাকা এত
জরুরি। কন্টিনেন্টে বেড়ানো অবশ্য আমার অনেক দিনের শৰ্খ। কিন্তু দুটোর মধ্যে
একটা যদি বেছে নিতে হয় তবে পূরবীর কাছাকাছি থাকা আরো জরুরি।

পূরবীর কানে গেল এ কথা। সে বলল, “বুড়ো, এ তোমার নতুন এক
পাগলামি। আবার কবে এ দেশে আসবে! হ্যাতো এ জীবনে নয়। এ সুযোগ
হাতছাড়া করলে পস্তাবে। যাও, কন্টিনেন্ট দেখে নাও।”

ভয়ে ভয়ে বললুম, “তুমি যাও তো আমি যাই।”

সে হাসল। “পড়োনি রবি ঠাকুর কী লিখেছেন? পতির পৃষ্ঠে সতীর পৃষ্ঠ
নহিলে খরচ বাড়ে।”

পড়েছি। সত্যি, শুরুদেব যদি আর কিছু না লিখে শুধু ঐ একটি পঞ্জী লিখে
থাকতেন তা হলেও তাঁকে নেবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত হতো। ঐ একটি উক্তির
দাম লাখ টাকা। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। ধারকর্জ করে কোনো মতে
একজনের কন্টিনেন্ট বেড়ানো চলে। দু'জনের জন্যে কার কাছে হাত পাতি?

ও যে আমাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল এর জন্যে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলুম আনন্দটা পারস্পরিক।

বললুম, “পতির পুণ্যে কাজ নেই। আমি যাব না। শেষ দুটো মাস সীতার কাছাকাছি কাটাব।”

তার দৃষ্টির দীপ ধরথর করে কাপল। সে বলল, “আমি যাচ্ছি মেরিয়নের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তার অভিধি হয়ে। তুমি থাকবে কোথায়?”

তাই তো। আমি থাকব কোথায়? আর থাকতে ভালো লাগবে কেন পাড়াগাঁয়ে পাকা দু'মাস? ও মেঝেরাই পারে। আমরা পুরুষ, আমরা সন্দূরের পিয়াসী।

চললুম কটিনেট বেড়াতে। একা একা ভালো লাগে না, দল ভুটিয়ে নিলুম। হৈ হৈ করে আমরা কয়েকজন যুবক আজ এখানে যাই, কাল ওখানে যাই, বরচ বাঁচানোর জন্যে ট্রেনে রাত কাটাই, কিংবা সরাইখানায়, কিংবা হস্পিসে। এই জন্যেই বলে ‘পথে নারী বিবর্জিতা’ পূরবীকে সঙ্গে আনলে অর্ধেক ফুর্তি বাদ পড়ত, জীবনটা সেই পরিমাপে নীরস হতো। কোথায় কাকে, কোথায় কাবারে, কোথায় চোরডাকাতের আস্তানা। আমি ও আমার শ্রী মাস্কেটোর্স মিলে কত বার বিপদের সঙ্ঘানে গেছি, সামনে পড়েছি। দৈবাং রক্ষা পেয়েছি। সে ছিল বটে একটা বয়স। সে-সব দিন আর ফিরবে না।

ফ্রাঙ থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া থেকে সুইটজারল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড থেকে ইটালী, ইটালী থেকে আবার ফ্রাঙ হয়ে ইংল্যান্ড। পূরবীর জন্যেই ইংল্যান্ড ফেরা, নহিলে কোনো দরকার ছিল না।

বিদায় নিতে গেলুম ইষ্টবোর্নে। সেখানে সে তরফদারদের অভিধি। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিপ্রদীপ উজ্জ্বল হলো। বলল, “বুব উপভোগ করলে?”

সত্যি বুব উপভোগ করেছিলুম, কিন্তু সত্য গোপন করাই বোধ হয় সুবুদ্ধি। বললুম, “কই আর উপভোগ করলুম! তুমি ছিলে না!”

সে হেসে বললে, “কথাটা পতির মতোই হলো। আদৰ্শ পতির।”

ধরা পড়ে গেলুম। সাফাই মুখে জোগাল না। বললুম, “তুমি কিন্তু শুকিয়ে গেছ।”

সে ইয়েৎ কুপিত হয়ে বললে, “বুরুণ, থাক। পতিগিরি যথেষ্ট হয়েছে।”

সমুদ্রের ধারে বসে দু'জনে দু'জনকে হাদয় খুলে দেখিয়েছিলুম সেই একদিন। গোধূলি যেন ফুরোতে চায় না। শরৎ গোধূলি।

বললুম, “পূরবী, তোমার উপরে নির্ভর করছে আমার জীবনের সুখ সার্থকতা। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর তা হলে যে আমি বাঁচব না তা নয়, কিন্তু জীবনে আমার সুখ থাকবে না। সুখার বদলে থাকবে সুরা। হৈচ, উশুজনা, নিজেকে মাতিয়ে রাখা, তোমাকে ভুলে থাকা। যে ভাবে এই দু'মাস কাটল।”

সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তারপর ক্ষীণস্বরে বলল, “তুমি বিয়ে করোনি,

বিশ্বের ভিতর দিয়ে যাওনি, তাই বিশ্বে তোমার কাছে একটা সুখসপ্ত। আমার কাছেও একদিন সুখসপ্ত ছিল। এখন কিন্তু দৃশ্যসপ্ত।”

আমি চমকে উঠলুম। এ কী শব্দ! তা হলে কি সে বিবাহিতা!

“হ্যাঁ, যা ভেবেছ। এত দিন তোমাকে বলিনি। বলার সময় আসেনি। আজ না বললে নয়। আমাকে বিশ্বে করতে হয়েছে, বিশ্বের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। চাও তো সব বুলে বলতে পারি, কিন্তু কী হবে ইয়েৎ ষেঁটে! জেনে নাও যে আমার সুখসপ্ত ভেঙে গেছে। যা দেখেছি তার থেকে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে বিশ্বের পরে মানুষের পতন হয়। দু’বছর পরে এক দিন হিসাবনিকাশ করে দেখলুম আমি ছেট হয়ে গেছি, আমার স্বামী আমার চেয়েও ছেট। তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে এলুম এ দেশে। কিছু স্মৃথিন ছিল। পড়াশুনা করছি, পাশ করলে চাকরি পাব আশা করি। স্বামীকে অনুমতি দিয়ে এসেছি আবার বিশ্বে করতে। তিনি করেছেনও।”

হত্যাক হয়ে তুলছিলুম। এ কি সত্য, না আমাকে তোলাবার জন্যে স্টোকবাক্য! সোজা বললেই পারে আমাকে বিশ্বে করতে তার ইচ্ছা নেই, আমি তার অযোগ্য। কিন্তু এসব বানিয়ে বলা কেন? আমার চোখে খুলো দেওয়া কি অত সহজ?

“বিশ্বে করে থাকলে তোমার নাম হতো মিসেস অশুক। কিন্তু তা তো নয়। মিস চৌধুরী তোমার নাম।”

“সেটা আমার কুমারী অবস্থার নাম। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে সেই নাম ছিল। এখানে নাম লেখবার সময় কাগজপত্র বদলাইনি। সহপাঠিনীরা জানে আমি মিস চৌধুরী। যশিকা সেই নাম তার বাড়িতে প্রচার করে দিয়েছে। সকলে সেই নামে ডাকে। সিঞ্চিতে সিদুর দিয়ে তার প্রতিবাদ করিনি। কেনই বা করব? বিশ্বে তো আমার চুকে গেছে। আমি তো আর বিবাহিতা নই।”

কান্না আমার বুকে আচার্ড রাচ্ছিল। আর একটু হলে চোখের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। একরাশ বিদেশীর সুমুখে কান্নায় গলে যাব, আমি কি এতই নরম!

মুকের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রাইলুম তার মূখে। সে বলতে লাগল, “আমি তোমাকে ঠেকাতে চাইনি, ঠেকাইনি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা আমাদের উন্নত করেছে। হিসাবনিকাশ করলে দেখবে তুমি ও আমি কেউ কাউকে ছেট করিনি, ছেট হইনি। দু’জনেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে।”

আমি তা শীকার করলুম। কিন্তু আমার আকাশজোড়া ক্ষেত্র যে ধরনে গেল। একটা দিনের একটা মুখের কথায় এত বড় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে! এটা কেমন করে মেনে নিই! ক্ষোভ আর অভিমান আমাকে বিশ্বেই করেছিল।

“তুমি যদি চাও,” সে তার অমিয়মাথা সুরে বলতে লাগল, “তবে আমাদের

এখনকার এই সম্বন্ধ চিরদিনের হতে পারে। আমিও বিয়ে করব না, তুমিও বিয়ে করবে না। এই ইংলণ্ডেই কাজকর্ম খুঁজে নেব দু'জনে। এমনি কাছাকাছি থাকব। এমনি ভালোবাসব। এর চেয়ে মধুর সম্বন্ধ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি তোমাকে বলব না একে চিরঙ্গন করতে। আমি জানি তুমি দুখস্বপ্ন দেখছ। আমাকে ঘিরে ততটা নয় বিয়েকে ঘিরে যতটা। যাও তবে, বিয়ে করো একটি মনের মতো মেয়ে। সুখী হও। আমার অঙ্গের আর্থনা তুমি সুখী হও।”

এর পরে আমাদের বিদায়। বিদায়ের দিন সে আমাকে একখানি বই উপহার দেয়, কবিতার বই, ক্রিষ্টিনা রোজেটির। তাতে গৌজা ছিল একটি ল্যাভেন্ডারের পঞ্চব।

৩

গঞ্জ শেষ হয়ে গেছে, বুবতে পারিনি। জানতে চাইলুম, “তার পরে?”

“তার পরে?” ভদ্রলোক কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। “তার পরে আমি সুখী হলুম, সফল হলুম। দেখছেন তো কেমন সুখী পরিবার আমার? চাকরিটাও সুখের চাকরি। দেদার বই কিনি আর পড়ি। গান শুনি আর করি। ছেলেরা মাঝে মাঝে দিক করে। ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আমিও ভয় দেখাই ইন্সফার। আমার দিন তো আয় হয়ে গোলা। সামনের বছর রিটায়ার করছি। কোথায় বসব, বলতে পারেন? কলকাতায় যা ভিড়।”

রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ঘড়ি দেখছেন। শুধু একটি জিজ্ঞাসা ছিল। পূরবী দেবীর কী হলো?

“বিলেতেই রয়ে গেল। এখনো সেইখানেই আছে। বড়দিনের সময় কার্ড পাঠাই, কার্ড পাই।”

(১৯৫২)



চরিত্রহীন

আশাপূর্ণা দেবী

এখন? এই বয়সে?

শুনে স্তুতি হয়ে গেলাম।

সত্যিই কি মানুষের বাসনার শেষ নেই? নেই অসংযমের মাত্রা? চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

মনে মনে বয়সটার—একটা মোটা হিসেব করে নিয়ে আন্দাজ করলাম রাখাল-মামার বয়সে আয় সম্ভবের কাছাকাছি। সেই রাখালমামা—এখনও! আশৰ্য!

বিদেশে থাকি, কালে-কমিনে কলকাতায় আসি, তাও সামান্য ছুটিতে। নিকটতম আয়ীদের খবর নিতেই সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারি না, তা জ্যেষ্ঠতৃতো! পিসতৃতো! রাখালমামা এ যাবৎ বেঁচে বর্তে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন কিনা তাই জানতাম না, অন্য খবর ত দুরের কথা। রাখালমামার ছেলে নীতুদা আজ আমার মার কাছে দুঃখগাথা গাইতে এল বলেই শুনলাম। আর শুনে স্তুতি হয়ে গেলাম। ভাবলাম চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছি বটে রাখালমামার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, বৌ, ছেলেসংসার সব থাকতেও নাকি একটি উপসর্গ আছে তাঁর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার উপসর্গটি আর কোথাও নয়, দেশ ভিটেয়। ঝাড়-বৃষ্টি, বজ্জ্বাত যাই হোক, পৃথিবী উল্টে গেলেও তিনি যে রবিবারে দেশে যান, সেটা ভিটের টানেও নয়, পিসি খুড়োর টানেও নয়, সেই 'লক্ষ্মীছাড়া মাগী'র টানে।

তখন আমরা বালক বলে যে আমাদের কান বাঁচিয়ে কোনও কথাবার্তা হত এমন মনে পড়ে না। কাজেই তখনই আমরা জেনে ফেলেছিলাম রাখালমামা খারাপ লোক।

কিন্তু সে কি এ যুগের কথা?

এই যুগ-যুগান্তর পরে আবার কিনা কানে এল রাখালমামা সেই লক্ষ্মীছাড়া মাগীর টানে—

না, এখন বুড়ো বয়সে আর হঞ্চায় যাওয়ার ক্রেশ সহ্য হয় না, তাই দেশের

বাড়িতেই বসবাস করছেন রাখালমামা!

ছেলেরা কলকাতায় নিয়ে আসবাব জন্যে সহজ সাধনা করছে, নড়িয়ে আনতে পারছে না তাঁকে।

ছুতোরও অভাব নেই রাখালমামার।

মাথা খুব পরিষ্কার।

ছুতো হচ্ছে, এই বয়সে আর কলকাতায় ভাড়াটে বাড়িতে ‘ওড়ের নাগরী ঠাসা’ হয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। পাঞ্জী, বদ নাতি-নাতনীগুলোর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে। সারাদিন বৌদ্ধির কলহ কচকচিও তাঁর অসহ্য।

তাছাড়া, ছেলেদের প্রশ্ন করেছেন রাখালমামা, ‘পারবে তোমরা, আমার শরীর, স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যা দরকার তার জোগান দিতে?’

কি উত্তর দেবে ছেলেরা? ‘হ্যাঁ পারব’ বলবে কোন ভরসায়? বয়স হয়েছে বলে শরীর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যে রাখালমামার অনেক কিছু চাই। চাই একসের করে খাঁটি দুধ, নিয় ভাতের পাতে ছটাকখানেক করে সরতোলা গাওয়া ঘি, দুবেলা সদ্য মাঠ থেকে তোলা টাটকা শাক, পাতা, উঁটা, প্রতিদিন তাজা চারাপোনার বোল আর বাটি ভর্তি চুনো মৌরলার টক। এছাড়া আর যাই হোক, এগুলো অবশ্যই চাই। এইরকম নিয়ম যত্নে থাকতে পারলে নাকি আরও পনের বিশটা বছর হেসে-থেলে, হেঁটে-ছুটে বেঁচে থাকতে পারেন রাখালমামা।

আর, বাঁচতেই চান তিনি?

কলকাতায় কি পয়সা ফেললেই এ-সব মেলে? এখন অবশ্য গ্রামে ঘরেও আগের মত কিছুই নেই তবু কিছু আছে। থচুর না মিলুক সামান্যও মেলে, যদি চেষ্টা যত্ন থাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা করে কে?

‘কে আর!’ নীতুদা স্কুল বিরক্তিতে বলে, ‘সেই তিনিই। আমরা ত বলতে গেলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। নেহাত মাসকাবারি টাকা, আর যেবাবে যা ফরমশ থাকে সেই সব নিতে মাসে একবার করে—’

‘টাকা বন্ধ করে দিতে পারিস না?’ আমার মা বীরাঙ্গনা বিক্রয়ে বলে ওঠেন, ‘তা হলে কেমন না সৃড়-সুড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন দেবি?’

নীতুদা হতাশভাবে বলে, ‘তাই কী হয়?’

‘হবে না কেন?’ মা পুনরায় উদ্দীপ্ত, ‘তোরা বলবি—আমরা ছাপোষা, মোট মোট নগদ টাকা যাদি দিতে না পারি? একসঙ্গে থাকো, খাও দাও ব্যাস।’

‘তাহলে আবার তোমরাই বলবে, কি কুলাঙ্গার ছেলেরা গো! বুড়ো বাপকে খেতে দেয় না।’

‘কেউ বলবে না?’ আবার স্বগতোক্তি করেন মা, ‘বাপ বাপের মত হয় তো, মাথায় করে রাখবে ছেলেরা, বাপ অছেদার কাজ করলে আবার মান্য কি?’

নীতুদা মলিন মুখে বলে, ‘সে আর কে বুঝবে? বরং সকলেই ভাবে বৌরা বৃক্ষ বুড়ো শুণুরের বামেলা পোহাতে রাজি হয় না, তাই ছেলেরা বাপকে বনবাসে দিয়েছে। এর ওপর আবার টাকা বন্ধ?’

‘কিন্তু এত বাড়াবাড়িটা হল কবে?’ মা বলেন, ‘এ রোগ ছিল চিরকালই জানি, সুশীলাদি ত গ্রাম সম্পর্কে আমাদের বোন হয়, দেখেছি বরাবর! হাসাহসিও করেছে সবই, কিন্তু এত এমন বেহেড়েপনা ছিল না। ওই রাখালদা রবিবারে রবিবারে বাড়ি যেত, দেখাসাক্ষাৎ গল্ল-শুভ করত, এই পর্যন্ত। তবে মাস মাস খরচাটি দিয়েছে সুশীলাদিকে।’

ঈরৎ কৌতুহলী হয়ে বলি, ‘তা তখনকার দিনে তোমাদের পাড়ার্গাঁয়ের সমাজ এসব অ্যালাউ করত? সুশীলাদির বাপ-মা রাগ করতেন না?’

‘বাপ-মা কোন চুলোয়? জ্ঞানের আগে সব খেয়ে ত কাকা, খুড়ির সংসারে ভর্তি। তা ছেলেবেলায় নিত্যি খুড়ি মুখ বাঘটা দিয়ে বলত, ‘কাজে নেই গেলায় আছ, দেব না ভাত। এর-ওর দোরে গিয়ে দাঁড়াত মুখ শুকিয়ে। লোকে মায়া-দয়া করে দুঃখে ভাত দিত! সবই ত জ্ঞাত-গোত্রর!’

‘শুশুর বাড়ি?’

‘সেখানেও তেমনি। যেমন কপাল জোর! কাকা-খুড়ি একটা বর জোগাড় করে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করেছিল। ছ’ মাসের মধ্যে তাকে শেষ করে আবার সেই কাকা-খুড়ির ঘাড়ে। তাদেরই বা ভাল লাগবে কেন? নিত্যি খিটিমিটি। সেই সূত্রেই দয়া উথলে উঠল রাখালদার। বলল, ‘শুধু একবেলা এক মুঠো ভাতের জন্যে এত লাঙ্ঘনা। আমি দেব সুশীলার ভাত খরচা।’ তখন রোজগার করত ভাল, সদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিল, দয়ার মেজাজ দেখাবার মুরোদ ছিল। তা সেই দয়া দেখানোই ‘কাল’ হল! সুশীলাদি একেবারে গলে গেল, মাখামাখি বেড়ে উঠল। কাকা গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দিল বিধবা মেয়ের রীত চরিত্রি দেখে। আমার অবিশ্যি এ সব শোনা কথা, স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমরা সুশীলাদিকে দেখেছি বাপের ভিটেয় একখানা ভাঙা ঘরে পড়ে থেকে, আর রাখালদার পয়সায় খেয়ে গাঁসুজ লোকের কাজ করে বেড়াত। অসীম গতর, যার ঠেকা পড়ে, সেই ভাকে ‘সুশীলা!’ কিন্তু এ বিষয়ে এতটা বেপরোয়া—’

নীতুদা বাধা দিয়ে বলে, ‘এতটা হয়েছে মা মারা গিয়ে অবধি। মাও গেলেন, বাবার চাকরিও গেল—’

‘চাকরি গেল।’

‘ওই যে অফিসে নতুন ফ্যাসন হল বুড়ো বিদেয় কর।’ অর্থাত বাবা তখনও ওই ঘাট বছরেও দুটো জোয়ান লোকের খাটুনি খাটতে পারতেন। কিন্তু সে যাক, গেল। আর যেতেই অমনি বাবা ধূয়ো ধরলেন, ‘অফিস যেতাম স্বারাদিন, এক

ରକମେ କେଟେହେ, ଏତ ଆଟ ସାଁଟେ ଥାକତେ ପାରବ ନା ।’

ଆମରା ଭାବଲାମ, ‘ତା ମନ୍ଦ କି, ବୌରା ତ ରାତ-ଦିନ ‘ବାବା ଏହି ବଲଲେନ, ବାବା ତାଇ ବଲଲେନ, ବଲେ ଅଶାଙ୍କି କରଛେ, ଦେଖେ ଗିଯେ ଥାକତେ ପାରେନ ଦୁଃଖେରଇ ଭାଲ । ଚାର ଭାଇ ପନେର ଟାକା କରେ ଦେବ, ଉନି ସ୍ଵପାକେ ଥାବେନ, ଆର ପୁରନୋ ମୁନେମେର ଛେଲେଟା କାଜ-କର୍ମ କରେ ଦିଯେ ଯାବେ, ଏହି ବ୍ୟବହା ! ବାବାର ତ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଖୁବ ଶୂର୍ତ୍ତି । ତଥବ କି ଜାନି ଏହିସବ ଅସଭ୍ୟତା ହବେ ? ପରେର ମାସେହ ଗିଯେ ଦେବି ରାମାୟଣର ସୁମୀଳା ପିସି ! ବୁଝନ, ଦେଖେ ମନେର ଅବହା କି ହଲ ! ଏ ସବ ଜାନତାମ ବରାବରଇ, କିନ୍ତୁ ଏକେବାରେ ଏରକମ ଥକାଶ୍ୟ ! କୈଫିଯେଣ ଦିଲେନ—ଏରଓ ହାତ ପୁଡ଼ିଯେ ରେଖେ ଥାଓଯା କଷ୍ଟ, ଓରାଓ ନାକି ସର ପଡ଼େ ଗେଛେ, ଥାକାର କଷ୍ଟ ଅତ୍ୟବ !’

ମା ଉଗ୍ରକଷ୍ଟେ ବଲେ ଉଠିଲେନ, ‘ତୋରା ବଲଲି ନା କିଛୁ ?’

‘କି ବଲବ ବଲୁନ ? ଓରେର ଲଜ୍ଜା ନେଇ, ଆମାଦେର ତ ଲଜ୍ଜା ଆଛେ ! କିଛୁ ନା ବୋଲାର ଭାନ କରେ ଚଲେ ଏଲାମ । ଏଥବେଳେ ଯାଇ, ଏକବେଳା ଥାକି, ଥାଇ ଚଲେ ଆସି । କିନ୍ତୁ ଦେବୁନ, ଏହି ବାଜାରେ ସଂସାର ଥେକେ ଯାଟଟା କରେ ଟାକା ବେରିଯେ ଯାଓଯା ! କଲକାତାର ବାଡ଼ିତେ ଥାକଲେ ତ—’

ବୁଝାଲାମ ନୀତୁଦାତେ ମୂଳ ବ୍ୟଥାଟା କୋଥାୟ ।

ଅତଃପର ନୀତୁଦାତେ ଆର ମା-ତେ ଥରଲ ପରାମର୍ଶ ଚଲାତେ ଲାଗଲ, କି କରେ ଏହି ଅବୈଧ କାନ୍ତେର ଏକେବାରେ କାନ୍ତେଛେଦ କରା ଯାଇ ! ବ୍ୟବହା ହୁଲ ମା ଏକବାର ସରେଜମିନେ ତଦନ୍ତ କରାତେ ଯାବେନ, ଏବଂ ମେଇ ଯତ ନଟେର ମୂଳକେ ଯାହେତାଇ କରେ, ଆର ରାଖାଲ-ମାମାକେ ଧିକ୍କାର ଦିଯେ ବୁଝିଯେ ଛାଡ଼ିବେନ, ସମାଜେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଏ ସବ ଅସମାଜିକତା ଚଲାବେ ନା । ବଲବେନ, ଓହି ପାପକେ ବିଦେଯ ନା କରଲେ ଛେଲେରା ମାସୋହାରା ବଞ୍ଚ କରେ ଦେବେ । କେବନ୍ତି ବା ବଞ୍ଚ କରବେ ନା ? ତୁମି ବାପ ହୁ଱େ ଯଦି ଦେଶେ ଗାଁଯେ ତାଦେର ମୁଖ ଦେଖାନୋର ପଥ ବଞ୍ଚ କରାତେ ପାରୋ, ତାଦେର ଆର ଟାକା ବଜେର ଅପରାଧ କୋଥାୟ ?’

ଆମି ବଲି, ‘ତୁମି ଆବାର କେନ ପରେର ବ୍ୟାପାରେ ମାଥା ଗଲାତେ ଯାବେ ମା ? ଯେ ଯା କରଛେ କରନ୍ତି ନା, ତୋମାର କି ?’

ମା ଧିକ୍କାରେ ଆମାକେ ଏକେବାରେ ମାଟିତେ ମିଶିଯେ ଦିଯେ ବଲେନ, ‘ତୁଇ ବଲିସ କି ରେ ବଲ, ଆମାର କି ? ଭିଟେଟା ଆମାର ବାପ-ଠାକୁର୍ଦାର ନନ୍ଦ ? ମେଥାନେ ବସେ ଯେ ଯା କରଛେ, କରବେ ? ବେଟାଛେଲେ ବାହିରେ ବାହିରେ ଯା କରେ କରନ୍ତି, ଭିଟେଯ ପାପ ଏନେ ତୁଲବେ ?’

ଲଜ୍ଜାର ମାଥା ଥେଯେ ବଲେ ଫେଲି, ‘ପାଗେର ଆର କି ? ବସନ୍ତେର ତ ଗାଛ-ପାଥର ନେଇ ବାବା !’

ମା ତାତେ ଦମେନ ନା, ବଲେନ, ‘ଥାମ ତୁଇ ବଲ, ବସନ୍ତେର ବିଚାର କି କରଛେ ଓରା ! ଏଥବେ ଯଥବ ଏତ ହିୟେ, ତଥବ ଆର—ସାକ ଗେ ତୁଇ ପେଟେର ଛେଲେ କି ଆର ବଲବ ! ମୋଟ କଥା ରାଖାଲଦାକେ ବୁଝିଯେ ଆସବ ଭିଟେଯ ବସେ ଏତ ଅନାଚାର ଚଲାବେ ନା । ଲଜ୍ଜା ନେଇ ? ମେଗା ନେଇ ? ଛେଲେଦେର ସାମନେ ମୁଖ ତୁଲେ ଦାଁଡାତେ ଭୟ ନେଇ ? ଥରୁଣ୍ଠିକେ

বলিহারী!

শেষ পর্যন্ত আমার ক্ষক্ষে ভর করেই মার বাকইপুর যাওয়া! নীতুদা যাবেন না, এক্ষেত্রে ছেলেরা মুখোমুবি না ইওয়াই ভাল।

কি আর করা!

তবে সত্ত্ব বলতে কি, খুব অনিচ্ছে হচ্ছে না, আমারও কৌতুহল হচ্ছে সেই সম্ভব বছরের প্রেমিক পুরুষটিকে দেখতে।

দেখলাম!

আর দেখেই প্রথমটায় মনে হল, সত্ত্ব চরিত্রাধীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

সোজা সতেজ খাড়া দেহ, উজ্জ্বল মুখ, চোখ, যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি!

লজ্জা, কৃষ্ণা, দ্বিধা, সঙ্কোচ, কোনও কিছুর বালাই নেই, একেবারে মুক্তপুরুষ। মাকে দেখে ইয়েঁয়ানের মত হৈ-হৈ করে উঠলেন, ‘আর কে রে! বুলবুলি না? কি ব্যাপার! তুই কোথা থেকে? ই—স কতদিন পরে দেখো। বাগ-ঠাকুরার ভিট্টেটাকে তাহলে মনে আছে এখনও? কেউ আসে না, বুঝলি বুলবুলি কেউ আর দেশে আসে না, দেশ একেবারে ‘কানা’ পড়ে আছে।’

মা ত এই মুহূর্তেই বলতে পারতেন, ‘কেন তুমি ত রয়েছো, দেশ, গ্রাম বৎশ সব কিছুর মুখ উজ্জ্বল করে।’ অথবা এও বলতে পারতেন ‘লোকে আর আসবে কোন সুবে? তোমাদের মত কুলধর্মজারা যেখানে বসবাস করছেন!’ বললে কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকত। কিন্তু বললেন না। জানি না—বললেন না, না বলতে পারলেন না। বহুদিন বিস্মিত ‘বুলবুলি’ শব্দটা কানে গিয়ে গলাটা ভারি হয়ে এল কিনা! মোট কথা দেখতে পেলাম, মাথা হেঁট হয়ে বেশ পরিপাণি করেই পায়ের ধূলো নিলেন রাখালমামার।

ততক্ষণে রাখালমামা আর একবার হৈ হৈ করে উঠেছেন, ‘ওরে সুশীলা, কি তোর ঘোড়ার ডিমের কাজ নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছিস? বেরিয়ে এসে দ্যাখ, কে এসেছে। বুলবুলি, আমাদের সেজকাকার বুলবুলি। কি একখানা গিন্নীবানী হয়ে গেছে! হাঁরে এই বুঝি তোর বড় ছেলে? সেই এতটুকুনটি দেখেছিলাম। কাজকর্ম কি করে ছেলে?’

উভয়ের অপেক্ষা না করেই গড় গড় করে প্রশ্ন যান রাখালমামা, আর যেন ছুটোছুটি করতে থাকেন। খুশিটা যে যথার্থ আন্তরিক, তা বোবা যায় ওর অস্ত্রিভায়। আবার হাঁক পাড়েন, ‘অ সুশীলা, কানের মাথা খেয়েছিস নাকি?’

ততক্ষণে সুশীলা এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সুশীলা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

ঁর জন্যে একটা মানুষ যুগ-যুগান্ত কাল ধরে সংসারে অশাস্তি এনেছে, সমাজে

বদনাম কিনেছে, অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করেছে আর এই জীবনের শেষ ঘাটে এসেও ছেলেমেয়ে, আশ্চীর, প্রতিবেশী সকলের কাছে হয়ে হচ্ছে!

কালো রোগা ঢাঙা এক বুড়ি, চুলগুলো ছাঁটা, সাধনের দৃষ্টা দাঁত পড়া!

সেই দাঁতপড়া মুখে একটু হেসে মাকে সন্তানণ করলেন, ‘তুই ত ছেলের কাছে বিদেশে থাকিস, তাই না? এলি কবে? ওমা এইটিই বুঝি ছেলে? বিলু না কি যেন ডাকনাম ছিল ছেটবেলায়?’

‘বিলু নয়! বিলু! বাবা এতও তোমার মনে আছে সুশীলাদি!’ বলে দিব্যি অঙ্গান বদনে, যে ‘পাপ’কে বৌঢ়িয়ে বিদেয় করবার দৃঢ়-সঙ্কল্প নিয়ে হানা দিয়েছেন, সেই পাপের চরণে প্রাণপাত করলেন মা!

‘থাক থাক হয়েছে। আয় বোস। থাকবি ত কিছুদিন?’

‘নাঃ থাকব আর কি করে?’ মা আঙ্কেপ করেন ‘ছেলের ত গোনাদিনের ছুটি!’

আরও কিছু হয়ত বলতেন মা, কিন্তু ততক্ষণে রাখালমামা তাড়া দিয়ে উঠেছেন, ‘আছা আছা, ওসব কথা পরে হবে, আগে ওদের হাতমূখ খোবার ব্যবস্থা করে দে দিকিন। গঞ্জ একবার জুড়লে ত রক্ষে নেই! বুবলি বুলবুলি, তোর এই সুশীলাদিটি আজ আর তোকে রাতে ঘুম্যতে দিয়েছে। দেখবি তোকে গাঁয়ের এই তিরিশ বছরের ঘটনা কাহিনীর পরিচয় দেবে বসে বসে। জানেও ত সকলের নাড়ি নক্ষত্র।’

অতঃপর অতিথি সৎকারে তৎপর হয়ে উঠলেন রাখালমামা।

কোনও বারণ মানলেন না, অচণ্ড রোদ্বুরে নিজে গেলেন মিষ্টি আনতে। কোথায় কোন জেলনিকে বলে এলেন, যে করে হোক একটু মাছ যোগাড় করে নিয়ে আসতে, আর এসে অনবরত সুশীলাকে তাড়া দিতে লাগলেন, ‘তোর হল? দৃষ্টে মানুষের রামা করতে তুই যে বুড়ো হয়ে গেলিরে সুশীলা।’

আমরা যত ব্যস্ত হতে বারণ করি, রাখালমামা ততই আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। একি ঘৃষ? না অভিনয়?

কিন্তু মার ব্যাপারটা কি? সেও কি অভিনয়?

দেখছি, আর অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আর মজা এই, একবারও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন না মা।

গুনতে পাছিঃ রামাঘরে গঞ্জের মোত বইছে।

সেই তিরিশ বছরের ইতিহাস আওড়ানো হচ্ছে বোধহয়। কত অজস্য নাম কানে আসছে! ভাবছি, কী আশ্চর্য! এই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আর এক প্রাচ্যে কাটিয়েও মা বাকইপুরের প্রত্যেকটি মানুষকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে এসেছেন!

তিরিশ বছরের মধ্যে অবশ্য আমি না এলেও মা এক-আধবার এসেছেন। সেই কথারই উপরেখ শুনছি মার কঠে, ‘সেবারে যখন এসেছিলাম, সুশীলাদি, মা

গো মা, বাড়ি দেখে যেন কান্না পেয়েছিল। উঠোন ভর্তি আগাছা, দেয়ালের বাড়ির চাপড়া খসে খসে পড়েছে আর ইন্দুর ছুঁচের উৎপাতে ঘর-দালান একেবারে তচ্নচ, রাখালমায়ার উনুন দুটো ভেঙে হমড়ে পড়ে আছে, তুলসী মঞ্জের গাছটা শুকিয়ে কাঠ, মাগো মা সে কী দৃশ্য! এবারে এসে যেন চোখ জুড়েলো। সেই পুরনো বাড়ি এখন যেন পড়লে সিঁদুর উঠছে। চিরকালের খাটিয়ে মেয়ে তুমি!

সুশীলাদি কি কোনও মন্ত্র জানেন?

বশীকরণ মন্ত্র!

আর সেই মন্ত্রের জোরেই রাখালমায়াকে?

মন্ত্রের শুশের কথা বলেন না, বলেন হাতের শুশের কথা।

আমাকে কাছে নিয়ে খেতে বসেন, সেই ওঁর সরতোলা গাওয়া বি, বাড়ির গরুর দুধের ঘন ক্ষীর, টাটকা পুকুরের মাছের বোল, সদ্য মাঠ ভাঙ্গা আনাজ তরকারি, মৌরলা মাছের কড়া টক, সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সহযোগে। আর আমার চাইতে তিনিশুণ বেশি অন্ধব্যুঞ্জন পার করে হাত চাটতে চাটতে প্রসন্নমূখে সামনে বসে থাকা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, হাতের শুশে, বুঝলি বুলবুলি, সুশীলার হাতের শুশে নটেশ্বাকও বাহবার হয়ে ওঠে। যা রাঁধে তাই যেন অমৃত। হাতের রাঙ্গা খেলে রুগীর রোগ সারে, পরমায়ু বাড়ে। এই দ্যাখ না, আমার আটব্যটি বছর বয়েস পার হতে চলল, দেখে বুঝতে পারছিস?

মা হাসেন, ‘তা বোঝা যায় না বটে।’

রাখালমায়া সোৎসাহে বলেন, ‘তাই ত বাড়িঘর ভাল করে সারিয়ে নিয়েছি। বে-ওজরে আরও কিশ বছর বেঁচে থাকব আমি, দেখে নিস।’

রাখালমায়ার বাঁচার এত বাসনা কেন? মনে হচ্ছে এই বাসনার জোরেই সত্যিই হ্যত আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন রাখালমায়া।

কিন্তু কিছুতেই কেন লোকটাকে পাপী, বদ, অসচরিত্র, অপবিত্র মনে হচ্ছে না?

মনে করতে চেষ্টা করেও না।

মারও কি ওই একই অবস্থা?

তাই তিনি রাখালমায়ার কথার উভয়ে সহায়ে বলেন, ‘আমাকে আর দেখতে বোলো না বড়দা, দেবি ত সেই ওপর থেকে দেখব।’

‘তোদের মেয়েমানুষদের ওই এক কথা। সব শেঁয়ালের এক ‘রা’। বেঁচে দরকার নেই, বেঁচে কাজ নেই—কেন রে বাপু! কিন্তু কথায় কথায় যে বেলা গড়িয়ে গেল। বলি সুশীলা, তোর আক্ষেলখানা কি? তোর না হয় তিনগহর বেলাতেও পিণ্ডি পড়ে না, এরা হল শহরে মানুষ, সকাল সকাল থাওয়া অভ্যেস। ...নাও নিজেও পিণ্ডি দুটো গিলে নাও এই সঙ্গে, অনর্থক দেরি করে লাভ নেই। বলু, চলছে আমরা বরং বৈঠকখানায় গিয়ে বসি গে! ...যেতে পা বাড়িয়ে আবার

থমকে দাঁড়ালেন রাখালমামা, বললেন, ‘নিজেদের কি রেখেছিস না নিরিমিয
পদগুলোও সবটাই আমাদের ধরে দিয়েছিস?’

এসে অবধি রাখালমামার ডাঁক হাঁকই শুনেছি ওঁর সঙ্গে, সুশীলাদির কথা কওয়া
গুনিনি, এই প্রথম শুনলাম। গভীর শাস্তকচ্ছে বললে, ‘তুমি যাবে বৈঠকখানায়?’

‘হচ্ছে হচ্ছে, যাচ্ছিই ত।’ বলে তাড়াতাড়ি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে আসেন
রাখালমামা।

ফিরতি পথে ট্রেনে বসে বললাম, ‘মা এটা কি হল?’

মার পিত্রালয় বিছেদে চিন্ত বিষণ্ণ, উদাসভাবে বলেন, ‘কি আর হল?’

‘নীতুদাকে গিয়ে কি বলবে?’

‘বলব আবার কি’, মা নিজের অভ্যাসে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, বলব,
‘কেন নড়বে রাখালটা দেশ থেকে? অত যত্ন, অত সেবা ত্রিভুবনে আর করবে
কেউ ওর?’

‘মার, সুরটা যে উল্টো লাগছে?’

মা আরও উদাসভাবে বলেন, ‘তা কি করব! সব সময় কি একসূর বাজে।’

‘নীতুদা বলবে তুমি যুশ থেয়েছ?’

‘ওঁ, বলবে ত আমি একেবারে ভয়ে মরে যাব ; কেন নীতু কি জজ? আমি
চুরির আসামী? বলি ওই যে মেয়েমানুষটা অগাধ বুদ্ধি, অফুরন্ত গতর, আর
অচেল শক্তি নিয়ে চিরকালটা শুধু ভেসে বেড়াল, আর পরের সংসারের বেগার
থেটে এল, এই মরণকালে একটা নিজের সংসার পেয়ে বর্তে গেছে সে।
বেচারাকে সেইটুকুন থেকে উচ্ছেদ করে আবার ছন্দছাড়া করব? ভাবতে মায়া
হয় না, কী পরিপাণি সংসার, কী গোছ, কী ব্যবস্থা, দেখলে চোখ জুড়োয়। কি
করে মুখের ওপর বলব, ‘এ সংসারে তোমার অধিকার নেই, তুমি বিদেয় হও।’

‘কিন্তু তোমাদের সমাজ?’

‘চুলোয় থাক! সমাজকে আর কোন লোকটাই বা মানছে এখন?’

‘আর পাপপুণ্য, ধর্ম-অধর্ম?’

মা একটা নিষ্পাস ফেলে বলেন, ‘দেখ বলু, গিয়েছিলাম বটে তেড়েমেড়ে,
কিন্তু ওঁদের দেখে মনে হল পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা কি আমরা? যিনি
মালিক, যিনি বিচারকর্তা, তিনি সত্যবিচার করবেন! আর ওই তোর রাখালমামা।
ওঁর যা স্বভাব, শুধু সেবা-যত্নই নয়, সারাক্ষণ ওঁর যিচুনি খাবার জন্যেও একটা
লোকের দরকার। ছেলেরা পারবে? বৌরা পারবে? কেউ পারবে না। শুধু নাকি
যে মানুষটা চিরটাকাল ওকেই প্রাণ ঢেলেছে—’

আবেগকে সংহত করে সহসা একটু চূপ করে যান মা।

আমি বলি, ‘আমি কিন্তু বলেছি, ওঁকে!’

‘কী বলেছিস? কাকে বলেছিস?’

‘ওই তোমার রাখালদাদাকে। বললাম, এ বয়সে এভাবে এখানে একা থাকায় ছেলেরা খুব দুঃখিত, পাঁচজনে তাদেরই নিন্দে করে, বলে বুড়ো বাপকে ফেলে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তা—’

‘তা কি? কি উত্তর দিলেন? লজ্জা পেলেন? না ধরকে উঠলেন?’

‘লজ্জাও পেলেন না, ধরকেও উঠলেন না, ঠাণ্ডা গলায় বললেন, সে কথা যে বুঝি না বাবা তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি এখানে আছি, তাই সুশীলা দুটো খেতে পাচ্ছে। ছেলেরা কি ওকে মাসোহারা দেবে? আমার চাকরি নেই, নগদ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই কৌশল খেলে বসে আছি। চিরটাকাল যে মানুষটা আমার মুখ চেয়েই রইল, তাকে এখন ‘আমার টাকা নেই’ বলে ভাসিয়ে দেব? আর ওটারও চিরকাল নিজের একটা সংসার নেই বলে কী আঙ্কেপ! তাই বলি, কিছুই ত হল না, তবু মরণকালে দুটো হাঁড়ি-কুঁড়ি নেড়েও যদি ‘জীবনটা সার্থক হল’ ভেবে শাস্তি পায় তা পাক। ছেলে বেটাদের ত বলে দিয়েছি, তোরা যত পারিস আমার নিন্দে করে বেড়াস। বলিস—বাবা বদমেজাজি, বাবা খামখেয়ালি, বাবা একজেদি, বাবা খিটখিটে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে থাকতে পারে না বাবা। নচেৎ আরও যা প্রাণ চায় বলিস পাঁচজনকে, আমার কোনও কিছুতেই গায়ে ফোক্ষা পড়বে না।’

মা কি ভাল করে সবটা শুনতে পেলেন? জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন দেখছি যে!



নূরবানু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কুরমান হাটে কাচের চূড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালী কিনবে না বেগুনী কিনবে চট করে ঠাওর করতে পারে না। অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনতো, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনতো, তিত-পুটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাচের চূড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চূড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চূড়ির মধ্যে হাত চুকিয়ে দেখে করুমান। জোখা মেলে তো রঙ পছন্দ হয় না, রঙ মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নূরবানুর কাচের চূড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খৌপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর কবুলত নেই, বর্ষায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান-যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভালো করে, যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড়ো দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটিনিতে চলে না। নূরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নূরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব গিন্নির খেজমত করে। চুল বাছে, গা খৌটে, তেল মাখে। ভালোমন্দ খেতে পায় মাঝে মাঝে। দরমা পায় চার টাকা!

কিন্তু শাস্তি নেই। মনিব উকিলদি দফাদার, নূরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে।

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নূরবানুকে : ‘মনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।’

‘কেন কী করে?’

‘খুক খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, অমোদ-সামোদ করে কথা কয়।’

‘তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।’

‘না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।’

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয়নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরলো।
সেদিনও কাঁদতে কাঁদতে নুরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে থামতে
দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠলো কুরমানের। বললে, ‘তুই সামনে
গেছিলি কেন?’

‘কে বললে? যাইনি তো সামনে।’

‘সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কী করে?’

‘আমি ছিলাম টেঁকি-ঘরে। ও ঘরে চুকে বললে, বীজ আছে ক-কাটি? আমি
পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরলো।’

তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য! গরিবের বউ-এর কি একটু ছুরৎও থাকতে পারবে না? গরিব বলে
স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

‘খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমত্ত লোক, থানা পুলিশ সব ওদের
হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা চলা। কাজ কাম সেবে বপ করে চলে
আসবি।’

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনী পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে বিম মেরে
গেল।

‘এসব কোথেকে?’

‘মুনিব গিন্নি দিয়াছে।’

কিন্তু জিঞ্জেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পেছনে কার চোখের সায়
রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাচের চুড়ি, কাল আংটি-চুটি। নোনা জমি এমনি করেই
আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

‘খুলে ফেল শিগগিরি।’ গর্জে উঠলো কুরমান।

সাজবার ভারী সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টাল মাতাল করেছিল,
কুরমান হাত ধরে হেঁকে টান মারলো। পট পট করে ভেঙে গেল
কতকগুলি। হেঁকে টান মারলো খৌপায়। একটা কুণ্ডী-পাকানো সাপ কিলবিল
করে উঠলো।

ডুকরে কেঁদে উঠলো নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে
গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্বাস্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনোদিন। বাবা, ভয়

করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে, কিষাণের বউ সে, ঝুঁটো পাথর হয়ে থাকবে।
সাধ-আমোদে তা দরকার কী।

কিন্তু একি। হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্ঘ-পেঁয়াজ
তামাক টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগলো নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে
আস্তে আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাতে রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নহিলে
এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কী করে?

‘তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেল। এদিকে তোমার একটা ভালো
গামছা নেই লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।

‘যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।’

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভূর করে।

‘তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনোদিন—’

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির
ঠুন ঠুন।

উকিলদ্বির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম?
কম কি এক বেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রহ
করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্বির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এলো। ফরসা
রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরকচে।

‘এ শাড়ি এলো কোথেকে?’ বশির মুখের মতো চোখা হয়ে উঠলো কুরমান।

‘আজ যে ইদ খেয়াল নেই তোমার? ইদের দিনে মুনিব-গিরী দিয়েছে
শাড়িঝানা।’

ইদের দিন হলেও নরম পড়লো না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিঁটেফেঁটাও
নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ইদ কোথায়?

না, নরম পড়লো না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে
উকিলদ্বির ঘোলা চোখ, ঘষা জিভ। ফাঁই ফাঁই করে সে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললো।
এবার আর আর সে হাতে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছও
নেই। ক্ষুদ্র চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সব কেন? চট মুড়ি
দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এতো সাজ তার পক্ষে অসাজস্ত ছিল। বুবাতে দেরি হয় না নুরবানুর।
কিন্তু তখন কি সে বুবাতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে?
গা বেয়ে বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো
ফুলের ছাপমারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শাড়ির
মতোই এ শাড়িঝানা। তাই ঘুমের শ্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে শামীর

স্পর্শের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনলো নুরবানুকে। নিয়ে এলো পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র লাশুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে টিপে দুপুরবেলা উকিলদি এসে হাজির। কানের জন্যে বুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, ‘কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।’

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু হিঁর। কৃপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপর বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিনি নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটি মাংসোথেকো জানোয়ার।

‘চলে ধান এখান থেকে।’ চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবান।

‘তোমার জন্য লবেজান হয়ে আছি। এই দেখো, জেওর এনেছি গড়িয়ে।’

‘দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে শোর তুলবো এখুনি।’

কিন্তু শোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদির হাতে কৃপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুশির ঝলকানি, কত না জানি ঠাণ্ডা বটকেরা, কত না জানি হাসির বুজুকি। রঙ-সঙ্গ আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের শর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের, চারপাশে চেয়ে দেখলো সে অসহায়ের মতো। দেখলো ধানের আঁচির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

‘এখানে কেন?’

ধানই-পানই করতে লাগলো উকিলদি। শেষকালে বললে, ‘লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কিনা দেখতে এসেছিলাম।’

‘তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?’

‘বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-ভূমি সদর-অন্দর আমার, আমার যেখানে খুশি আমি যাবো আসবো।’

কুরমান হঠাৎ উকিলদির দাঢ়ি চেপে ধরলো। লাগলো বাটাপটি, ধস্তাধস্তি।

উকিলদ্বির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর জেমা নেই শরীরে সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্বি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগোছাটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নূরবান। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এলো সে হস্ত-দস্ত হয়ে, শিক্রে পাথির মতো ঝাপিয়ে পড়লো উকিলদ্বির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না। শুধু শুরু হয় লটপাট।

কী চোখে দেখলো ব্যাপারটা কে জানে কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক বটকায় টেনে আনতে গেল নূরবানুকে চুলের বুটি ধরে : ‘তুই তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে। কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস?’ উকিলদ্বিকে রেখে মারতে গেল সে নূরবানুকে।

আর যেমনি এলো এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্বির লাঠি পড়লো কুরমানের মাথায়। মনে হলো নূরবানুই যেন লাঠি মারলো। মনে হলো কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্বিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্বির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মতো চেঁচিয়ে উঠলো : ‘এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন’।

বাস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মহূর্তে। সব নিশ্চৃপ, নিঃশ্বেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগতো না। আঁধার দেখতে লাগলো চারদিকে।

নূরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ফকির ফতুরের মতো তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগলো উকিলদ্বি।

লোক জমতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

কুরমান গা-বাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। বললে নূরবানুকে, ‘ও কিছু হয়নি, চলে যা ঘরের মধ্যে।’

সত্যিই যেন কিছু হয়নি, এমনিভাবেই আঁচল শুটিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউ-এর মতো।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্ষিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে ঘরে তুলতে পারবে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি বরদাস্ত করতে পারে না।

উকিলদ্বি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

‘ରାଗେର ମାଥାଯ ଫସ କରେ କଥା ବେରିଯେ ଗେହେ ମୁଖେର ଥେକେ, ଅମନି ଆମାର ଇନ୍ଦ୍ରି ପର ହେଁ ଯାବେ?’ କୁରମାନ କେଂଦ୍ରେ ଉଠିଲୋ ।

ପର ବଲେ ପର! ଏପାର ଥେକେ ଓପାର! ଏକବାର ଯଥିନ ବିଯେ ଛାଡ଼ାର ଫାରଥିଂ ଜାରି କରେଛେ ତଥିନ ଆର ଉପାୟ ନେଇ । ସୁଡି କାଟା ପଡ଼ିଲେ ନାଟାଇ ଶୁଣିଯେ କି ସୁଡିକେ ଧରେ ଆନା ଯାଯ ?

‘ମୁଖେର କଥାଟାଇ ବଡ଼ୋ ହବେ? ମନ ଦେବବେ ନା କେଉ ?’

ମୁଖେର ଜବାନେର ଦାମ କି କମ? ରଙ୍ଗ-ତାମାଶା କରେ ବଲଲେଓ ତାଲାକ ତାଲାକ । ଆର ଏ-ତୋ ଜଳ ଜୀଓଷ୍ଟ ରାଗେର କଥା, ଗଲା ଦରାଜ କରେ ଦିନ-ଦୂପ୍ତରେ ତାଲାକ ଦେଓଯା ।

‘ଆର ଦସ୍ତରମତୋ ସାଙ୍କୀ ରେଖେ?’ ଫୋଡ଼ନ ଦିଲ ଉକିଲଦି ।

‘ଏଥିନ ଉପାୟ? ନୁରବାନୁକେ ଆମି ଫିରେ ପାବୋ ନା?’

ଏକ ଉପାୟ ଆଛେ । ଦଶ-ସାଲିଶ ବସଲୋ ଫରମାନ ଦିତେ । ଇନ୍ଦ୍ରତେର ପର କେଉ ଯଦି ନୁରବାନୁକେ ବିଯେ କରେ ତାଲାକ ଦେୟ ତବେଇ ଫେର କୁରମାନ ନିକେ କରତେ ପାରେ ତାକେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଆର କୁରମାନେର ପଥ ନେଇ ।

କେ ବିଯେ କରବେ? କୁରମାନକେ ଫିରିଯେ ଦେବାର ଜନ୍ୟ କେ ବିଯେ କରବେ ନୁରବାନୁକେ? ଆର କେ! ଦାଢ଼ିତେ ହାତ ବୁଲୁତେ-ବୁଲୁତେ ଉକିଲଦି ବଲଲେ, ‘ଆମି ବିଯେ କରବୋ !’

କିନ୍ତୁ ବିଯେ କରେଇ ତକ୍ଷୁନି-ତକ୍ଷୁନି ତାଲାକ ଦିତେ ହବେ । କଥାର ଖେଲାପ କରଲେ ଚଲବେ ନା । ଦଶ-ସାଲିଶର ହକ୍କମ ମାନତେ ହବେ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ ଖାଦେମ-ଇନାମ, ମୋହା-ମୁନଶୀ, ଇଉନିଯନ ବୋର୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଟ୍, ମାନୀ-ଶୁଣୀ ଲୋକ ସବ । ଏଦେରକେ ଅମାନ୍ୟ କରା ଯାବେ ନା ।

ଏକଟୁ ଯେନ ବଲ ପେଲୋ କୁରମାନ । କିନ୍ତୁ ତାର ବାଡ଼ିତେ ଥାକତେ ପାରବେ ନା ଆର ନୁରବାନୁ । ବିରାଳା ପର-ପୁରୁଷେର ସରେ କୀ କରେ ଥାକତେ ପାରେ ସମର୍ଥ ବସ୍ତେର ମେଯେହେଲେ? ପାଶ-ଗାଁୟେ ତାର ଏକ ଚାଚା ଆଛେ, ବେଚାରୀ ନାଚାର, ସେଥାନେ ମେ ଥାକବେ । ଇନ୍ଦ୍ରତେର ତିନ ମାସ ।

ଏକ କାପଡ଼େ କୌଦତେ-କୌଦତେ ଚଲେ ଗେଲ ନୁରବାନୁ । ଯେନ କୁରମାନକେ ଗୋର ଦେଓଯା ହେଁବେ । ପୁଣ୍ତେ ରେଖେଛେ ମାଟିର ନୀଚେ ।

ତାଛାଡ଼ା ଆର କି? କୁରମାନେର ହାତେର ନାଗାଲେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ, ତ୍ଵରିତ ବାଡ଼ିଯେ ତାକେ ମେ ଧରେ ରାଖତେ ପାରଲୋ ନା । ସାମାନ୍ୟ କଟା ମୁଖେର କଥା ଏମନି କରେ ସବ ନାଭାନାବୁଦ୍ଧ କରେ ଦିତେ ପାରେ ଏ କେ ଜାନତୋ! କୁରମାନେର ନିଜେର ରାଗ ନିଜେକେ ଯେନ କୁରେ କୁରେ ଥାଇଁ ।

ଦ୍ୱାଦୁଇ ହେଁ କୁରମାନ ଚଲେ ଗେଲ ଦକ୍ଷିଣେ । ନୁରବାନୁ ଛାଡ଼ା ତାର ଆର ସରଦ୍ୟାର କୀ! ସରେର ଇଉରେ ଖାଓଯା ପାଟସାରିର ବେଡ଼ା ଭେଡି ଭେଡି ପଡ଼ିଛେ, ତେମନି ଭେଡି ଭେଡି ପଡ଼ିଛେ ତାର ବୁକେର ପାଂଜରା । ଚଲେ ଗେହେ ଦକ୍ଷିଣେ, କିନ୍ତୁ ମନ କେବଳ ଉଭୟରେ

ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাপ খোলে। কোথায় নূরবানু? চৈতী মাঠের মতো বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নূরবানু। যেন একটা অন্যায় করছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি বাঁপিয়ে ধরতে চায় নূরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নূরবানু বলে, ‘না এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।’

বলে, ‘তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম। বড়ো মন কেমন করে?’

বড়ো কাহিল হয়ে গেছে নূরবানু। বড়ো মনমরা। গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জুলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আর্থু গোছগাছ করে দেয় নূরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে। ‘তোকে কি আর ফিরে পাবো নূর?’

‘নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ত্রাস্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেওয়া।’

‘আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।’

‘ইস! নূরবানু ফণা তুলে ফৌস করে উঠলোঃ ‘দশ-সালিস ওকে ছাড়বে কেন?’

‘না ছাড়লেই বা কি, ও স্পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়।’

‘ইস, করুক দেখি তো এমন বেইমানি।’ আবার ফৌস করে ওঠে নূরবানু : ‘বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।’

নূরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

‘গা-টা তেতো-তেতো করছে জুর হবে বোধ হয়।’

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নূরবানু। হাত গুটিয়ে নিল বাট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নূরবানুর ঘরের দরজায়। নূরবানুর চোখে ঘূম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে। বলে, ‘কেন পাগলের

মতো ঘুরে বেড়াছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।’
‘কবে আসবি?’

‘দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্বাবার কলমা পড়বে। তারপরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।’

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে। যেখানে এত প্যাচ-রোচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ, দেদার আসমান।

শিগগির বাড়ি যাও, কুরমান চোর, কুরমান পরপুরুষ।

জুম্বাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কই, শনিবারে তো তালাক নিয়ে চলে এলো না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অঙ্করের তিন কথা। বলবে, যরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মতো নয়, দেনাদারের মতো।

উকিলদি বললে, ‘আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইঞ্জী হচ্ছে না, ইঞ্জী না হলে তালাক হয় কি করে?’

যতসব ফাঁকিঝুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে অষ্টাঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসালো। জানালো তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে। কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদি বললে, বিয়েই এখনো সিন্ধ হয়নি, ফলস্ত-পাকস্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকপোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরাচোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না। দরজায় খিল দিয়ে ভেবেছে কলমা পড়ার পরই বুঝি ও তালাকের কাবিল হলো। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কী করে?

সত্যাই তো। দশ-সালিশ রায় দিলো। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কী করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মতো।

ঘরে চুকে দরজায় খিল দিলো নুরবানু।

পরদিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উকিলদি নুরবানুকে তালাক দিলো।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হঁকে ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মতো চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের সব। ভাঙ্গন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মতো চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকালো নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁট পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরতের নতুন শাড়ি। পরতে-পরতে যেন খুশির জলের শ্রেত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মৎসের গাঢ়।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

‘ইন্দত আমি এখানেই কারবার করবো। দিন হলেই মোঞ্চা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি।’ নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

নেবা হিঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বললো, ‘না, আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।’



রানী সাহেবা

বিমল মিত্র

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটি মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়তো আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়াবাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরে বাণী-বিদ্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রানী দে, কৃষ্ণ রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথনকে জবলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি নীলনেশার রায়সাহেবকে, প্রফেসরপত্নী কণিকা দেবীকে। আর আরো দেখেছি সবজি বাগানের সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকের রানীসাহেবা—

রানীসাহেবাকে আজ এতদিন পরে আবার—! বেহারের এই দুর্গম পঞ্জীতে রানীসাহেবার একদিন দুদিনের নয়, সুদীর্ঘ পাঁচশ-তিরিশ বছরের সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গঁরু লিখি তা সে এই রানীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহৌড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃগালিনীর বিয়ে—রানীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃগালিনী। অনেকদিন পরে যখন প্রথমে সভান হলো, গোকুল জিগ্যেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের—

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ধাঁটাধাঁটি করছি। নাম দিয়েছিলাম—শুকুম্বলা—

কিন্তু সে নাম টেকেনি। শেষ পর্যন্ত মার ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছেকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপারেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায়-প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে মানুষটি শাসন করতো, সে মৃগালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রানীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে গোকুল—আমার উন্নতির মূলে রয়েছেন আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা, তাঁর

সেবা, তাঁর যত্ন, তার ঐকান্তিকতা—

সত্যি সত্যি বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কীই না হয়েছিল। এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম এল এ, সেনেট সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালোবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো।

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রানীসাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী করে। বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, প্রাসাদই বটে। শুলাম, সাতানবই বিয়ের ওপর বাড়িখানা। কিন্তু সকাল থেকে যে ব্যাপার চলছে, তাকে কে বলবে দেখে যে বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি, তাঁদের আদর-আপ্যায়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা প্রামের হাজার হাজার পঞ্চাশ সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাডু, পেড়া, শুলজামুন, বালুচাই, পুরি, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুঙ্গীজী এক-একবার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না।

পরের দিন যখন বর এল, কখন বিয়ে হলো ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈকি। রায়সাহেব গোকুল মিস্টিরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুঙ্গীজীকে বললাম—একবার রানীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না—

মুঙ্গী হয়তো প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দর-মহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে আসতে তাও প্রায় একষষ্ঠা লাগলো। সত্যিই তো বিয়েবাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে কার-ই বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুঙ্গীজী বললে—না হুঁজুর, রানীসাহেবার কড়া হকুম আছে, পুরুষমানুষ কেউ যেন অন্দরমহলে না ঢোকে—

মুঙ্গীজীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো মুঙ্গীজী। দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজার পর্দা খাটালো। ঘোমটা দিয়ে একজন বি এসে দাঁড়ালো দু-ঘরের মাঝাখানে।

মুঙ্গীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রানীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শিগগির বলে দিন।

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রানীসাহেবার সামনাসামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাতে এতদিন পরে বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারিতে বসে পর্যটান্সিশ বছর বয়সে বিগত স্থামীর বৃক্ষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্গে, এই আয়োজন এ-আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম। নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেবে গোকুল মিস্টারের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে এক সময়ে তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবিও কি কিছুই নয়।

মৃগালীনীর বিয়েতে দেবার জন্য কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুসীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না, আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রানীসাহেবাকে দিয়ে দিও—’

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা ট্যাঙ্কি ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। কিন্তু তা সঙ্গেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রানীসাহেবো। কোথাকার রানী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পরে থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রিটাই বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি।

কেন মহিলা সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তারা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পরদা ঠেলে এই রানীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন।

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে—এখনি বের করে দাও—

গোকুল যতখানি স্তুতি, তার চেয়ে বেশি স্তুতি মহিলা সভার সম্পাদিকা।

রানীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন রানীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো দুজন ভদ্রলোক, একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, যি, ঠাকুর। কারোর দিকে লাক্ষণ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে সবেমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বৌবাজারের ছোট দোতলা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ার দু-দুটো জুট মিল চলছে, আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অর্থনি সবে কিনেছে। ওদিকে কাউপিলের ইলেকশনে দাঁড়াবে কিনা

ভাবছে—অবস্থাটা এই রকম। মোটকথা সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সুত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন স্তৰীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুকও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে। স্তৰীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যাইহৈ ধীক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানসিনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপারটা বুবলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা আমি এখন উঠি তা হলে স্যার—একদিন সময়মতো আপনার অফিসে দেখা করবো বৱং—

বাবের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্তৰী।

—তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁগা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়—চাঁদা চাইবার নাম করে...ছি ছি...পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি—

আঃ কি হচ্ছে মিণ্ট—স্ক্রীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি—আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাঞ্চায় পড়ে মারা যেতে—ছি ছি! তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে—

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্রি আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিগ্যেস করল—তোর পাশে ও কে রে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর পুরানো ড্রাইভার। বললে—আজ্জে, চিন্তাৰ বড় ভাই—

গোকুলকে মোটরে উঠবার সময়ে নমস্কার করেছিল একবার। মনে পড়ল এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমাৰ নাম হৱিশ আজ্জে, চিন্তা আমাৰ ছোট বোন হয় আজ্জে—

স্তৰী ডান হাত চিন্তা। সেই চিন্তাৰ বড় ভাই।

অফিসে চুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হৱিশ ঘরের ভেতর উঠি মারে।

—কিছু দরকার আছে?

উপর দেয় না হৱিশ। টুপ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়।

এক একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে হয় একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্তৰী কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দেখ না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করে নাও। আগে না বলে-

কয়ে কয়েকদিন চুক্তেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর থেকে কেমন করে যেন সঙ্গে হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভালো, রাঙাঘাটে কত রকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা—

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরের থাকবার হ্রস্ব নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে চুক্তে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোহ।

স্ত্রী বলেছেন—রাত্তির বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা—অমন পয়সার দরকার নেই আমার—একবেলা খাবো ভিক্ষে করে পেট চালাবো তাও ভালো—তবু—

গোকুল বলেছে—না ভাই, ও-সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারা জীবন, স্ত্রীর পরামর্শ মতেই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে ঢাঁচা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছে কার কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে সমস্ত সবিজ্ঞারে বলেছে স্ত্রীকে—। টাকা, পয়সা, আধলা পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাঙ্কার সেনগুপ্তের কাছেও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন—সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত নারীজাতি বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—আমার মতো সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ রোগের কী চিকিৎসা বলুন তো—

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাঙ্কার জিঞ্জেস করেছিলেন।

—না।

ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না—যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান—সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের। মেয়ে হবার পর একদিন জিঞ্জেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল—ব্যাধি কমেছে—

—না ভাই, আরো বেড়েছে—গোকুল প্রিয়মাণ হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি?

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়তো ঠিক সত্যি কথা বলে না। কোথায় যেন একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর তুলনায় কম সতীসাধ্বী; কম পতিশ্চাণ। ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সমস্তিপূরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার

দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেবে উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি,
লাহেড়িয়াসরাইয়ের জমিদারি—সব।

যা হোক—সেই গোকুল মিন্দি—লেট রায়সাহেব গোকুল মিন্দিরের মেঝে
মৃগালিনীর বিয়ের নিমজ্জনে না বলতে পারিনি। পুরোনো বন্ধুদ্বের টানে পাঁচশো মাইল
দূর থেকে এই বয়সে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিংরুমের মধ্যে
চুপচাপ বসে বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী
ক্ষতি হতো।

এখনো ট্রেন আসতে দুঃঘটা দেরি।

হঠাৎ মুঙ্গীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো।

বললে—রানীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না—এই
চিঠিটা রানীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে—

মনে হলো বলি—রানীসাহেবা তোমাদের রানীসাহেবা, আমার কে। কিন্তু
নিজেকে শাস্তি করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—‘আপনি এমন
রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর-কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি
দেবতার সমান। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল—মেঝের বিয়ের পর বলবো
ইচ্ছে ছিল। এ-সুযোগ হয়তো আর পাবো না—দয়া করে ফিরে আসবেন—আমার
মান রাখবেন—’

রানীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে
হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক।
ওখানেই ওদের জমিদারি। রানীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়েস
যেন মৃগালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বিহারে তিন-চার পুরুষের বাস। এখানে
থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বেহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃগালিনীর বিরাট
ঘোমটা—তাও যেন কেমন অবাক লাগলো। ‘সুনীতি-শিক্ষা-সদন’ থেকে
আই-এ পাশ করেনি বটে, কিন্তু কিছুদিন তো সেকেন্দ ইয়ার ক্লাশ করেছিল। সেই
মেঝে যাকে নিয়ে অত কাও সেই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে
পারলে।

বর-কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার
হাজার লোক নাকি ক'দিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া করবে। রানীসাহেবার একমাত্র
মেঝের বিয়ে, তাদের হয়তো এই শেষ উৎসব।

সঙ্কেবেলা রানীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা
করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দেবস্তু করে
দেব, এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়—সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে—

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরোনো কথা মনে আসতে লাগলো—

পুরোনো বলে পুরোনো?

সে আয় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনাই বটে। আর রানীসাহেবা! কিন্তু তখন তো তিনি রানীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামশেদপুরের আরতি রায়। সেকেন্ড ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী।

গোকুল মিলিয়ের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে হঠাতে শোনা গেল।

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সঙ্গে যাবে টাটানগরে।

আর আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটায় ছুটি কাটাতে গেছি। হঠাতে গোকুলের চিঠি পেলাম—তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছ—তৈরি থাকিস—সদলবলে পরণ বিকেল বেলা হাজির হবো—

তখন নজরে পড়লো সত্যি সত্যি সামনের ঘোল নম্বরের বাগানে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বটে। সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে এরই মধ্যে। সামনে দু-তিনটে মোটর, লোকজন—।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ত একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকিমা ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাতে অত্যন্ত মৃদুস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়ল। তারপর আর একবার। উঠে র্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি!

সেই শীতের ঠাণ্ডা রাত—চারদিকে অন্ধকার—মনে হলো মানুষ নয় যেন পরী। বাইরের কুয়াশা, যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়েস হবে। আঠারো উনিশ। আমার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কী অঝোরে কাঙ্গা। এমন ঘটনায় বিলাস না হয়ে কি উপায় আছে!

বললাম— কে আপনি—কী চান—

দুঁকাঁধে ঝাকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কার্য তার আরো করণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসেছে সে এত রাত্রে।

পাঁচশি-তিরিশ বছর আগেকার কথা, সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে সে রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কৌতুকপূর্ণ। ঘোল নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে—তাকে আমার তখনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে-ঘর, তার পূর্ব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সেই রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে—আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন—জিঞ্জেস করলে বলবেন আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি—

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমতো অগত্যা সেই শীতের মধ্যে ডাকতে গেলাম ঘোল নষ্টের অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারি রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা। বিকাশ যখন এল আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল ভয়ার্ত আবেদন। বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কি কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন—একটু কষ্ট দেব আপনাকে—

আমার ঘরের বিছানায় ওদের দু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বাধের মতন বাইরে চলে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়। শুধু এতটুকু মনে আছে যে সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জলেছে আর আমি না-সুম না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়াল ক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, দুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে—সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো-টাকরা কথা, কানার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুল-ওভার। জামশেদপুরের সেই কলকনে ঠাণ্ডা শীত সে পুল-ওভার কতটা আর আটকাতে পারে!

ডোর হ্বার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোনোও কথা বলা বা ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় নটা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুদ্ধি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীরা দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন বিকেলে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্রোধ হয়ে এল।

আরতি রায়। সেই রাত্রের আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি।

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশিই হয়েছিল। বরযাত্রী দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজের বিবেকের সঙ্গে যে বিরোধ সমস্ত মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে রেখেছি সারাজীবন তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বউভাতের দিন বঙ্গুরা এক-একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধূতির নরন পাড়ের মতো সারা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্লোর প্রাণ্ডে আলতো ভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন। সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি না ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে ঘৃন্তি আছে

তাও বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-
বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দুরের কথা।

পরে অনেকদিন গোকুল বলেছে—ভারি ইন্টেলিজেন্স—জানলি—কিন্তু তোর
ওপর ওর খুব রাগ—কেন বল তো—

বলতাম—ব্যাচিলরদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকে—

তারপর তাঙ্গে আঙ্গে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত
থেকে ধনী—ধনী থেকে লক্ষ্মপতি—সে ইতিহাস এখানে অবাস্তু। কখনও কঠিং
কদাচিং দেখা হতো—আবার কখনও ঘন-ঘন। অতবড় ব্যবসাদার, নানান কাজের
মানুষ কিন্তু ব্যাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পর কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই, ও-সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ
নাই বা করলাম—

সংবর্ধনা-সভায় উঠে দাঁড়িয়ে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতির মূলে
আগনীরা আমাকে যে সম্মান দিচ্ছেন, সে সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, অনেকখানিই
প্রাপ্য আমার স্ত্রী—আমি অকৃষ্ণভাবে স্বীকার করছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রীর
ঐকাণ্ডিক নিষ্ঠা ভালোবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছু করতে...ইত্যাদি
ইত্যাদি।

সংবাদপত্রে সে রিপোর্ট সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই
পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতুহল আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের
মতো বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে একবার
টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশের র্যাজও করেছিলাম। কাকার
বাড়ি সি রোড থেকে তখন এফ রোডে হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে
যাওয়ার মতো বিকাশ সেদিন হয়তো সৌভাগ্যক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং
অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো...কিন্তু সে-কথা এখন থাক, নইলে রানীসাহেবাকে
নিয়ে গঞ্জ লেখবার প্রচেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্রির বৌবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে
ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ ধাপে ধাপে উঠে উঠে গেছে। সাধারণ
লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের শীর্ষে
উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি। কিন্তু গোকুল
ব্যাবর বলেছে—না না, আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছেন মিসেস
মিত্রি—আরতি—মিণ্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি, গোকুল
সাপ দেখার যতো লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি
হয়েছে—তামাশা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন হাসির কী আছে—ওই তো ভালো—তোমাদের

যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিব দিয়ে নাল পড়ে।

ঠাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিস্ত্রীর কাছে। কিন্তু মহিলা-সমিতি, গার্লস স্কুল কিংবা দুঃস্থ বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল, এক আমাদের সুনীতি শিক্ষা সদন ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপন্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সঙ্গে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দশে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়তো আঘাত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক একবার মনে হতো হয়তো আমারই ভুল। আমারই মনের ভুল কিংবা চোখের ভুল। সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি রোডের সামনের ঘটনার শুধু নিছক বিন্দু মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৌতুহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ ত্রিগুণ চর্তুগুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রানীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুর প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিস্ত্রির যখন মারা গেল হঠাত, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শুকুম্বলা নয়—মৃগালিনী। মৃগালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিস্ত্রির ওই মৃগালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পালকি-গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা। জানালা দরজা খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা। জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক্ ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর—

তারপর ভর্তি হলো আমাদের সুনীতি শিক্ষা-সদনে। গীতাপাঠ, স্নোত্রপাঠ, আর তার সঙ্গে আই-এর কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনোও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ কারবারের কলকাঠি মিসেস মিত্রের হাতে। তখন সেই সময়ে একদিন আগুন ঝালে উঠল।

সেদিন কলেজে নিয়মিত গেছি। ক্লাস বসে গেছে। হঠাত মিসেস মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস মিত্রের দারোয়ান। পিওন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলাম। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্জাঘাত হলো।

সিল করা চিঠি। বিশেষ জরুরি এবং গোপনীয়।

টাইপ করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নীচে মিসেস মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস মিত্রের মেয়ে মৃগালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে সুনীতি শিক্ষা-সদনের ইংরেজির প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল সে চিঠির জবাব দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস মিত্রের এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃগালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মতো প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন সুনীতি-শিক্ষা-সদনকে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচরিত্র লস্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের থলুক করবার জন্য—সে প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনো আইন দেশে আছে কিনা—এবং না থাকলে সে আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রবরের শুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহলোক বহুদিন ধরে সন্দেহ করে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী শুণাদের কূটনীতিতে এতদিন সকলের দৃষ্টি অঙ্ক হয়েছিল। সুনীতি-শিক্ষা সদনের এই দৃষ্টান্ত এবার সকলকে ইত্যাদি।

তিনগৃহাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনো প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারা স্থত হতে বাধ্য হবেন।

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যাপেলারের কাছে—আর একখানা চ্যাপেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, তাঁর উন্নতের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোনো সুরাহা হতো বলে মনে হয় না। কারণ মিসেস মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম। কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামশেদপুরের সেই বারো নম্বর সি রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে রঞ্জও বলা যায়। অনেক দেখেশুনেই তাকে ভর্তি করেছিলাম। ইংরেজি, হিস্ট্রি আর ইকনমিক্সে এম-এ দিয়েছে। তিনটেই ফাস্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঞ্চকা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উন্তরে যে কথা সে বলেছিল তাতে তার বিশেষ কোনোও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে—

সেদিনকার মৃগালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম। খড়খড়ি বন্ধ পালকি-গাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আসতো রোজ। মিসেস মিত্রের কড়া নজর আর কোচোয়ান

চাকর যি দারোয়ানের নজরবদ্ধী হয়ে থেকে থেকে একমাত্র বোধহ্য কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চট্টল চলা আর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুক্তাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুভির শাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাশের বাইরে দূর্দশ ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পালকি গাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতরে এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই বিষাদ-মলিন চেহারা হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েরকেই দুঃহাত নিচ ঘোষটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কমবয়েসী স্বামীর সঙ্গে শুশ্রবাড়ি যেতে দেবে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক চিঠিটা পেয়েই মিসেস মিডের বাড়ি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে—দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে। সাদা থান, তুষারধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্তুল মাংসপিণ্ডের তলায় জামশেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরন্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফরি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাতে এক ফাঁকে উকি মেরে দেখে ফেলে! কিংবা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলে-মেয়ের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তা হলে বাপ-মায়ের মনে কতখানি দুঃখ হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধুপত্নী নন—রায়সাহেবে গোকুল মিডের প্রচুর সম্পত্তিশালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্তুল উঠিয়ে দিন—যদি তা না দেন তবে জানবেন ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ আর মনের ধর্মনাশ ও একই কথা—

তারপর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরোনো টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস মিডের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস মিত্র কপালের চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার—

ফাইলটা আসতেই মিসেস মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু, এই তেত্রিশের ফোলিওটা দেখে রাখুন—মাসে মাসে সুনীতি-শিক্ষা-সদনের নামে যে পাঁচ হাজার করে টাঁদা বরাদ্দ আছে—আজ একটা চিঠি ড্রাফ্ট করে দেবেন—ওটা ক্যানসেলড হবে—আর ওদের ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও

ফেরত দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে—

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ভাকলেন—চিন্তা—

চিন্তা এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো—

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর, শুনে রাখ, কাল যখন আপিসে
যাবি একবার আমাদের অ্যাকাউন্টেটকে দেখা করতে বলবি—খগেনবাবু আমার
সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার—

তারপর চিন্তার দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁ রে, মিনু বার্লি খেয়েছে, না
এখনও...একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে...আর যজ্ঞেশ্বর—শোন ইদিকে—

যজ্ঞেশ্বর ঝুকে পড়ে বললেন—মা—

—একবার বড় ডাঙ্কারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা—নইলে দেরি
হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—পফুলবাবু, আপনি এ-মাসে ডাঙ্কারবাবুর
মেডিকেল বিলগুলো এখনও দেননি কেন—কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি
হয়—আমি যেদিকে না দেখবো...।

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন
সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনের সঙ্গে—কোথায় কোন ফুটো দিয়ে বুঝি সব
নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাতে আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও, আপনি এখনও বসে
আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিছি—চিন্তা, চা নিয়ে আয় তো এক কাপ—

কী জানি হঠাতে মিসেস মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম—
সামনাসামনি প্রত্যক্ষ দেখে কেমন যেন ওর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের ওপর
আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস মিত্র কি সত্তি সত্তিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম।
চারদিকে উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মতো। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্য?
জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্-
সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত সত্তি সুনীতি শিক্ষা-সদনের মাসিক মোটা চাঁদাটা বক্স হয়ে গেল।
গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা—তাও একদিন ওদের লোক এসে
খুলে নিয়ে গেল। তবু টিমটিম করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও
বক্স হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে মিসেস মিত্র যেয়েকে নিয়ে তাঁর
লাহোড়িয়াসরাই-এর জমিদারিতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর,
সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়তো আঘাতক্ষা করতেই চেয়েছিলেন।
কুমারী জীবনে যে দুর্বলতার প্রশ্ন দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস মিত্র হয়ে তিনি

সারাজীবন তার প্রায়শিকভাবেই হয়তো করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোনো বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়তো তাঁকে তাঁর লাহোড়িয়াসরাই—এর দুর্গম বন্দিনিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃগালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়সী স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুসীজীও বলছিল—ওরা হজুর বড় ভারী জমিদার—বনেদী বংশ ওদের—ওদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়ি আসতে পারবে না—বড় ভারী বনেদী জমিদার ওরা হজুর—

সকালবেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুসীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস মিত্রও নয়, আজ রানীসাহেবা! সেই দুর্গম পঞ্জী প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কৌচ। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর ফটো। দুটো মানুষ—সমান অয়েল পেন্টিং; একটা গোকুলের আর একটা রানীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রানীসাহেবা।

বহুদিন পর দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপন্তি করবেন না—ওটা প্রসাদ—আমার বিশ্বাসের দেবকীনন্দনের—

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুটিশুভ্র আর তুষারধল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নামজপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়েছে। বুঁবি ইষ্টলাম জপ করছেন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার—তারপর খানিক খেমে বললে—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্য আমার ভারি ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন—

দেয়ালের অয়েল পেন্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে, আমি নাকি ওঁর উন্নতির মূলে—কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি—ওঁর ভালোবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমতো ঘরে-বরে দিতে পারতুম—আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আগনীরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কোনোও বাধা এল না—তাছাড়া—

আরো এমন দু-একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ যেন সে-মানুষ নন। আরতি

রায়, মিসেস মিত্র আর আজকের এই রানীসাহেবা—এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্নরূপ। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন আরতি রায়—সে কি আজ রানীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে? কিংবা হয়তো রানীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে দেখে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রানীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে এমন করে অসঙ্গে আমার চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রানীসাহেবা!

মামুলি বিদ্যায়-অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনু—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি হাসি-মুখ! হাসি দেখে কেমন যেন খটকা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতুম—

—বলুন না, কী কথা—

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃগালিনী—আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল—কেন জানেন?

—না, কেন?

—আপনি আগে বলুন, কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখেছিলেন?

—আমি কিছু মনে করে ও নাম রাখিনি। কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—

—আপনি সত্যি কথা বলছেন? —রানীসাহেবা হঠাতে যেন বড় ঝজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাতে এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিষ্ট হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি; ও কি হাসি নয় তবে—জ্বরুটি?

তারপর আমার দিকে তেমনি ভাবে তাকিয়েই রানীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনোও ফাঁকি ছিল না—যদি এতদিনের পরিচয়েও সেটা না বুঝে থাকেন তো...

বলতে বলতে থেমে গেলেন রানীসাহেবা। তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন, উনিও নেই, মিনুও জন্মের মতো পর হয়ে গেল—আজ আর বলতে দোষ নেই—কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তো আর কেউ না বুঝুক—আমি বুঝেছিলাম—

আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

—কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্য নন—শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে—বলতে বলতে বিদায়-সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। খালিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়সের ক্রটির জন্য যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শিক্ষণ করতে হয়েছে—সমস্ত বিলাস ব্যবসন শহর সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন—আজ রানীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য কিন্তু এই রানীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য!

মনে মনে সকলে করলাম—রানীসাহেবাকে নিয়ে এখন গৱ্ন লিখবো না। ওই মৃগালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মাধিকারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রানীসাহেবাকে নিয়ে গৱ্ন লেখার উপযুক্ত সময়।

সেই আমার রানীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পরে যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো সেটি না ঘটলো রানীসাহেবাকে নিয়ে গৱ্ন লেখবার কোনোও সার্থকতাই থাকে না। এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটি বলি।

এক সুগার মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির।

সকালবেলো। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট।

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রসপেক্টাসখানা একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাকসুইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি কে কে গুপ্ত এন্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্ নতুন হলেও ফার্ম বর্ষদিনের, প্রেফারেনসিয়াল শেয়ারে ডিভিডেন্স এইট পারসেন্ট আর অর্ডিনারি শেয়ার হলো...

উল্টেপাল্টে দেখলাম। ‘নরকটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফাকচারিং এন্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি কে গুপ্ত এন্ড কোং’। সাদা অ্যান্টিক পেপারে রয়্যাল আট পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালাঙ্গশিট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়তো ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস—কিন্তু বি কে গুপ্তকে যাঁরা জানেন তাঁদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন...মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেক্নোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন—এতদিন পরে ইভিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে নিয়েছেন—অস্তুত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই—ছোটবেলায় একজন নিজের গাঁটের

পয়সা খরচ করে ওঁকে জাপানে পাঠায়—অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন কি না—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে
বলি—বেহারের রানীসাহেবার নাম শনেছেন?

চমকে উঠলাম।

তিনি নিজে এর পেছনে আছেন—তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার
কিনেছেন এরই মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকার...

বললাম—রানীসাহেবা?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিশ্বয় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্জে ইঁয়া, বেহারের রানীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো
বোঝায়—আপনি চেনেন নাকি—তা সেই রানীসাহেবাই ওঁকে কুড়ি বছর ধরে
আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন—ফরেন কোনোও ডিগ্রী আর
বাকি নেই আর কি—দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রানীসাহেবাই ওঁকে ডেকে
এনে ওইতে নামিয়েছেন—আসল কোম্পানিটা রানীসাহেবারই বলতে
পারেন—অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরিবই ছিলেন—জামশেদপুরে
পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন—

—কী নাম বললেন? আমি শিরদীঢ়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম?

—আজ্জে আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম মিস্টার গুপ্ত।

—পুরো নাম?

—মিস্টার বি কে গুপ্ত।

—না, না—ইনিশিয়াল নয় পুরো নামটা কী?

—বিকাশ গুপ্ত।



সুবর্ণা

সমরেশ বসু

প্রায় মাস চারেক পরে শিল্পীবন্ধু ভুবনের একটি দীর্ঘ পত্র পেলাম। লিখেছে :
ভাই নীরেশ, নিশ্চয় এতদিনের নীরবতায় রাগ করেছিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এতদিন
বঙ্গ দরজার অঙ্ককার কোণেই পড়েছিলুম। কাকুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না।
মা আমাকে এত বেশী চেনেন যে কখনো ডেকে জিজ্ঞেস করেন নি, ঘরের কোণে
কেন আমার এ নির্বাসন। কাজের মধ্যে হাঁক-ডাক ছটোছুটি করা আমার অভ্যেস,
যে জন্য বঙ্গদের ধারণা, ঘোল আনা প্রতিভার সিকিখানেক আমার বাকী রয়ে
গেল, আমি বারো আনার কারবারী রয়ে গেলুম।

সেই আমি এতদিন রং তুলি ছুইনি, বঙ্গুহীন একলা ঘরে একটা অসহ কষ্ট,
তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাময় একটি বিশাল অঙ্ককার জিজ্ঞাসার গ্রাসে চাপা পড়েছিলাম।

অথচ আমি জানি, কারণটা শুনলে তোমরা সবাই খুব তুচ্ছ মনে করবে।
হাসতেও পার। না হয় তুচ্ছ মনে করা গেল, না হয় হাসাই গেল, কিন্তু তুচ্ছও
যে ক্ষেত্র বিশেষে বড় উচ্চ হয়ে বাজে, বহুর গভীরে পৌঁছায় তার প্রতিধ্বনি,
তা মানবে আশা করি। আমার বেলায় তাই হল। একটি তুচ্ছতাই আমার চিরদিনের
দরজা-বন্ধের কৌতুহল ও আগ্রহ হয়ে রইল।

দলীলতে, ফ্রেঞ্চ এম্ব্যাসি থেকে যখন প্যারিস অদ্যশনীর কথাবার্তা বলে বেরিয়ে
এলুম, মনটা তখন আনন্দে ভরপূর। ভাবলুম, কলকাতায় ফেরার আগে কোথাও
একটু বেড়িয়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আগ্রার কথা। আগ্রার
সঙ্গেই একটা অপরিচিত কৌতুহল, একটা মেয়ের মৃত্তি ধরে আমাকে ডাক দিল।
যার নাম জানি, অনেক সংবাদ জানি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি, মৃত্তি সেই
সুবর্ণা রায়ের। সুবর্ণার দু'একটি পত্র তুমিও দেখে নিয়েছ আমার কাছে। একটু-
আধটু ঠাট্টাও করেছ। কারণ তোমরা যাদের Fan বল, এমন অনেকের সঙ্গে
আমাকে পত্রালাপ করতে দেখেছ, কিন্তু দু'বছর ধরে পত্রে যোগাযোগ রাখতে
কখনো দেখিনি। আর তা রাখিনি কারুর সঙ্গে, কারণ সম্ভব নয়। কিন্তু সুবর্ণার
সঙ্গে যে কেন রেখেছিলুম, আমি নিজেও তা খুব ভালো জানিনে। বোধ হয়
ওর পত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মেয়ে, একটি বিশেষ মনকে ঝলকে উঠতে

দেখেছিলুম। যার অনায়াস গতির মধ্যেও একটি আশচর্ষ ব্রীড়া জীলায়িত হয়ে উঠেছিল। অপরিচয়ের মধ্যেও, চোখে একটি ধরাপড়া পরিচয়ের হাসি ছিল লুকিয়ে। আমার ভাল লেগেছিল। তাই, সুবর্ণার প্রথম অনুরোধেই ওকে ‘তুমি’ সম্মেধন করেছিলুম। পত্রে কথা দিয়েছিলুম, আগ্রায় যদি কখনো যাই, ওকে নিশ্চয় সংবাদ দেব, দেখা করব।

আমার খেয়াল ছিল, সুবর্ণা এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিল্লী থেকে দিল্লুম চিঠি লিখে। তারিখ দিয়ে জানালুম, তিনি দিন পরে, সকালবেলার ট্রেনে আগ্রা পৌছুচ্ছি। এবং কোন হোটেলে উঠব সেটাও লিখে দিল্লুম।

ঠিক তারিখ মতোই সকালবেলা আগ্রা গিয়ে পৌছালাম। যাত্রার তেমন ভীড় ছিল না গাড়িতে।

টিকিট কালেক্টরকে টিকিট দেবার মুহূর্তেই, গেটের বাইরে লক্ষ পড়ল একটি মেয়েকে, যে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আমি বাইরে এলুম। মেয়েটির মুখে যেন একটু হাসি বিলিক দিয়ে উঠল। সে আমার সামনে এগিয়ে এলো আরো। প্রায় অপরিচিতার মতো।

আমি জিজ্ঞেস না করে প্রারলুম না, আপনি কি সুবর্ণা—

কথার আগেই সিঙ্ক শাড়ির আঁচল এবং আবাঁধা এলোচুল প্রায় লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। ও যে সুবর্ণা, এতে যেন সেটাই প্রমাণ করে দিলে। এসবে আমি ভীষণ অনভ্যস্ত। লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, এ কি করছেন।

ততক্ষণে সুবর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, ‘আপনি’ করে বলছেন যে?

সেটা নিশ্চয় আমার প্রথম দর্শনের আড়ষ্টতা। কিন্তু সুবর্ণা শাস্ত্রসম্মতভাবেই সুবর্ণা। এবং বিস্বোষ্ঠা, এবং আয়ত কালো চোখ এবং—

থাক। সুবর্ণার বর্ণনা আমার পক্ষে লিখে দেওয়া সন্তুব নয়। ওটা তোমাদের এক্সিয়ারে। শুধু পত্র লেখায় যাকে দেখেছিলুম, এ সুবর্ণা তার চেয়ে কিছু বেশী কিংবা পত্রে যা ঢাকা ছিল, শারীরিক আবির্ভাবে ঘুচে গেল তা। ওর চোখের গভীর থেকে যেন একটা স্বপ্নে পাওয়া খুশি উপচে পড়ল। যেন বাতাসের ঘায়ে একটি বেপথু ফুল। দেখলুম ওর চোখের ওপর এসে পড়েছে সাপের মতো চুলেরগুচি। মিথ্যে বলব না, স্বপ্ন ভর করল আমারই চোখে।

জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে চিনলে কেমন করে?

অনেকদিনের পরিচিতার মতই একটু লজ্জা মিশিয়ে বলল, যেমন করে সবাই চেনে। কাগজে ফটো দেখেছি।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামাল। কিন্তু মাথায় মালপত্র নিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে। বললুম, সুবর্ণা, আমি এখন হোটেলে যাব।

সুবর্ণা বললে, ওবেলা কিন্তু আমি আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাব। আর, এখন আপনার সঙ্গে একটু হোটেলে যাব?

ওর অনুমতি চাওয়া দেখে, ওকে যেন আরো বেশী করে চেনা গেল, মনে
মনে খুশী হয়ে বললুম, তোমার অসুবিধে না হলে—

সুবর্ণা যেন ওর উচ্ছাসকে চাপা দিয়ে বললে, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে
করছে না একটুও। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

বললুম, একটুও না।

মনে মনে অবাক হলুম। দেখামাত্র এতখানি মুক্তা, প্রায় যেন মোহের সঞ্চার
করল আমার মধ্যে। থরে বিথরে সাজানো আমার ত্রিশোধৰের বুকের একটি
নিশ্চিন্ত জয়গা সহসা এমনি এলোমেলো হয়ে উঠছে কেন? সুবর্ণাকে দেখে সব
থেকে আগে আমার আঁকার কথা মনে পড়ল। এবং এই প্রথম আমার মনে
হল, আমার সব রং জড়ো করলেও বুঝি ওকে কুলোবে না। আমার সব গতি
দিয়েও ওকে হয়তো ধরা যাবে না।

ওকে সঙ্গে করে যেন নিম্নে হোটেলে এলুম। দোতলায় আমার ঘর ঠিক
করাই ছিল। ঘরে ঢুকে, সুবর্ণাকে বসতে বললুম। বেয়ারাকে বললুম চা খাবার
দিতে।

কিন্তু সুবর্ণাকে দেখলুম, মাথা নত করে টেবিলে আঙুল খুঁটছে এবং হাসছে।
জিজ্ঞেস করলুম, কি হোল?

সুবর্ণা প্রায় ফিসফিস করে বলল, ভীষণ লজ্জা করছে।

দেখলুম, সত্যি ও আরক্ষ প্রায়।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

বলল, চিঠিগুলোর কথা মনে করে। আমার চিঠি গড়ে আপনি নিশ্চয় খুব
হাসতেন?

বললুম, কাঁদিনি তো বটেই।

সুবর্ণা হেসে উঠল। আবার চোখ নামিয়ে বলল, কিন্তু নিশ্চয় ভেবেছেন,
মেয়েটা ভারি বেহায়া।

বললুম, না। ভেবেছি, মেয়েটি ভুবন চৌধুরীকেই বেহায়া করে তুলল। তাই
ছুটে এলুম।

সুবর্ণার হাসি যেন চূড়ির নিকনে বেজে উঠল। বললে, ইস্?

আমিও হেসে উঠলুম।

কিন্তু সুবর্ণার মুখে একটি করুণ ছায়া পড়ল সহসা। আমি যদিও বয়স এবং
মান, দুই-ই বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলুম, তবু জিজ্ঞেস করলুম, কী সুবর্ণা?

সুবর্ণা চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। এবং অস্কোচে বলল, আপনি এত
দেরী করে চিঠি দেন, আমার কষ্ট হয়।

সুবর্ণার গলায় তার কষ্ট এমন সহজ ও অনাড়ুন্বর ব্যক্ত হল যে, আমি স্তুত
হয়ে গেলুম।

সহসা কিছু বলতে পারলুম না। সুবর্ণাই আবার বলে উঠল, কিন্তু আমি ভাবতাম, আপনি আপন মনে ছবি আঁকছেন, আমার কথা আপনার মনে নেই। মনে যখন পড়বে, তখন ঠিক ঠিক দেবেন।

তখন আমার নিজের মুখ আড়াল করতে হয়েছে। ওর অসহায় ব্যথাটা যেন আমাকে চেপে ধরল।

আমি কিছু বলার আগেই, বেয়ারা এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। ফিরে দেখলুম সুবর্ণার পলকহীন চোখের দৃতিতে বিশ্যায় ও আনন্দ রৌদ্রচকিত দীঘির মত অন্যায়। বললে, আপনাকে দেখার জন্যে কতদিন ধরে বসেছিলাম।

জিঞ্জেস করলাম, কেমন দেখলে?

বললে, বলতে পারব না।

সুবর্ণার ঠোটে একটা বিচ্ছিন্ন হাসি ফুটল। তাকাল আমার দিকে। আবার চোখ নামাল হ্রেসে।

বলল, আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। কিন্তু এবার যেতে হবে।

যাওয়ার কথা শুনে আমি বিমর্শ হয়ে উঠলুম। বললুম, যেও, চা খাও আগে। চা যেতে খেতে বারে বারে ওর চোখে সেই ধরা-পড়া লুকোন হাসি আমি দেখতে পেলুম।

সুবর্ণা বললে, আমি এবার যাই?

বললুম, বিকেলে আসছ তো?

ও বললে, নিশ্চয়।

কিন্তু আবার বললে, যাচ্ছ অ্যাঁ?

বাবে বাবে জিজ্ঞাসায় ভিতরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। মনে হল সুবর্ণ যেন, রং-এর শেষ প্রলেপের পর, ঘাম তেল মাখা এক অলৌকিক উজ্জ্বল প্রতিমা। আমার হাত ওর হাতের কাছেই। আমার সব রক্ত যেন আমার হাতেই তখন আবর্তিত। কেন, সুবর্ণা এমন বাবে বাবে যাবার অনুমতি চাইছে কেন?

তারপরে সুবর্ণা যাবার আগে হঠাতে নীচু স্বরে বললে, আমি বোধ হয় সম্মান করতে শিখিনি। কিন্তু ভাললাগা আর মনের খুশিকে একটুও চাপতে শিখিনি। তাই আমার বুকের মধ্যে কতদিন কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

—কেন সুবর্ণা?

সুবর্ণা বললে, যাঁর ছবি দেখে আমার মন ভরেছিল, সেই মানুষের অঙ্গে হবার আশায় সব যেন আমার শূন্য ঠেকছিল।

একথা শুনে আমার বুকের রক্ত যেমন চলকে উঠল, তেমনি দিশেহারা হলুম, সুবর্ণাকে ঠোটে ঠোটে টিপতে দেখে। দেখলুম ; ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। আবার আমি নিঃসঙ্গে ওর একটি হাত ধরে প্রায় স্বলিত গলায় ডাকলুম, সুবর্ণা?

সুবর্ণা যেন স্বপ্নের লজ্জা থেকে সহসা জেগে উঠল। যেন নিষিঙ্গ হল আর

ওর মুখে চকিত হাসির আলো উঠল ঝলমলিয়ে। বললে, এবার তাহলে যাই?

আমি ভুবন চৌধুরী, এত দেখার পরেও সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারলুম না। হাত ছেড়ে দিলুম ওর। বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে গেল ও। আমি দোতলার বারান্দা থেকে দেখলুম। ও একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে হাসল তারপর হারিয়ে গেল।

আমার ঘরের সমস্ত নৈশেদের মধ্যে একটি লুকানো-আগের হাসি-কামার আনন্দধ্বনি আমাকে ঝাকুল করে তুল। আমার ভিতরের রং ও গতি যেন পেল আর এক নতুন মুক্তির সন্ধান।

রাত জাগার ক্লান্তি আমার গেল। কোনো রকমে স্নান খাওয়া সেরে বিআমের ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

প্রায় বেলা তিনটোর সময় বেয়ারা দরজায় ঘা দিল। বললে, এক মেমসাহেব দর্শনপ্রার্থী। আমর বুকের স্পন্দন বাড়ল। মনে মনে বললুম, মেমসাহেব নয় রে, ও যে মহারাণী। নিয়ে আসতে বললুম।

কিন্তু পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল, সে অন্য একটি মেয়ে। যার রূপ আছে, সজ্জা আছে কেশে বেশে নিপুণ। আশাহত বিশ্বয়ে বললুম, আমার নাম ভুবন চৌধুরী, আপনি?

বললে, আমার নাম সুবর্ণা রায়। আমি চম্কে, প্রতিবাদের সুরে বললুম, না। না। মেয়েটি আবাক হয়ে বললে, আমাকে কিছু বলছেন? আমি সুবর্ণা রায়। আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আজ পৌঁছুবেন বলে। পাছে ভুল হয়, তাই আপনার চিঠিটাও নিয়ে এসেছি।

চিঠিটাও ওর হাতে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি বললুম, ও!

কিন্তু আমার বুকের ভেতরে ঝড়ের দোলা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক ব্যথাধরা সংহাত। এও কি কখনো সংভব? কেন? তা কেন হবে? তবু, বলতে গিয়ে আমি থমকে গেলুম। যাক্ এখন নয়। হয়তো পরে কিছু জানা যাবে। কিন্তু এক অনিবার্য অসহায় আচ্ছন্নতা আমাকে ঘিরে রাইল।

এই সুবর্ণা বললে, দেখি।

বলে নমস্কার করলে পায়ে। আমি প্রাণহীন ভাবে বাধা দিলুম। আর সকালবেলার সুবর্ণার নমস্কার আমার মনে পড়ে গেল।

এই সুবর্ণা বললে, আমাদের বাড়ি যাবার সম্ভতি দিয়েছিলেন পত্রে। যাবেন তো?

মনে পড়ল, সকালবেলার সুবর্ণার কথা, আমি কিন্তু বিকেলবেলা আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

সে সুবর্ণা নয়? সে তবে কে? সে কে? আমাকে নিয়ে এমন খেলা তবে কে খেলেছে? সে যদি সুবর্ণা নয়, না-ই বা হল। সহশ্র ছদ্মবেশ তার থাকুক।

তবু সে কি আসবে না আর? আমি তো শুধু তার কথাই শুনিনি। আমি যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমার হাতে যে এখনো তার স্পর্শের অনুভূতি তীব্র হয়ে আছে।

এই সুবর্ণ উৎকঢ়িত বিশয়ে বললে, আপনার শরীর খারাপ না কি? থতমত খেয়ে বললুম, অ্যাঁ? উঁ, হাঁ।

এই সুবর্ণ বললে, তাহলে আপনি আজ বিআম করুন। কাল সকালে কিন্তু নিয়ে যাব।

আমি হেসে সশ্রতি দিলাম, কিন্তু চলে যেতে ওকে বাধা দিলুম না।

তারপর শেষ ফাল্গুনের বাতাসে ভর করে কখন রাত এসে পড়ল, জানতে পারিনি। কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণ এল না। সন্দেহ গেল, কিন্তু আমার বিনিদ্রিতাত শুধু একটি প্রশ্নে মাথিত হতে লাগল, সে কে? সে তবে কে?

আর কোন দিনই তার জবাব পেলুম না। তার পরেও চারদিন আগ্রায় ছিলুম। বিকেল বেলায় সুবর্ণদের বাড়ি গিয়েছি, আলাপ করেছি সকলের সঙ্গে, খেয়েছি, তাজে এবং দুর্গে আর ফাতেপুরসিঙ্গীতে বেড়িয়েছি। পথে পথে যত মেয়ে দেখেছি, চমকে চমকে তাকিয়েছি সকলের দিকে। আর কেবলি মনে হয়েছে, সকাল বেলার সুবর্ণ যেন অদৃশ্যে আমারই আশেপাশে ফিরছে আর মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুর খেলা? সে কে? তার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি? যত ভেবেছি, ততই সেই সকালবেলার কয়েকটি মুহূর্ত আরো স্পষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। চার মাস ধরে বক্ষ ঘরে শুধু এই ভেবেছি। সে যে কী অসহ যন্ত্রণা?

মনে মনে অনেক রাগ করেছি, ঘৃণা করেছি সকালবেলার সুবর্ণকে। কিন্তু মিথ্যে বলব না, তারপরেও কান পেতে আমি আমার কান্নাও শুনতে পেয়েছি।

ভাই, এ যাত্রা আর তোর সঙ্গে দেখা হল না। পরশু ফ্রাসে রওনা হচ্ছি। হয়তো যেতে পারতুম না। কিন্তু চার মাসের বক্ষ ঘরের অঙ্কুরার আমাকে একটি সত্যের আলোর বাইরে এনেছে। তা হল, আমাদের জীবনে দু'জনের আগমন এমনি ঘটে। যারা আসবার পূর্ব মুহূর্তেও কোনো জোনান দেয় না। ছায়া যদি বা ফেলে, আমরা টের পাইনে। একজন আসে জীবনে একবার। আর একজন হয়তো নানান বেশে একাধিকবার।

একজন মৃত্যু, আর একজন আমাদের মহাপ্রাণের চিরপ্রার্থিত স্পর্শমণি, মনের মানুষ। তারা আমাদের সীমানায় থাকে কিন্তু প্রত্যহের কুলায় ওরা কুলোয় না। আজ এই এখানেই ইতি করলুম।

—তোর ভূবন

ভূবনের চিঠিপড়া হল, কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণ ভাসতে লাগল আমার মানসপটে।



স্বামী হওয়া

বুদ্ধদেব শুভ

মহ্যা মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টোরী স্টেশনে ঢুকছিল। স্মিতা এবং আমি নীচু
প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা
থেকে হাট করতে এসেছিল ওঁরাও-মুণ্ডা-ভোগতা-কোল-হে-রা।

সুমন স্যুটকেসটা হাতে করে নামল। নেমেই দৌড়ে এলো আমাদের দিকে। এসে
স্মিতাকে বলল, কেমন আছে বউদি?

স্মিতা বলল, কেমন করে ভালো থাকি বল? তুমি এন্টিন কাছে ছিলে না।
সুমন হাসল। আমিও হাসলাম।

এর পর সুমন আমাকে বলল, রোলস রয়েস্টা এনেছো তো?
বললাম, এনেছি।

তবে, চল।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজঘড় অস্টিন গাড়িটার পিছনের দরজা খুলে
সুমন উঠে বসল। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সিটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হৃষি করে হাওয়া আসছিল। পড়স্ত রোদুর সেগুন গাছের বড় বড়
হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে সিঁদুর-রঙা দেখাছিল পাতাগুলোকে।
মহ্যার গন্ধ ভাসছিল। ঠেট মুখ চড় চড় করছিল রুখু বাতাসে।

স্মিতা বলল, তারপর? মা-বাবা বিয়ের কথা কি বললেন?

সুমন বলল, ধূত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশ্কি মেরে বলল স্মিতা।

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহার যাবো না।

চাঁদোয়ারই এক প্রাণে আমার কোয়ার্টার। সুমনেরও পাশাপাশি। সরকারী
চাকরীতে এইরকম জঙ্গলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌছে গাড়িটা খাপরার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বলল, তোমার বাহন ছেটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল তোরে চলে
আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘর-দোর ধূয়ে-মুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে

সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বলল, চানু কোথায়? চানু?

ততক্ষণে সুমনের গলা শুনতে পেয়ে চানু টাল-মাটাল পায়ে দৌড়ে এল বুধাই-এর মায়ের হেপাজত থেকে ছাড়া পেয়ে। বলল, সুমন কাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন সূটকেসটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝট্টকায় কোলে তুলে নিয়ে বলল, তা হলে আমি মরেই যাবো। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কী আমি বাঁচতে পারি? তোমার মা-বাবা পারলেও বা পারতে পারে। আমি কখনও পারব না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বলল, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

শ্বিতা, সুমন এবং আমিও হেসে উঠলাম।

শ্বিতা বলল সুমনকে, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায়?

দুপুরে আবার কোথায় খাব! যা হতছাড়া লাইন। এ সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মত কবি কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাতসকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। ম্যাকলাস্কিঙেজে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালাপাণ্ডি জর্দা দেওয়া পান গোটা আষ্টেক। সারা পথে।

শ্বিতা বিরক্তির গলায় বলল, তাই-ই। ঠোট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে। এখানের ফাটা লাল মাটির মত।

সুমন বলল, কথা না বলে শিগগিরি খেতে দাও তো!

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইঞ্জিনেয়ারটাতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি, গড়গড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড় কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে সব শুণ বোঝানো হয়, তার কোনো শুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই না-থাকার জন্যে।

তবে এই চাঁদোয়া-টোরীতে সরকারী কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। শ্বিতার জন্য। আমি তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময় বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশবছরের ছেট সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী শ্বিতা? তার সময় কী করে কাটবে? ভাগিয়ে চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল শ্বিতার। যে খেলনাকে খাইয়ে দাইয়ে, ঘূম পাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটতো কী না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হয়ে না আসত। বয়সে সুমন আর শ্বিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠল। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অভ্যেস ছিল না রান্না করার। অচিরে শ্বিতার সঙ্গে ওর একটা প্রগাঢ় সখ্যতা গড়ে উঠল। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন শ্বিতাকে কিন্তু ওরা যে কর বড় বস্তু একে অন্যের তা আমার মত কেউই জানত

না। সুমনকে পেয়ে শিতার যত ছেলেমানুষী শখ ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। পলাশ গাছে উঠে ফুল পাড়ত শিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুকুর পথে আমবারিয়ার বাংলোয় মুন্লাইট পিকনিক করত। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষী প্রত্নতাঙ্কিক পর্যবেক্ষণ চালাতো।

কখনও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটানগঞ্জের সাপ্তাহারের দেওয়া অস্বুরী তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইঞ্জিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হলো না এ কথা ভেবে আশ্চর্ষ হতাম।

বাওয়ার টেবিলে ডাক দিলো শিতা। আমিও এসে গেলাম। শিঙাড়া বানিয়েছে ও। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পাতিতজির দোকান থেকে সে ওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গব্গব করে খেতে খেতে সুমন বলল, আরো দাও, আরো দাও বউদি। তুমি এমন কিপ্টে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে?

শিতা কপট রাগের সঙ্গে বলল, কিপ্টে আমি? মালৰ্বানগঞ্জের বোসের ঘরের মেয়ে। ঐসব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বলল, দেখছো রবিনদা। এ শুরু হল। সর্বক্ষণ এমন এনিমি-ক্যাস্পে থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার ওরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেল। বাড়ি শিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুছির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন তোকে শেষে ওই রেফিউজিশনের আদিব্যোত্তায় পেল। ছিঃ ছিঃ।

কি বললে?

শিতা এবার সত্যিই বোধ হয় রেগে উঠল।

সুমন বলল, আহা রাগছো কেন, কী বললাম তাই-ই শোন। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকত তো, আকাশ-জোড় মাঠ, আদিসন্ত নদী কুত মাছ, কুত ধি, কুত কী...।

দিদিমা বললেন, থাক থাক। সব রেফিউজিই অমিদার ছেল। ওসব গল্প আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

বলেই সুমন হাসতে লাগল।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু ও এ কথাটা না বললেই ভালো করত। সকলেরই জমিদারি বা সচল অবস্থা না থাকলেও যাদের ছিল এ বকম কথা তালে তাদের বড়ই লাগে।

এখন বোধ হয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগত। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। কুত হয়েছে পুরোনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম...

...বরিশালে আমাদের দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দীর্ঘির পাড়ের সার সার নারকোলগাছের পাতায় চাঁদের আলো চক্রক করছে। সেরেঙ্গার দরজা জানালা বন্ধ। কুন্দলালজী তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ায় বসে দিলুরুবাতে বাহারে সূর তুলছেন। প্রামে সম্ভ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরো কত কী গাছ। জামরুল গাছ, আমবাগান, লিচু গাছ, জলপাই গাছ, নিচে হাসনুহানা কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরেক রকমের চাঁপা। আমার দোতলার ঘরের জানালা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিল ম্যাগনেলিয়া প্র্যাভিন্ফোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

শ্বিতা বলল, কী হল? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সুমন বলল, রবিদাদা রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

শ্বিতা সুমনকে বলল, আর দুটো শিঙাড়া খাবে?

সুমন বলল, দাও। কন্টেন্ডিন পরে তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বলল, আসলে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি যে তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরও করেছে। বউদিকে তো বিশেষ করে।

শ্বিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিল। দেখলাম, কাপের উপর ওর দুটি টানাটানা কালো চোখ সুমনের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিখর হয়ে গেল।

চা খাওয়ার পর আমি আবার ঘরে ফিরে এলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে শ্বিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেল। শ্বিতা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

ওরা দুজন যখন ফিরল সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার বছরের ব্যবধান এত সামান্য মনে হয় যে ঘণ্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিল শ্বিতা। বুধাই-এর মা গরম করে দিলে খাওয়ার দাওয়ার।

শ্বিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দ্যাখো, সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই চেয়ারের উপর থেকে শাড়িটা তুলে দু হাতে মেলে ধরে দেখালো। তারপর বলল, এরকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে কিনে দাও নি।

আমি বললাম, এটা তো দারকণ দামী শাড়ি।

সুমন বলল, বউদি কী আমার কম দামী?

স্থিতা আবার আমাকে বলল, এই যে, তোমার পাঞ্জাবী ও পায়জামা। এই চানুর জামা প্যান্ট।

আমি কুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম, করেছো কী সুমন, এই রকম নকশা কাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতা যান না। এখন তো এই-ই ক্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনও।

স্থিতা নরম গলায় বলল, এই যে শুনছ, দ্যাখো।

আমি বললাম, কি?

অ্যাই দ্যাখো, আমার জন্যে আরো কী এনেছে?

বলেই ছোটো দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। দেখি, এক জোড়া বেদানার দানার মত রুবির দুল, আর একটা ইঞ্জিমেট পারফ্যুম। ছেট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেস্টথিপট্ হয়ে গেছো। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দুদিন পরে। এমন বেহিসাবীর মত খরচ করে কেউ?

স্থিতা বলল, দ্যাখো না, বেশি বেশি বড়লোক হয়েছেন!

সুমন বলল, বড়লোকদের জন্যে বড়লোকি না করলে কী চলে?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম সুমন বেশি সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনোই পারিনি পারবো না। স্থিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনও লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্থিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যতদিন ছিলো না এখানে। এখানে ডাকপিণ্ডে চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিওন ছেদীলাল মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। কোনোদিন ছেদীলাল পোস্ট অফিসে যেতে দেরি করলে বুধাই-এর মাকে পাঠাতো স্থিতা আমাকে মনে করিয়ে দিতো চিঠি আনার জন্যে।

যে ক'দিন সুমন ছিলো না, লক্ষ্য করলাম স্থিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধূয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছম হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্থিতা বাইরের সিঁড়ির উপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেত না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

সুমন শিগগিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দুঁফার্লিং মত। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়ি কখনোই নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখনও আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহঘ্রা এবং করোঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের সারির পাড়ে ফুলদাওয়াই-এর লাল ঝাড়ে মিনি লক্ষ্মির মত লাল লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মতো ফিকে বেশুনী জীরঞ্জলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোর চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধূলো উড়ল, মেঘ হল ধূলোর: তারপর আলতো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু পাশের পাতায় গাছে ফিস ফিস করে চেপে বসল।

মিশ্রজী আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিল, দেহাতী বন্দরের নীল পাঞ্জাবি আর ধূতি পরে। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, পরলাম্ বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিলীটা আমি তখনও যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সেদিকে সুমন পঁচু। পানের দোকানের সামনে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা পান খেতে খেতে ওর সমবয়সী স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠেট হিন্দীতে গন্ধ করে অথবা হিন্দী সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়। সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশ্রজী সাইকেলের টায়ারে কিরকির শব্দ করে নামলেন। বললেন, হালচাল সব ঠিকে বা?

আমি বললাম, ঠিকেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কোলকাতাসে শাদী করিয়ে আসলেন এবার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

মিশ্রজী অবাক হয়ে বললেন, আভ্যন্তি শাস্তে দেখা উন্কা স্কুটারমে। পিছুমে কই খুবসুরত্ আওরত থী। বড়ী প্যায়ারসে সুমনবাবুকো পাকড়কে বৈঠী হয়ী থী।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নেই তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জব কি বাত্। তব সুমনবাবুকা সাথ্যে উও ক'ওন থী?

আমার মুখ ফসকে হঠাতে বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হো সক্তি। দুজনের

মধ্যে খুব দোষ্টী।

মিশিরজী বললেন, অজীব আদমী হায় আপ্ বড়াবাবু। দোষ্টী উর পেয়ার
কখনও এক হয়? আর মরদ ও আওরতের মধ্যে কী দোষ্টী হয় বড়াবাবু? খালি
পেয়ারই হাবে।

তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, আপ্ বড়ী হিউমারাস আদমী হেঁ।
নেহী তো, নিজের ধরম পত্তী কি বারেমে অ্যায়সী মজাক্ কেউ করতে পারে
কভৰী?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, যে, মজাক্ করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে তুমি খুব
বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জানো না।

সত্যি বড় বোকা আমি।

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকী করিনি। রাঁচি থেকে
নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোড়ী
থেকে বাঘড়া মোড়ে যে পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর
জঙ্গলের মাঝে বড়া-দেওতার থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কানাকাটি করছিল। আমাকে বলল বল খেলতে। আমি এসব পারি
না। তবুও চা-টা খেয়ে বুধাই-এর মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবার
মত চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পিছনের মাঠে বল
খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়েছিল হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক
থাকায় আচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুঁয়োয় গিয়ে পড়ল। বালতি নামিয়ে
অনেক চেষ্টা করেও উঠোতে পারলাম না বলটাকে, চানু কাঁদতে কাঁদতে বলল,
সুমনকাকা তুলে দিয়েছিল, তুমি কিছু পারো না বাবা।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

তারপর চানুকে আবার বুধাই-এর মার জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার
ইজিচ্যোরে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হল। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধূলোলাগা বিস্রস্ত
চুল। খোঁপায় দলিত জংলী ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বলল, স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘের জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিল,
কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্তীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হল বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বলল, এক্ষুণি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিছু পারে না।
বল পড়ে গেছে কুঁয়োর মধ্যে।

সুমন ঐ অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুঁয়ো-পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে

এলো। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল।

সে রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বলল, আজ থাক লক্ষ্মীটি।
আজ ভীষণ ঘূম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপছিপে এলানো শরীর, গভীর নিঃশ্঵াস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের
দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার
মতো মনে হচ্ছিল।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘূমিয়ে পড়ল। চাঁদের আলোর এক
ফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। স্মিতার মুখে বড় প্রশান্তি দেখলাম।
খুব, খুব, খুটুব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের
মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘূম আসছিল না। মিশিরজীর দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে
কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতি ঘামের পুরুষালী গন্ধ। হঠাৎ
মিশিরজীর উপর খুব রাগ হল আমার। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবল-লাইট
জ্বালিয়ে রাতের অঙ্ককারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা
কামেহামেহার ও রাণী কাহুমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি। ইতিহাসের
মতো আনন্দের, শান্তির আর কিছুই নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বলল, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার
চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর
কাছে এই ব্যাপারে আলাপ, আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি
তাঁকে। যেদিন আসবেন, সেদিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছো। না বললেই অন্যায় করতে।

৩

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। ভদ্রলোক ট্রেন
থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানের লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন।
সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছল, তখন বিকেল চারটে! রাতে যখন
খেতে এলেন আমাদের বাড়ি, তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড়লোকদের
চোখে মুখে যেমন একটা উদ্বিত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও
তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্ষড়ের ব্যবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক
কেবলই স্মিতাকে লক্ষ্য করেছিলেন। বেশ অভ্যর্থনাবে।

আমার মনে হল, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেন নি। এসেছেন
স্মিতাকে দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে পারলাম না। মিশিরজীর কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছেট জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস, বাড়ির বাইরে একটু বুঝে শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বলল না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে, তাহলে আমার পক্ষে তা কী খুব সম্মানের?

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা! তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বলল, মিশিরজী বা কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বলো সেটাই বড় কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনও কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বলল, নিজের মনের কথাও যে ঐ, তা তো বললেই পারো। অনেকদিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের কথা বলে চালাচ্ছে কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে ইঞ্জিনের নিরপত্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

কয়েকদিন পরেই সুমনের খুব জর হল। আমি বলেছিলাম, ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ বিদেশে বেইশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কি করে? তা ছাড়া ক'দিন পরেই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন্ অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিল, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তাহলে ওর সেবা-শুধুয়া করো। রাতে না হয় আমিই গিয়ে থাকবো। তুমিও থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বললে, থাক, এত উদার্য নাই-ই বা দেখালে। তোমার মিশিরজীরা কী তাহলে চুপ করে থাকবে?

সারাদিন স্মিতাই দেখাশোনা করল। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পথাট পেতে থার্মোমিটার, ওযুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘূম আসছিল না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোছিল। পাশের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি পড়েছিল। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের

ମାୟେର ଚିଠି ।

କେଳ ଜାନି ନା, ଏ ନିଶ୍ଚର ରାତେ, ସିଧିର ଡାକେର ମଧ୍ୟେ ଆମାର ମନ ବଲଲ,
ଏହି ଚିଠିର ଭିତରେ ଏମନ କିଛୁ ଆହେ ଯା ଶିତା ଓ ସୁମନେର ସମ୍ପର୍କ ନିଯେ ଲେଖା ।
ଟେବଲ-ଲାଇଟ୍‌ରେ ସାମନେ ଚିଠିର ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଦିଯେ ଚିଠିଟା ଗୋଲ କରେ ଧରେ ପଡ଼ତେ
ଲାଗଲାମ ଚିଠିଟା । ଯତ୍କୁ ପଡ଼ତେ ପାରିଲାମ, ତାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଛିଲ ।

ସୁମନେର ମା ଲିଖେଛେ, ସୁମନେର କାକାର ଚିଠିତେ ଜାନତେ ପେରେଛେ ତିନି ଯେ,
ସୁମନ ଏକଟି ଡାଇନିର ପାନ୍ନାୟ ପଡ଼େଛେ । ଏକ ଭେଦ୍ଭୂଯାର ବଟ ସେ । ସୁମନ ଜାନେ ନା
ଯେ, ସୁମନେର କତ ବଡ ବର୍ବନାଶ ସେଇ ମେଯେ କରଛେ ଓ କରତେ ଚଲେଛେ । ସୁମନ
ଛେଲେମାନୁସ । ମେଯେଦେର ପକ୍ଷେ କୀ କରା ସତ୍ତବ ଆର କି ଅସତ୍ତବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଓର
କୋନୋ ଧାରଣାଇ ନେଇ । ସୁମନେର ଭାବୀ ଶ୍ଵଶରବାଡିର ଲୋକଦେର କୋନୋ ଆସ୍ତୀଯେର
କାଠେର ବ୍ୟବସା ଆହେ ଲାତେହାରେ । ତାରାଓ ଖୋଜ ନିଯେ ଜେନେଛେ ଯେ, ସୁମନେର
କାକା ଯା ଜାନିଯେଛେ ତା ସତ୍ୟ । ପାତ୍ରିପକ୍ଷ ବେଁକେ ବସେଛେ ଯେ, ଏଇ ବଜ୍ଜାତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର
ସଙ୍ଗେ ସବ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ ନା କରଲେ ଏବଂ ବିଯେର ପରେଇ ଓଥାନ ଥେକେ ଟ୍ରୌପଫାର
ନିଯେ ଚଲେ ଆସାର ଚେଷ୍ଟା ନା କରଲେ ଏ ବିଯେ ହବେ ନା । ଏତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବଡ଼ଲୋକେର
ମେଯେଓ ଆର ପାଞ୍ଚାୟ ଯାବେ ନା । ତାଦେର ଦେଇ ପଣେର ଟାକାତେଇ ସୁମନେର ବୋନ ମିନ୍ତର
ବିଯେ ହେଁ ଯାବେ । ସାଦି ସୁମନେର ତାର ବାବା, ମା, ବୋନ ତାଦେର ପାରିବାରିକ ଐତିହ୍ୟ
ଏବଂ ତାର ନିଜେର ସମସ୍ତଙ୍କେ କୋନୋ ମମତ ଥାକେ ତାହଲେ ଏହି ରେଫିଉଜି ଡାଇନିର
ସଙ୍ଗେ ସବ ସମ୍ପର୍କ ଏକ୍ଷୁଣି ତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ । ସୁମନେର ଟ୍ରୌପଫାରେର ଜନ୍ୟେ ଅଥବା
ସେଇ ଡାଇନିର ଭେଡା ସ୍ଵାମୀର ଟ୍ରୌପଫାରେର ଜନ୍ୟେ ପାଟ୍ଟାତେ ତାରା ମୁରୁବିର
ଲାଗିଯେଛେ । ସୁମନେର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ତାର କଟି ମାଥା ଏଇ ଡାଇନି କାଁଚା ଚିବିଯେ
ଥାଇଁ । ଅମନ ଛୋଲ ମେଯେଛେଲେର କଥା ଓରା ଜନ୍ୟେ ଶୋନେନି ।

ବଡ ଭୁଲ ହେଁ ଗିଯେଛିଲ ଆମାର । ହାଓୟାଇ-ଏର ଇତିହାସଟା ବାଡିତେ ରେଖେ
ଏସେଛିଲାମ । ଆମାର ଘୃମ ହବେ ନା । କାମେହାମେହାର ସଙ୍ଗେ ଥାକଲେଇ ଭାଲୋ କରତାମ ।

ପରେ ମନେ ହଲ, ଏ ଚିଠିଟା ଶିତାକେ ଦେଖାନୋ ଉଚିତ । ଆମାର ମତୋ ସ୍ଵାମୀ
ବଲେ କୀ ଆମାର ଚୋଖେର ସାମନେ ଯା ନୟ ତାଇ କରେ ବେଡାବେ । ଓଦେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କ
କତ୍ତୁର ଗଡ଼ିଯେଛେ ତା କେ ଜାନେ ? ଏହି ସମ୍ପର୍କେ ସୁମନେର ଉଂସାହିଁ ବେଶ ଛିଲ,
ନା ଶିତାର ନିଜେର; ତା ଭଗବାନ୍ହି ଜାନେନ । ଏ ସଂସାରେ ଭାଲୋମାନୁସିର ଶାନ୍ତି
ଏହିଭାବେଇ ପେତେ ହୁଁ । ଭାଲୋମାନୁସ ମାନେଇ ବୋକା ମାନୁସ । ଯେ ନିଜେର ଜରୁ-ଗରୁ
ଶକ୍ତ ହାତେ ପାହାରା ଦିଯେ ରାଖତେ ନା ପାରେ ତାର ମାନ-ସମ୍ମାନ ଏମନି କରେଇ ଧୂଲୋଯ
ଲୁଟୋଯ । ବଡ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଏହି ପୃଥିବୀ; ଏହି ମେଯେଛେଲେର ଜାତ । ଏରା
କାର ଛେଲେ କଖନ କୋଲେ କରେ ବଡ କରେ ଫେଲେ ତା ଆମାର ମତୋ ଭେଡା ସ୍ଵାମୀର
ଜାନାର କଥା ନୟ ।

ଦ୍ୟା ଲ୍ୟାଷ୍ । ଭେଡା । ସତ୍ୟ ସତ୍ୟିହି ଆମି ଏକଟା ଭେଡା !

সুমনের ছবির যেদিন ছাড়ল সেদিনও লিকুইডের ওপর রাখল স্মিতা ওকে।
পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে—সুজির বিচুড়ি, মুচমুচে বেগুনী, কড়কড়ে
আলু ভাজা, হট কেসে ভরে খাওয়ার নিয়ে গিয়ে আইয়ে এল স্মিতা।

ছবি ভালো হতেই সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বলল না।
আমাদের নামে ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এলো না। সুমনই একটা কার্ড
কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিল ছেটুয়ার হাতে।

স্মিতা আমাকে বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারী লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে
যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতেও লজ্জা!

সুমন যেদিন যায়, রাঁচি হয়ে গেল ও। আমরা বাস স্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে
এলাম। চানু বলল, কাকীমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু, আমরা বুব বল
খেলবো।

স্মিতা হেসে বলল, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখবো, স্টেশনে
তোমাদের আনতে যাব আমরা। সেদিন তোমার বাড়িতে রানাবানার পাট রেখো
না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে; থাকবে সারাদিন।

সুমন জবাব দিলো না কোনো।

তথু বলল, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিলো।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িটাতে আশ্র্য এক বিশাদ নেমে এল।
সুমন এর আগেও অনেকবার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্যরকম।
যে সুমন বাসে উঠে চলে গেল সেই সুমন আর কিনবে না এই টোড়িতে। আমি
সে কথা জানতাম। স্মিতাও জানতো। যদিও তিনিভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিলো না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না
জানিয়ে ছেদীলালকে পোস্টেপিসে পাঠাতো স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক
কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিত্বষ্ণ পেতাম। যে নিজে কাউকে আঘাত দিতে
শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আবাত ও দুঃখ যে অন্যজনকে অন্য
কোণ থেকে এসে বাজে এই জানাটা জেনে ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হবে,
স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনোদিন সুমনের এই হঠাত পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা
করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও তা আমার জানার
কথা নয়। ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিল বলেই সুমনের হঠাত পরিবর্তনের আঘাতটা
স্বাভাবিক কারণেই বড় গভীরভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ কথা বুঝতাম।

স্থিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করত। আমাকে খেতে দিত। জামাকাপড় এগিয়ে দিত। লেখাপড়ার টেবিল শুভ্রে রাখত। শোওয়ার সময় মশারি শুঁজে দিত। তারপর নিজে বারান্দায় বসে থাকত। মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়েও দেখতাম স্থিতা বারান্দায় বসে আছে অঙ্কারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলত, নাঃ।

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারীতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিল। তাতে ঐ সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্থিতা। রবিঠাকুরের গান : “মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়..” ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন : পুরানো সেই দিনের কথা...

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো আস্তি নেই। থুব বেশি শনিও নি। কিন্তু এ গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল। সেটা আমার অসহ্য লাগত।

একদিন স্থিতা সঙ্ঘাবেলায় পাণে সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল চানুকে নিয়ে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময়ে তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেয়ের পড়ে ভেঙ্গে গেল।

আমি কি অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম? জানি না।

বুধাই-এর মা শব্দ শুনে দৌড়ে এল। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেল। এগুলো তুলে রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্থিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখল। আমাকে কিছুই বলল না। জবাবদিহিও চাইল না।

“আরেকটি বার আয়ের সখা প্রাণের মাঝে আয়,

মোরা সুবের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়”...

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনই চেঁচাই না আমি। কিন্তু সে রাতে চেঁচালাম। কি জানি, কেন?

স্থিতা আমাকে খেতে দিলো। চানুকে খাওয়ালো।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাবো।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্থিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।
বুধাই-এর মা বলল, তুমি বিমার পড়বে, মাঙ্গজী। কিছুই খাওয়া-দাওয়া করছে
না তুমি!

স্থিতা ওকে ধমকে বলল, তুমি চুপ করো তো! অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম সুমন চলে যাবার পর সত্যিই অনেক রোগা
হয়ে গেছে স্থিতা। কিন্তু কী বলব, কেমন করে বলব? ভেবে পেলাম না। শুধু
বলতাম নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্থিতা আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। আমার হাতে লবঙ্গ দিলো।
রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেল।

কাল সুমনরা আসবে।

স্থিতা আর আমি দুজনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচী গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান
থেকে সুমন আর সুমনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে
এনেছি। ফুলের অর্ডাৰ দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল,
রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিশও
দিয়ে এসেছি।

স্থিতারও ভাই নেই; আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে
মনে হচ্ছে আমাদের।

তোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্থিতা। এ কাদিনে অনেক রোগা হয়ে
গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। চোখ দুটি আরও
বড় বড় কালো; কাজল টানা। বিরহ মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনে দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে-না করতেই মাছ এসে গেল। দই-মাছ করেছে কাতলা
মাছের। খুব ভালবাসে সুমন। মুড়িঘণ্ট। মাছের টক। মুরগীর কারি। পোলাও।
সঙ্গে তো মিষ্টি ও রাবড়ি আছেই। রাতের জন্য আরও বিশেষ বিশেষ পদ।
ফিশ্ রোল।

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব
সহকর্মীরাও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌছায় তার প্রতীক্ষায় ছিল। আমার
এখানেই চলে আসতে বলেছি সকলকে সুমনের “বড়ো-ভাই” হিসেবে। ওদের
সকলের জন্যে মিষ্টি-চিষ্টি ও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্থিতা রান্না-বান্না এগিয়ে নিয়েই সুমনের কোয়ার্টেরে গেল ফুলশয়ার ঘর
সাজাতে। নিজের আলমারী খুলে নতুন ডবল বেডশীট, বেডকভার, ডানলোপিলো
বালিশ, মাঝ আমার সাথের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড় টোয়ার
পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাব যে, সুমন নতুন বউ-এর সঙ্গে শোবে না তো যেন স্থিতার

সঙ্গেই শোবে।

মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অস্তুত !

যে সময়ে ওদের আসবার কথা, সে সময়ে ওরা এলো না। আমি দুবার খৌজ নিলাম অফিসে কোনো ফোন এসেছে কি না রাঁচী থেকে তা জানাব জন্যে। রাঁচী এক্সপ্রেস ভোরেই পৌছেয়। রাঁচী থেকে আসা সব বাসও চলে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার সব তৈরি, এমন সময় আমাদের চৌধুরী এসে বলল যে, তার কাছে সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কোলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌছবে, রাঁচীর মেইন রোডের কোয়ালিটিতে লাঞ্ছ করে। আমাকে কিছুই জানায়নি শুনে চৌধুরীও খুব অবাক হল।

শ্বিতাকে জানালাম। বললাম, চলো, তাহলে বসে থেকে আর লাভ কী হবে? আমরা খেয়েই নিই।

শ্বিতা আমাকে খেতে দিলো। কিন্তু নিজে খেলো না। বলল, সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা-বমি-বমি লাগছে।

শ্বিতা এই ব্ববর শুনে স্তুতি হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড় ব্যথা দেখলাম।

সঙ্গের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এল ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটির খাবারের প্যাকেট। রাঁচীর কোয়ালিটি থেকে তন্দুরী চিকেন আর নান্ নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর শ্বিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলোই না, অফিসের সকলে ওখানেই গেল।

বুধাই-এর মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সুমনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্ন-আভি করলাম।

সকলে বলল, বউদি কোথায়? ভাবিজি কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই শ্বিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, শ্বিতা চান করে সুমনের কোলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিঙ্গের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার দানার মত কঁবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো শ্বিতা।

শ্বিতা বলল, সুমনের স্তু কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনও।

চানু আগেই বুধাই-এর মাঝের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। আমি আর শ্বিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।
সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্থিতার
দিকে ফিরেও তাকাল না।

সুমন ঠাণ্ডা নৈর্ব্যাত্তিক গলায় বলল, বউদি! কেমন হয়েছে আমার বউ?
স্থিতা মুখ নীচু করে বলল, ভালো; খুব ভালো।
বলেই বলল, তোমরা থেতে রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?
অলকা কাঠ-কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাওয়ার তো
নিয়ে এসেছি রাঁচী থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের?

স্থিতা কিছুই বলতে পারল না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হই হই করে উঠলো। বলল, ইয়ার্কি নাকি? দাদা বউদি
কাল রাঁচী থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রাঙ্গা করলেন বউদি,
আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বলল, তাহলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দ্যান। আমরা বড়
টায়ার্ড!

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝলো যে, সুমনের
ওপর তার যে নিরঙ্গুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা একজন নতুন মহিলা
এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেললো না,
তাকে কাঁধে ঢঢ়াল না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে সে তার মায়ের
আঁচলের কাছে সরে গেল। শিশুরা আদর যেমন বোঝে, অনাদরও।

স্থিতা সুমনকে বলল, তাহলে তাই-ই হবে। খাওয়ার সব এখানেই পাঠিয়ে
দেবো। কটায় পাঠিবো? নটা নাগাদ?

সুমন এই প্রথমবার চোখ তুলে তাকাল। স্থিতাকে দেখল। ওর ভালোবাসায়
মোড়া শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া কুবির দুল পরা স্থিতা। কিন্তু স্থিতা যে
খুব রোগা হয়ে গেছে তাও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দুটি এত
আনন্দের মাঝেও হঠাতে ব্যথায় যেন নিষ্পত্ত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্থিতার মুখের
দিকে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা বউদি, নটার সময়ই পাঠিও।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকাল।

স্থিতা চানুকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষণি
চলে গেলে খারাপ দেখাতো। চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিল, রসিকতা, হাসি ঠাণ্টা। ওদের শোবার ঘর ভারী
সুন্দর করে সাজানো হয়েছে একথা সকলেই বলল।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কে সাজালেন শোওয়ার ঘর?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্থিতা বৌদি।

অলকা বলল, তাই-ই বুঝি !

অতিথিরা একে একে সকলেই চলে গেলেন। বুধাই-এর মা আর ছেটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাওয়ার নিয়ে এলো ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হলো। বুধাই-এর মা এসে বলল, বউদির শরীর খারাপ—সারাদিন রাঙ্গাঘরে ধকল গেছে—বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবার-দাবার কোনোরকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাই-এর মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি আসতে পারলো না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

অলকা আমাকে বলল, আপনি তাহলে যান ওনার কাছে। শরীর খারাপ যখন। আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন?

চৌধুরী বলল, আরে দাদা, ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কীভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা! তাহলে তোমরা ভালো করে খেও।

দু-একজন কৌতুহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউ তুকিয়ে দেওয়ার জন্যে রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এলো একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করল; তারপর বলল না। শুধু বলল, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাই-এর মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে; দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাই-এর মা বলল, দাদাবাবু, আপনি খাবেন না?

বউদি খেয়েছেন?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক প্লাস জল দাও বুধাই-এর মা। আমিও খাবো না। শরীর ভালো নেই।

বুধাই-এর মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড় ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো বুধাই-এর মা।

বুধাই-এর মা বলল, আমার খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে চুকলাম। দেখি, চানুর পাশে স্মিতা উপুড় হয়ে সঙ্গেবেলার সেই লাল-কালো সিঙ্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে গড়ন চানুর পাশে অঞ্জবয়সী ওকে

চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিল না।

আমি কাঠখোটা লোক। বুঝি কম। ভাবি কম। কিন্তু কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছেট আর ছেলেমানুষ স্তৰীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অঙ্ককার রাতে তারারা সমুজ্জল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে মধ্যে দুটি একটি মাসিডিস ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথ বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড় বিধূর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। বিবির একটানা খিনখিন রবের ঘুমপাড়ানি সূর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি কত কি ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা যন্তু খস্খস্ শব্দ হল। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্মিতা কথা না বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বলল, আঘাত দাও ওকে। এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে! ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনিহাতে আমার মন ভরে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কানার বেগ কমলে আমি বললাম, কি হলো?

ও বলল, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে...আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কিসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম ব্যঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুত্তপ হচ্ছে?

স্মিতা এবার মুখ তুলল। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বলল, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা...

আমি বললাম? আমিই কি বললাম, আমার কী এমন রূপ গুণ আছে যাতে তোমার শরীরে ও মনে চিরদিন একা আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি? সংসারের একজন স্বামীরই কী আছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনও অনুভব করিনি স্মিতা! সত্যিই করিনি।

শ্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার বোকা, অগোছালো, ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দুরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহৱাটাড়ে চমকে চমকে রাতচরা টি-টি পাখিরা ডেকে ফিরছিল। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিসফিস করছিল বাইরে!

ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আর একজন মানুষ সুমন তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। শ্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু যদি শ্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তাহলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যেসব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সেদিন আমি আমার কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম শ্মিতার।

শ্মিতা কাঁদছিল নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিল ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিল।

স্মৃতিতে হঠাতে বউভাতের রাতটা ফিরে এল। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। শ্মিতার বাবাও। আরো কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই। আমার পুরোনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কঞ্জনা সে-রাতে; সুগন্ধ সানাই...।

শ্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাতে মনে হল যে-আমি টোপুর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে শ্মিতাকে একদিন তার পরিবারের শিকড়সুন্দু উপড়ে এনেছিলাম তার সঙ্গে যে মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিশেষ বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

“বর হওয়া” আর “স্বামী হওয়া” বোধহয় এক নয়।



ফ্রিস্টাইল

সমরেশ মজুমদার

মেয়েটি হাঁটছিল। টাইট জিনস আর টপে চমৎকার মানিয়েছে। চুলে সিক্কি ডেউ কোমর অবধি নেমেছে। চোখে রোদ চশমা।

একটি যুবক মেয়েটিকে অনুসরণ করছিল। ব্যবধান কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাশে চলে আসতে পারল। মেয়েটি তাকে দেখেছে কিনা বোৰা যাচ্ছিল না। পাশাপাশি ইঁটতে হাঁটতে যুবক বলল, ‘এক্সকিউজ মি’ তার গলা শুকলো।

ক্ষমা করার কোন ইচ্ছে মেয়েটির না থাকায় সে হেঁটেই যাচ্ছিল।

যুবক আবার কথা বলল ‘আচ্ছা আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো।’

মেয়েটি গান্ধীর গলায় বলল ‘পুরোন হয়ে গিয়েছে। বস্তা পচা। ঠাকুরা ঠাকুর্দাৰ আমলের সংলাপ। বোকা বোকা।’

‘তাহলে?’

‘নতুন কিছু স্টকে না থাকলে কেটে পড়াই ভাল।’ মেয়েটি বলল।

‘ও। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।’ যুবক মরিয়া হল।

‘ট্র্যাস! বাবাদের আমলের কথাবার্তা।’ মেয়েটি চেয়েও দেখল না।

যুবক টেক গিলল। তারপর বলে চলল, ‘ওয়েল, তুই কি এখন খুব ব্যস্ত? এক মিনিট দাঁড়াতে পারবি?’

মেয়েটি আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে যুবককে আপাদমস্তক দেখল, ‘ওড! এত দ্রুত ইমপ্রুভ করলি কি করে?’

যুবক মেয়েটির চোখ দেখতে পাচ্ছে না। উভর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। স্বার্ট হওয়ার চেষ্টা করল।

মেয়েটি বলল, ‘বাঃ। নাচতে পারিস বলে মনে হচ্ছে?’

‘শিখিনি তবে পারি। পাড়ায় পুজোয় ধূনুচিনাচ নেচে প্রাইজ পেয়েছি। একবার রিহার্সাল দিলেই গোবিন্দার মত নাচতে পারব।’

যুবক খুব আঞ্চলিকসী গলায় জবাব দিল।

‘কি করিস? বেকার? মেয়েটি ঠোট ঘোড়ালো।

‘দুমাস আগে ছিলাম। তুই?’

‘এম বি এ দিয়েছি। বাইরে যাব। সিগারেট দেতো।’

‘তুই সিগারেট খাবি?’ যুবক হতভস্থ।

‘ফোট। কেটে পড়।’ মেয়েটি আবার পা বাড়াচ্ছিল, যুবক দ্রুত বলে উঠল, ‘দাঁড়া দাঁড়া। দিছি।’ সে একটা উইলসের প্যাকেট বের করে।

একটি সিগারেট টেনে বের করল মেয়েটি প্যাকেট থেকে, ‘ধরিয়ে দে।’

যুবক সিগারেটের মুখে জলন্ত দেশলাই কাঠি ছোঁয়াতেই সে ধোঁয়া ছাড়ল, ধ্য...।

যুবক চোরের মত চারপাশে তাকাল। দুই ফুটপাত দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা মেয়েটিকে তো বটেই এই সিগারেট খাওয়াও উপভোগ করছে।

‘আমার নাম স্বাহা, তোর নাম?’ মেয়েটি আবার ধোঁয়া ছাড়ল।

‘অর্জুন।’

‘খুব প্রেম করে বেড়াস, না?’

‘ধ্যেৎ’ লজ্জা পেল।

‘অর্জুন মানে মহাভারতের অর্জুন তো খুব প্রেম করত। আচ্ছা, তুই একসঙ্গে কটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারবি?’ স্বাহা সিগারেট নিভিয়ে দিল জুতোর তলায় ফেলে।

‘একটাই জোটেনি আজও।’

‘তার মানে তোর মধ্যে গোলমাল আছে। চেহারায় তো বেশ মাঝা দিয়েছিস। তাহলে মেয়েরা তোর কাছে আসে না কেন? গল্পটা কি?’

‘আসলে আমি একটু শাই টাইপের।’

‘এম্মা! তুই চপ মারছিস? আমার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করলি তাতে লজ্জার ল ছিল? পাঁচ পাবলিককে ডেকে বলব?’

‘এই না। সত্যি বলছি, কোন মেয়ে আমার জীবনে আসেনি।’

‘আচ্ছা। চল হাঁটি।’

ওরা হাঁটতে শুরু করল। স্বাহা বলল, ‘জানিস, এখন পর্যন্ত আমি সাতাত্তরটা প্রেম করেছি। ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং না! একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল দেখতেই তার একটি X দিয়ে দিয়েছি। রিপিট করতে কারও ভাল লাগে বল?’

‘সেতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সাতাত্তরটা?’ অর্জুন হতভস্থ।

‘আমি তো কম। আমার বন্ধু চীকা নাইনটি নাইনে আছে। ও এখন প্রেম করা স্টপ রেখেছে। যাকে তাকে তো সেক্ষুরিয়ে নাস্বার দিতে পারে না। এ্যাই তুই চীকার সঙ্গে কথা বলবি?’

‘কি দরকার। মিছেমিছি।’ মৃদু আপত্তি জানাল অর্জুন।

‘আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে আলাপ করলি কেন? প্রেম করার জন্যে তো?’ মুখ ঘুরিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বাহা।

হাসল অর্জুন। হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

‘কিভাবে প্রেম করতে হয় জানিস?’

‘মানে আমরা পরম্পরাকে বিশ্বাস করব,—করব, সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব, আমাদের পৃথিবী এক হবে।’ অর্জুন বলল। ‘হয়ে গেল। আমরা কেউ কাউকে জানি না আর পৃথিবীটা এক হয়ে যাবে? মামদোবাজী।’ চেঁচিয়ে উঠল স্বাহা। ‘তারপর কোন মেয়ে প্রপোজ করেছে? তোর এবিলিটি তো এখনও প্রমাণিত হয়নি। নাঃ। তোর একটা টেস্ট দরকার। তুই চল চীকার কাছে।’ স্বাহা বলল।

চীকার ঘর দারুণ সাজানো। অর্থের প্রাচুর্য আন্দাজ করা যায় না। বারমুড়া আর গোল গলার গেঞ্জি পরে সে বসে বলল, ‘টিভি দেখতে আর ভাল লাগছিল না। তোরা এসে বাঁচালি।’

স্বাহা বলল, ‘এর নাম অর্জুন।’

‘ফাইন। আমি চীকা।’ হাত বাড়াল সে। অর্জুন মুখ তুলতে পারছিল না। এই প্রথম সে কোন বারমুড়া পরা যুবতীর এত কাছে এসে বসেছে। তাকাতেই চোখ চলে যাচ্ছে ওর থাই এর দিকে। এমন মসৃণ সুড়েল পা মানুষের হয়! সিঙ্কের মত চামড়া। হাত মেলালো সে। চীকার হাত কি নরম।

চীকা জিজ্ঞাসা করল, ‘বল স্বাহা, হঠাৎ এলি?’

‘অর্জুনকে নিয়ে এলাম। যদি তোর কাজে লাগে।’

‘যাবাবা। অর্জুন তোর প্রেমিক নয়?’

‘না না। আজই আলাপ। কিন্তু বলছে একদম নবিশ। এই বয়সের পুরুষ যদি ভার্জিন হয় তাহলে সন্দেহ হবেই। তাই না?’

‘দ্যাটস টু। অর্জুন তুই ভার্জিন?’ চীকা জিজ্ঞাসা করল।

‘আসলে পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।’

‘নেকু। ব্লু-ফিল্ম দেখিসনি?’

‘না। বিশ্বাস কর।’ অর্জুন মাথা নাড়ল।

চীকা বলল, ‘স্বাহা ও যদি ঠিক বলে তাহলে ছটা পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে। তোর প্রফেসান কি?’

‘এ্যাড এজেন্সিতে কাজ করি।’

চীকা বলল, ‘এরকম কারও সাথে আমার পরিচয় হয়নি। এ্যানাদার টু পয়েন্টস। এর আগে কোন মেয়েকে এ্যাপ্রোচ করিসনি?’

‘না।’

‘তাহলে স্বাহাকে করলি কেন?’

‘জানিনা। দেখে কি রকম হয়ে গেলাম।’

‘কি দেখে?’

‘ওর সব। কেমন রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।’

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাহা, ‘ট্র্যাস।’

‘ধৰ এক ফুটপাতে স্বাহা আৰ অন্য ফুটপাতে আমি হাঁটছি। তুই মাৰখানে। কাৰ দিকে যেতিস কথা বলতে?’ চীকা পায়েৰ ওপৱ পা তুলে দিয়ে দুহাত পেছনে ঝেৰে মাথা হেলালো।

‘আমি দুদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটভাম।

‘স্বাবাস। আৱও দুই পয়েন্ট’। চীকা বলল, ‘শোন, আমি নিৱানবইটা ছেলেকে দেখেছি। কেউ ভাল কেউ ক্যালাস। একশ নম্বৰ যাকে কৱব তাকে আলাদা হতে হবে। যাকে ট্রাই কৱছি দেখেছি সে কাৱও না কাৱও ডুগিকেট। লাস্ট প্ৰশ্ন। এৱ জন্মে বাৱ পয়েন্ট। তুই আমাকে কতক্ষণ চুমু খেতে পাৱিবি?’

চোখ বঞ্চ কৱল অৰ্জুন, ‘তেইশ ঘণ্টা।’

স্বাহা চেঁচিয়ে উঠল উৎসাহে। চীকা চোখ ঘোৱালো। ‘চবিশ ঘণ্টা নয় কেন?’
‘বাঃ আধৰণ্টা টয়লেটে লাগবে না?’

‘ও মাই গড। কিন্তু বাকি আধৰণ্টা?’ চীকা নাছোড়বান্দা।

স্বাহাৰ দিকে তাকাল অৰ্জুন, ‘ওৱ কথা মনে আসবে।’

চীকা কাঁখ ঝাকালো। তাৱপৱ বলল, ‘না আমি শেয়াৱ কৱতে পাৱব না।’
পাঁচ মিনিট পৱে অৰ্জুন আৱ স্বাহা নিচে নেমে এলে অৰ্জুন বলল, ‘তাহলে যাই।’
ঠোট মোচড়ালো স্বাহা, ‘এত তাড়াতাড়ি। আমৱা একটু কফি খাবো এখন। চল।’
অৰ্জুন স্বাহাৰ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটতে লাগল।



আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন বিমল কর

নদীর চড়ায় শিবানীর চিতা জলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বঙ্গ শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উল্টো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গোরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গোরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়েছিল। শিবানীর মুখাপি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়েছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসেছিল, কদাচিং মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছেকরা আর নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শব্দাহের তদারকি করছিল। পুরুতমশাই আর ছেকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধূ ধূ করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিং বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বঙ্গ শিমুলতলায় বসে শিবানীর সৎকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, ‘শেষ, হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।’ বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসেছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে

শুয়ে পড়ল, আকাশমন্থো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর-একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু'হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সেই ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক : শিবানী ওর স্তৰী। তবু আমার মনে হল, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষাষ্ঠিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই।

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, ‘শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপরে কি জান্যে যেন রেগেছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দৃঢ় করছিল...’

আমার কথায় অনাদি মুখ ফিরিয়ে দূরে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনক্ষভাবে বলল, ‘আমরা বোধহয় না এলেই ভাল করতাম।’

আমরা চুপচাপ অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনো পাখি চিকির চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কমলেন্দু সব জেনেশনে বুঝে হঠাতে বলল, ‘কেন? আমরা না এলে কি ভালো হত?’

অনাদি ধীরস্থির প্রকৃতির, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, ‘ভুবন হয়তো অস্থিতি বোধ করছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্তৰীকে ভাবতে চেয়েছিল।’

‘ভাবুক, কে তাকে বারণ করেছে—’ খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসের গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। ‘আমরা ওর চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনের পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।’

কমলেন্দু শুয়ে বলল, ‘বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীর মারা ঘাবার খবর পাঠানো কেন! না পাঠালেই পারত।’

‘কিংবা বলে দিলেই পারত আমরা যেন না আসি,’ আমি বললাম।

‘খবর না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা করে...’

‘আমরাও ভদ্রতা রক্ষা করছি। শিবানী আমাদের বন্ধুর স্তৰী, তার সৎকারে না আসাই কি ভালো দেখাত।’ কমলেন্দু বলল।

‘বন্ধুর স্তৰী শুধু কেন, শিবানী আমাদের...কি বলব...বান্ধবী, যাই বলো...সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মারা গেছে, আমরা শুশানে আসব না?’

আমি বললাম।

অনাদি আর কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবার সিগারেট বের করল। আমাদের দিল। নিয়ানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খৌচাখুচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হল। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। চিতার ওপর কয়েকটি অশিষ্টুলিঙ্গ যেন আতসবাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠের টুকরো ফেলল চিতায়।

ভুবন চিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উদাসভাবে নদীর আকাশ আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সন্ত্রেও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল; নিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর এই ভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না। মনে হল, আমাদের যেন সে আর দেখতে পাচ্ছে না, বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা করছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমার রাগ হয়, ভুবনের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমার কেমন রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। আতিশয় কেন? আমরা কি জানি না শিবানীর সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল? তবে? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছু জানি না, যেন শিবানী তার সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তার বিশ্বভুবন অঙ্গকার হয়ে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালোবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালোবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলে যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালোবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এল। দক্ষিণ থেকে নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাসে নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত অতিশয় আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, ‘আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—’ বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, ‘ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।’

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে! সে বলল, ‘তাতে যদি ভুবন শাস্তি পায় আমার আপত্তি নেই। ... আমার বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।’

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

ଅନାଦି ଏବାର ବଲଲ, ‘ଆମାରେ କେମନ ଅସ୍ଥିତି ଲାଗଛେ । ଏକଟୁ ଆଡ଼ାଲେ ଦୂରେ ଗିଯେ ବସାଇ ଭାଲୋ । ତାହାଡ଼ା ଏବାର ଏଦିକେ ରୋଦ ଘୁରେ ଗେଛେ, ବସେ ଥାକା ଯାବେ ନା ।’

ଆମରା ଆରୋ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ବସେ ଥେକେ ଶିମୁଲତଳା ଛେଡ଼େ ଉଠେ ପଡ଼ିଲାମ । ତାରପର ତିନବଞ୍ଚ ଶିବାନୀର ଚିତା ଏବଂ ଭୁବନେର ଦୃଷ୍ଟି ଥେକେ ସରେ ଅନ୍ୟ ଦିକେ ଚଲେ ଯେତେ ଲାଗଲାମ ।

ଖାନିକଟା ଦୂରେ ଏସେ ଆମରା ବସଲାମ । ଏଥାନେ ସନ ବୋପବାଡ଼ ଆର ଛାଯା, ମାଥାର ଓପର ନିମଗ୍ନ, ସାମନେ କୁଲବୋପେର ଓପର ଦିଯେ ନଦୀ ଦେଖା ଯାଯ । ମାଝେ ମାଝେ ପାଖିର ଡାକ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁ କାନେ ଯାଚେ ନା । ନଦୀର ବାଲି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛୁ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଛେ ନା । ଏଥାନେ ଯେ ଯାର ମତନ ଆରାମ କରେ ବସଲାମ, ବସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହଲାମ ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟୋଖାଟୋ ଦୁଃଚାରଟି କଥାର ବିନିମୟ ହଲ, ଶିବାନୀ ଏଭାବେ, ଆଚମକା ଏକଟା ଅସୁଖେ ମାରା ଯାଓଯାଯ ଆମରା ଦୁଃଖିତ । ଶେମେ ଆମରା ଏକେ ଏକେ କେମନ ନୀରବ ହେଁ ଗେଲାମ । ନଦୀର ଦିକେ ଅପରାହ୍ନେର ଶ୍ରମିତ ଭାବ ନାମଛିଲ । ଆମରା ତିନଜନେଇ କଥନେ ନଦୀ, କଥନେ ଶୂନ୍ୟତା, କଥନେ ଗାହପାଳା, କଥନେ ପାଯେର ତଳାଯ ଘାସ-ମାଟି ଦେଖଛିଲାମ । ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହେଁ ଗିଯେଛିଲାମ ।

ଅନେକକ୍ଷଣ ଏଇଭାବେ ବସେ ଥାକାର ପର ହଠାଏ କମଲେନ୍ଦ୍ର କେମନ କରେ ଯେଣ ନିଷ୍ଠାସ ଫେଲଲ । ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଚାସ ନଯ, ତାର ଚେଯେଓ ଯେଣ ଗଣ୍ଠିରତାପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛୁ ; ତାର ନିଷ୍ଠାସେର ଶଙ୍କେ ଆମରା ଓର ଦିକେ ହତଚକିତ ହେଁ ତାକାଲାମ ।

କମଲେନ୍ଦ୍ର ସୁପୁରୁଷ । ତାର ମୁଖ ଏଥନେ ଦୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକିଯେ ଦେଖାର ମତନ । ଲସ୍ବା ଧରନେର କାଟିକାଟା ମୁଖ, ରଙ୍ଗ ଫର୍ସା, ନାକ ଓ ଚୋଥ ବେଶ ତୀଙ୍କୁ । ତାର ଫରସା ସୁନ୍ଦର ମୁଖେ ଆମରା କୋଥାଯ ଯେଣ ଏକ ବେଦନା ଦେଖତେ ପେଲାମ ।

ଅନାଦି ବଲଲ, ‘କି ହଲ ?’

କମଲେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟଦିକେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ଥାକଲ କଯେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତାରପର ଆମାଦେର ଦିକେ ତାକାଲ । ଶେମେ ବଲଲ, ‘ନା, କିଛୁ ନଯ... କଇ, ଦେଖି ଏକଟା ସିଗାରେଟ...’

ପକେଟ ଥେକେ ଆମାର ସିଗାରେଟେର ପ୍ଯାକେଟଟା ବେର କରେ ଓକେ ଦିଲାମ । ନିଜେ ଏକଟା ସିଗାରେଟ ନିଯେ ଓ ଆମାଦେର ଦୁଃଜନକେ ଦୂଟୋ ସିଗାରେଟ ଧରିଯେ ଅନେକଟା ଧୀମ୍ଯା ଗଲାଯ ନିଲ । ତାରପର ଆମାଦେର ଚୋଥେର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲ, ‘ଏଦିକଟାଯ ପାଲିଯେ ଏସେ ଭାଲୋଇ ହେଁଛେ । ସାମହାଟ, ଆମାର ଶିବାନୀର ଚିତାର ସାମନେ ବସେ ଥାକତେ ଭାଲୋ ଲାଗଛିଲ ନା ।... ହତେ ପାରେ, ତଥନ ଆମି ବୋକା ଛିଲୁମ, ବୟସ କମ ଛିଲ, ତବୁ ଏ କଥା ତୋ ଠିକ, ଶିବାନୀ ଆମାକେ ଭାଲୋବେଶେଛିଲ ।... ଆମାର ଚେଯେ ବୈଶୀ ମେ ଆର କାଉକେ କଥନୋ ଭାଲୋବାସେ ନି ।’

ଆମରା ତିନ ବିଗତଯୌବନ ବଞ୍ଚ ପରମ୍ପରର କଥା ଜୀନତାମ ଏବଂ ଭୁବନ, ଆମାଦେର

চতুর্থ বঙ্গও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালোবাসার কথা আমার অজানা নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবিটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হল না। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। একেবাবে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, ‘আমার তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।’

ধীরস্থির শাস্তিশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাতে কেমন অসম্ভব ও বিরক্ত হল। ঠোট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, ‘এ-সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার পক্ষে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাস্তা ছিলাম না। সিরিয়াসলি যদি কাউকে সে ভালোবেসে থাকে, আমি সে দাবি সবচেয়ে বেশি করতে পারি।’

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশি হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয়নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবি করছি সে দাবি ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হল। আমাদের তিনজনেরই স্বী আছে, সস্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প করার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ ছিল না। তবু আমরা তিনজনেই এমন এক দাবি জানাচ্ছিলাম যেন সে দাবি প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের কোনো বিশেষ সূর্খ ও অহংকার প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আবার দিকে বার বার তাকাল, তারপর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে শিবানীর ওপর-ওপর মেলামেশা তোমরা দেখেছ, আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বললাম, চিঠিপত্রও দেখিয়েছি, কিন্তু ভেতরে আমাদের কি হয়েছিল তোমরা কি করে জানবে?’

‘ভেতরে ভেতরে যা হয়েছে তা তো পরে তুই বলেছিস,’ আমি বললাম।

‘না আমি সব বলিনি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকরেট...’

‘সে-রকম গোপনীয়তা আমারও আছে, কমল।’ অনাদি বলল।

আমার গোপনীয়তা ছিল। আমরা তিন বাল্যবয়স্ক পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচর রাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখিনি রাখতে চাইনি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশার সময়ও আমরা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষাণ্বিত হইনি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীর সঙ্গে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা করেছিল, করে শিবানীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শিবানীর

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার ; আমার সঙ্গে শিবানীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্মত গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বাল্যকালের বাঞ্ছবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছে তা পরম্পরাকে আমরা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতর ঈর্ষা আমাদের থাকার কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয়নি, তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিরোধ আমাদের মধ্যে হয়নি ; সে জীবিত থাকতে যা হল না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে নেই—তখন তা হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

আমার কি রকম যেন মনে হল। কমলন্দুর দিকে তাকালাম, তারপর অনাদির দিকে। আমার মনে হল, নিজের গোপনীয়তা তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালোবাসার নির্দর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমার আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বষ্টি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, ‘একটা কথা বলব?’
ওরা আমাকে দেখল।

‘আমাদের সব কথাই সকলের জানা।’ ধীরে ধীরে আমি বললাম, ‘আমরা কিছই লুকোচুরি রাখিনি ; তবু আমাদের তিনজনেরই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভালো নয়?’

কমলন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল। আমার মনে হল ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলন্দু বলে, ‘বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভালো।’

অনাদি বলল, ‘আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীর চিতা এখন জুলছে, আমরা শ্রশানে। এই সময় সে-সব কথা বলা কি ভালো দেখাবে?’

‘খারাপই বা কি!’ আমি বললাম, ‘আমার বরং মনে হচ্ছে বলে ফেললেই স্বষ্টি পাব।’

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্ভত।

কমলন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সেই বলুক প্রথমে। শিবানীর জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

‘সব কথা বলার কোনো দরকার নেই কমল, আমরা জানি। আমরা যা জানি না তুমি শুধু সেটুকুই বলো।’

কমলন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, ‘তাই বলব।’

কমলন্দু বলল : ‘তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকের জন্যে মোতিহারিতে ছেটকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে

এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমার কলেজে ঢোকার সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পড়তে যাবার আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চরিশ ঘণ্টা আদরের ঘটা চলছে। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন গলায়-গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবার কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকার জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসার পর আরো একটু সাহেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওঁরা দেরী করেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধরেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়।...কই, আর একটা সিগারেট দাও তো...’

‘অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তারপর বলল :

‘একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো।...দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যা। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদের বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘর। আমার ঘর থেকে শিবানীর ঘর দেখা যায়...কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছেছিল না।

‘আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশারা করে বলছিলাম শাড়ি পরে মাথায় ঘোঘটা দিয়ে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইরকম করতে করতে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এল। পেয়ারাগাছের ডালের পাশ দিয়ে শিবানীর ঘরের অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে রঙটা বুঝতে পারিনি।...সন্ধের মুখে সব যখন অঙ্ককার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দরজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাতি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তার হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল, হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে।

লঞ্চনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। জলের ছাট আসছিল। আমি আলনায় ঝুলানো আমার একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল খানিকটা ভিজে গিয়েছিল বলে শিবানী তার লম্বা বিনুনি খুলে ফেলেছিল। ওকে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে ঢেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা লঞ্চনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টার ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভালো গাইত তা তোমরাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আর নয়। বাড়বৃষ্টি, বাইরের দুর্ঘোগ আর অঙ্কুরারের মধ্যে আমার ঘরে বসে মিটমিটে লঞ্চনের আলোয় সে গাইল : ‘উত্তল ধারা বাদল ঝরে...’। ওই গানেরই একটা জায়গায় ছিল, ‘ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, অঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে...’। বার বার শিবানী শুই চৱণ দুটি গাইছিল, আর আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পারছিলাম।...গান শেষ হলে আমরা গল্প করতে লাগলাম। এ-গল্প সে-গল্প। শেষে আমরা ছেলেমানুষের মতন হাতের রেখা, কপালের রেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানি বলল, তার বুকে নীল শিরার একটা ত্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবর্তী। বলে আমি হাসছিলাম। এরকম যে হয় না, হত্তে পারে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পারল আমি তাকে অবিশ্বাস করছি। সে বলল, ‘হাসছ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?’ আমি মাথা ন্যাড়লাম, ‘তুমি কি যীশু?’...শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, ‘আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না?’ আমি তাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘যার কোথাও পাপ নেই তার থাকতে পারে...। মানুষের নয়। যীশুর মতন তুমি মরতে পারবে?’... শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তার বুকের জামার ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সরিয়ে আমায় বলল, ‘আলো এনে দেখ।’ ...আমি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই। ...বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে রঙের। সেটা ত্রশ কিনা আমি দেখিনি। আমি অন্য জিনিস দেখলাম। ...আজ আমার স্বীকার করতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিবানীর সেই ইনোসেক্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।’

কমলেন্দু নীরব হল। তাকে খুব অন্যমনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল।
 নদীর চরের ওপরে, রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে, কোথাও

একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন
একটা নিঃযুম ভাব।

আমরা তিন বঙ্গই নিষ্ঠাস ফেললাম। কমলেন্দু রূমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। ‘শিশির, তোমার যা বলার...’

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দিতীয় প্রেমিক
তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠাতার
কথা কমলেন্দুর অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছে থেকে যা আমি
গোপন রেখেছিলাম, এবার তা বলার জন্যে আমি তৈরি হলাম। কুলোপের
মাথা ডিঙিয়ে অপরাহ্নের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার
করে নিয়ে বললাম, ‘আমি খুব সংক্ষেপে সারতে চাই।’

‘শুনি...’ কমলেন্দু বলল।

‘বলছি...। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দরকার নেই। তবে তোমাদের
জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাঝামাঝি ছিল এটা
তার শেষের দিকের ঘটনা—’ আমি ধীরে ধীরে বললাম। ‘শিবানীর বাবা তখন
মারা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আবার
ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে রয়েছি।
শিবানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন এমন অবহায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি
তাকে বিয়ে করব। লতিকা কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীরও তাতে সন্দেহ ছিল
না। সঙ্কেবলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে
হত না, সোজা ড্রয়িংরুমের পরদা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার
ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পজব, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সেরে যখন বাড়ি
ফিরতাম তখন রাত হয়ে যেত। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত।
আর আর রোজই ফেরার সময় ফটকের কবরীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে
আমায় চুমু খেত।... শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কথনো
মনে হয়নি। তার গায়ের রঙ, চোখমুখের ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার
শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল, তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ
ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধরনের রুচি,
পরিচ্ছন্নতা, বেশবাসের সৌন্দর্য... এ-সবের জন্যে, আর শিবানীর তখনকার
শরীরের জন্যে তাকে আমার ভালো লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে তোমরা
জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে। ...একদিন, সেটা
শীতকাল, লতিকা-কাকিমা তাঁদের মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে
চাকর আর বি ছিল। বি-টার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর
শোবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। জানুয়ারী মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের
জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল।...সাধারণ একটা কথা নিয়ে আমরা দুজনেই

হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তার একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমরের কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপর হাত থাকার জন্যে তার বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা ভাল—চেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানার ওপর সুজনিটা ছিল কালচে লাল, তাতে গোলাপের মতন নকশা, শিবানীর পরনের শাড়িটা ছিল সিক্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে পড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার আঘাসংবম নষ্ট হয়ে গেল। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তার গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন ফিসফিস গলায় গরম নিষ্পাসের সঙ্গে জিঞ্জেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব!... আমি তখন যে-কোনো রকম ধাঁঘা দিতে রাজি। বললাম, কালই বলব, কাল পরঙ্গের মধ্যে। শিবানী যেন অঙ্ককারের মধ্যে সুখে আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে গলে যেতে শুরু করল।... সে কতবার করে বলল, সে আমায় ভালোবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালোবাসি। ...তারপর ঘরের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা রঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম। ...তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি...'

আমি থেমে গেলাম আমার গলার কাছে একটা সীসের ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেঁটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন করে বলব!

নদীর ওপারে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝীক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। সমস্ত জায়গাটা অপরাহ্নের বিষণ্ণতায় ত্রুট্টি মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিনি বস্তুর নিষ্পাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবার অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমরা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ করল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল :

'শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমরা কেউ বাচ্চা নেই। আমার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় তিরিশ। লতিকা-মাসির তখন আর ঠিক বেঁচে থাকার মতন অবস্থায় নেই। সেই আরথারাইটিসের অসুখে পঙ্কু শয্যাশয়ী। আমি ব্যাক্তে অ্যাকাউন্টেট হয়েছি নতুন... তোমরা ভাই জানো,

মহেশ্বরী যখন কন্ট্রাকটারী ব্যবসায় নামল তখন আমি তার পেছনে ছিলাম, তার সঙ্গে আমার ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তার লাভের একটা পার্সেন্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাকে তার সবরকম সুবিধে করে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাছ থেকে বেমক্কা দু'চারশো পেতাম। ব্যাকে আমি তার সুবিধে-টুবিধের মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মাঝা ম্যানেজার, যদিও নিজের মাঝা নয়। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লয়েন্স করতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিভী এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার পক্ষে কোথাও আর আইনের ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন মেলামেশা। সত্তি কথা বলতে কি আমার তখন এমন কাউকে দরকার, যে আমায় অর্থ সাহায্য করতে পারে। অস্তত একটা জামিন থাকলেও আমার পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদের নিজের বাড়িঘর, জমি, লতিকা-মাসিমার—আমি ঠাকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলঙ্কার ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শিবানীদের শরণাপন্ন হবার কথা ভাবছিলাম। লতিকা-মাসিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি হবে। তাছাড়া, লতিকা-মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমার তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে-ধরনের সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ করিনি—মানে সেভাবে নয়, আমার তাতে আগ্রহ ছিল না। অর্থ আমি শিবানীদের বাড়িতে সারাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি, বিছানায় শুয়েছি, লতিকা-মাসিমার জন্যে ডাঙ্কার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীর ও তাদের সংসারের তদারকি করেছি।... আমার ওপর লতিকা-মাসিমার সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভাবত জানি না, পরে সে আমার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস করতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গগুগোল বেধে গেছে, মাঝার জোরে তখনো জেলে যাইনি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপের অঙ্গুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমার বাড়ি বলতে এক মা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদের বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায় খাওয়া নেই, ঘূম নেই, চোখ-মুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকা-মাসির খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হল। ডাঙ্কার ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে।... সেদিন সঙ্গের পর লতিকা-মাসির অবস্থা একটু ভালো হল, আমি বাইরে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অঙ্ককারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু'চারটে কথার পর সে বলল, ‘আমি আর কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব?...’ আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা-মাসির কাছে সে সব বলবে।... আমরা দুজনেই

তখন একটা শিউলিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক দিন পরে হঠাতে আমার নাকে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কানা কুকুরের মতন। শিবানী আমায় সাঞ্চা দিল। পরে বলল, ‘এই ঘরবাড়ি টাকা—এসব মা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছে। যার কাছে আমার আশ্রয় জুটবে এ-সবই তার। তুমি তো এসবই তোমার নিজের ভাবতে পার।’ আমি সে-রাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ...লতিকা-মাসিমা আমার তরফে জামিন দাঁড়ালেন, কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায় পড়ল যে তাকে সরিয়ে রাখা টাকা বের করে দিতে হল। আমার গণগোলটাও মিটে গেল। লতিকা-মাসি অবশ্য আরো মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতের জন্য আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিল ; সে-ভাব আমি নিইনি, তাকে আশ্রয়ও দিইনি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে করার মতন যেয়ে আমার কোনোদিনই মনে হয়নি!...

অনাদি চূপ করল।

আমরা চূপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধৰ্মধৰে বক নদীর ওপর দিয়ে গোধূলির আলোর সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, ‘লতিকা-কাকিমার টাকাটা তুমি ফেরত দাওনি?’

‘পরে মাসিমা মারা যাবার পর শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয়নি।’

আর কোনো কথা হল না। আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কারো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। আমাদের চারপাশে সেই সীমের মতন ছায়া ক্রমশই জমতে-লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধূয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তার নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়ের রাশিতে জল ঢাললাম। তারপর অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বাস্থি হচ্ছিল। ও বড় ঝ্রান্ত, অবসন্ন। মনে হল যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর

গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় ঠান্ড উঠে গেল। শুক্রপক্ষ, আজ বুধি ভ্ৰয়োদী।

নদী পিছনে, দু'পাশের জঙ্গল শুটোনো পাখার মতন দু'পাশে নেমে গেছে, সামনে উচু-বীচ কাঁচা রাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, বিদ্রিব ঘন হয়ে এল, ফালুনের বাতাস বইছে, গোকুর গাড়ির চিকন কুকুশ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথার ওপর ঠান্ড।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, ‘শিবানীর চিতায় জল ঢালার সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তাৰ কাছে, তাৰ চিতায় জল দেবাৰ সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।’

অনাদি যে কাঁদছিল আমৰা খেয়াল কৰিনি। সে ছেলেমানুষেৰ মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, ‘আমিও...’

ঠাঁদেৱ আলোয় আমৰা তিন ঘনিষ্ঠ বস্তু, তিনি প্ৰেমিক চলেছি। আমাদেৱ সামনে ভূবন। পিছনে শশান, শিবানীৰ ধূয়ে যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভূবনেৰ দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলুম, আমৰা তিনজনে—তিনি প্ৰেমিক শিবানীৰ নিষ্পাপতা, কৌমার্য নিৰ্ভৱতা তো হৱণ কৰে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্ৰত্যাখ্যান কৰেছি। কিন্তু তাৱপৱেও আৱ কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীৰ, যা ভূবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভূবন যাৰ জন্যে তাৱ এত ব্যথা? ঠাঁদেৱ আলোয় ভূবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তাৱ চাৰপাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তৰ, মগ্ন যে চৱাচৰ তা ক্ৰমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষঘ ভূবন সৃষ্টি কৰছিল। এ যেন আমাদেৱ ভূবন নয়। অথচ আমাদেৱই ভূবন।



লোলিটা

শ্রীমতী বাণী রায়

লোলা সময় পায় না মোটে।

একদিন নিম্নবিভিন্ন পিতার সন্তানরূপে সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার নাম ছিল লীলা। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল পিতার বাড়ী ও গাড়ী। ইংরেজী শুলে ভর্তি হয়ে নামটি পাটাল সে—'নাম রেখেছে লোলা।'

লোলা নামানুযায়ী কর্ম হল। জীবনের বিন্যাস ওই নামেরি পাকে পাকে। যেমন আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ তরুণী দেখা যায় সমাজের উচ্চস্তরে তেমনি দেখা দিল লীলা 'লোলা' রূপে।

এম-এ পাশ করে সে বসল বাড়ী আলো করে। বর্তমান যুগপরিধিতে সাধারণ এম-এ পাশের মূল্য এত অধিক নয় যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ হবে। তাই লোলা গৃহে বসে পুরোপুরি সোসাইটি গের্ল হল।

তবু লোলা সময় পায় না।

নিদ্রাভঙ্গ আটকার পরে। চা-সংবাদপত্র ইত্যাদি নয়টা পর্যন্ত। অতএব সুনীর্ধ ম্লানপর্ব। তারপরে প্রায়শঃ শপিং বা বন্ধুবান্ধব, কিঞ্চিৎ সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রস্তুতি ও আয়োজন। এর মধ্যে টেলিফোনে কথা বলা, চিঠি লেখা আছে। একটায় লাঞ্চ। তিনটে পর্যন্ত অন্য প্রোগাম না থাকলে বিশ্রাম। তখন বিড়টি শীগ ও নভেল পাঠ। সঙ্ক্ষয় প্রত্যহ রঞ্জিন। নিদ্রা প্রায় একটা রাত্রে।

এমন করে দিন কাটে—বসন্ত দিনে ফুলফোটা শেষ হয়। প্রথম গ্রীষ্মে ফুল ঝরে। কিন্তু আকাশে নামে না আবাঢ়।

কোন ভোজের আসরে একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম হলেও ঠিক ওই সার্কেলের লোক নয় সে ব্যক্তি। গেঁয়ো স্বাদ গায়ে মাখা।

অপ্র বয়স তার, লোলার থেকে অবশ্যই ছোট। চোখে গভীরতা, অধরে তারুণ্য। প্রশংসন ললাটে তার এখনও দীপ্তির ছাপ। প্রত্যেক দিনের একমেয়েমির মধ্যে পথচলার আঘাতে সে দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যাবেও একদিন।

খাবার টেবিলে ভয়ে ভয়ে চলছে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে আনাড়ি হাতে মাছের ছুরি, মাংসের ছুরি খেছে সম্পর্শে তুলছে। সামনে তার জীবন্ত আধুনিকতা লোলা

ରାୟ ।

ଫୁଟ୍-ସ୍ୟାଲାଡେ ଚାମତେ ଡୁବିଯେ ଲୋଲା ହିର ସୋଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକାଳ ତାର ଦିକେ ।
ସାରାକଣ ଓଇ ଦୁଟି ଚୋଥେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲାଛିଲ ଲୋଲା । ଏବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରଲ ।

ଲୋଲା ପୁରୁଷଦୃଷ୍ଟି-ପୂଜାଯ ଅଭ୍ୟନ୍ତ । କାରଣ ରାପ ନା ଥାବଲେଓ ଦୀପି ଛିଲ ଲୋଲାର ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୂଜା ଶାସିତରାପେ ପ୍ରକାଶ । ପୂଜାର ଯୁଗ ଚଲେ ଗେଛେ ଏଥିନ । ତବୁ ଏହି
ଯୁଗେର ଓପାର ଥେକେ ଚିରଭନ ପୂଜା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଙ୍ଗରିତ ବକ୍ଷେ ଫିରେ ଏଲ ବୁଝି ।

ଆବାର ପରେ ପାନୀୟ ପ୍ଲାସ ହାତେ ପାଯେ ପାଯେ ଚଲେ ଏଲ ତରଣ । ଚେଖେ ଚେଖେ
ସୁରାପାନେର ମତ କାପ୍ଟନ ନୟ ସେ । ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଚମୁକ ଦିଛେ । ଅଥଚ ଈସ୍‌ବୁଦ୍ଧ
ପାନପାତ୍ରେର ଓପରେ ଚୋଥେ ତାର ମୀଲାଭ ଆକାଶ—ସେଥାନେ ଛାଯା ପଡ଼େଛେ ଲୋଲାର ।

କୃଷ୍ଣଭବ ବାଦାମୀ ଚଲେର ଗୋଛା ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ କ୍ରପାଳୀ ହାତ ଦିଯେ ପାଣୁ ଦାଲିମେର
ମତ କପାଲେର ପାଶ ଥେକେ ସରାଲ ଲୋଲା । ମୋଫାଯ ହାତ ରେଖେ ବଲଲ, “ବସୁନ ନା ।”

ପ୍ଲାସ ନାମିଯେ ରେଖେ ସଙ୍କୁଚିତ ତରଣ ସଞ୍ଚପଣେ ଲୋଲାର ପାଶେ ବସନ । ଚଳ ତାର
ଏଥନ୍ତି ଆଶ୍ଚରେ ଗୁଡ଼େର ମତ । ବାତାସ ବିଲେ ହ୍ୟାତୋ ସେଇ ଚଲେର ବାସା ଏଲୋମେଲୋ
ହେଁ ଯାଯ । ହ୍ୟାତୋ ବା ସେଥାନେ ପଲାତକ କୋନ ପାରୀ ନାମତେ ପାରେ । ଚଲେର ଆଡ଼ାଲେ
ଚକ୍ଷୁ ତାର ଡୁବେ ଯାଯ । ଆବାର ପାଖୀର ବାସା ସେଥାନେ ବାଁଧା ହୁଏ ।

ଶୀତେର ଦିନେ ସେ ଧୂତି-ପାଞ୍ଜାବୀ ପରେ ଏମେହେ । ଏକଟା ହଲୁଦେ ଶାଲ ପିଠେର ଓପର
ଏଲାନୋ । ଶାଲେର ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗେର ଲାଲ କାଜଣୁଲୋ ଏଥିନ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ନୟ ଆର ।
ହ୍ୟାତୋ ଅନେକଦିନ ଆଗେର ବନ୍ଧ ।

ଲୋଲା ଚୋଥ ନାମିଯେ ବସେ ରହିଲ । ଗାଢ଼ ଛାଇ ରଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀଟି ଟେନେ କାଥେର ଓପରେ
ଦିଯେ ନାମିଯେ ଆନନ୍ଦ । ହଠାତ୍ ବୁଝି ଶୀତ ଶୀତ କରଇଛେ । ଚୋଥେର ପନ୍ଦବ ଦୀର୍ଘ ଲୋଲାର ।
କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ସେଥାନେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଯା । ଜୀବନେ ବୁଝି ବିଷାଦ ଓର ଚୋଥେର ପନ୍ଦବଗୁଲୋ
ଅମନ କାଳୋ କରଇଛେ । ସୋସାଇଟି ଗେର୍-ଏର ଏକମେଯେ ଜୀବନ ବୋଧହ୍ୟ ଅନେକଦିନ
ହେଁଇ ଗେଛେ ।

“ଆପନାର ପୂରୋ ନାମଟି ଜାନତେ ଇଚ୍ଛେ ହୁଯ ।”

“ଆମାର ନାମ ଲୋଲା ରାୟ ।”

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରେର ମଧ୍ୟେ ଯେଣ ଗାନ ବେଜେ ଉଠିଲ । ତରଣେର କଟେ ସୁର ଜେଗେ ଉଠିଲ
ଘରେର ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିବେଶେ । ସେଇ ସୁର ହାଟ୍-ର୍ୟାକ୍-—ସେଇ ସୁର ଡିଭାନେର ଗାୟେ ।

“ଲୋଲା ? ବା, ବା ! ଲୋଲା ! ଲୋଲା—ଲଲିଟା !”

ଲୋଲା ଚମକିତ ହଲ । ନବୋକତେର ନାୟିକାର ସଙ୍ଗେ ତାର ନାମେର ମିଳ ଆଗେ କ୍ରେଟ
ଦେଖେନି ।

ଟୁକ୍-ଟୁକ୍ ପି-ଆନୋର ବକ୍ଷାରେର ମତ ଟୁକ୍-ଟୁକ୍ କରେ ଆଲଗା ଆଲଗା ସୁର ବେଜେ
ବେଜେ ଏକଟା ଗାନ ଆବାର ଲୋପ ହେଁ ଗେଲ । ତାରଇ ରେଣ୍ ବାଜତେ ଲାଗଲ ଏଥାନେ
ଓଥାନେ ।

ପାର୍କ ସ୍ଟ୍ରିଟେର ରେଣ୍ଟୋର୍‌ମ ବସେ ଲୋଲା ବଲେ ଉଠିଲ, “କେନ ଯେ ଚା ଖାଓଯାତେ

নিমন্ত্রণ করলেন, বুঝলাম না।”

কাঁপা-ভাঙা গলায় সম্বরণ বলল, “ইচ্ছে হয়েছিল, তাই।”

চা ঢেলে নিয়ে বাঁ হাতে স্যান্ডউচ-এ কামড় লাগাল লোলা। আগে ফুলকাটা রুমাল বার করে ঠোট মুছল। ঠোটের রং আর নথের রং ডালিমফুলী। আজ শাড়ীখানাও তার জয়পুরী—হস্কা রংয়ের ডালিম সে শাড়ীর গায়ে গায়ে ফেটেছে। নিজের নিভস্ত দিনে একটা রংয়ের পাড় বসাতে চেয়েছে লোলা। অনেক দেখার আস্তিতে শ্রান্ত চোখের তারায় রং জ্বালার বাসনা তার।

“আপনার পরিচয়ের মধ্যে জানলাম শুধু আপনি ‘দিগন্ত’ পত্রে আছেন।”

“ওই সমস্ত পার্টিতে আমি যাবার ছাড়গত্র পাই না। সেদিন হঠাত ওপরের সকলেই অন্ত্র আবদ্ধ ছিলেন—তাই আমাকে যেতে হল।”

বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল লোলা। বেশ-ভূষায় সাধারণ ছাপ। এত দামী চা-করে ডাকা তার পর্যায়ের লোকের পক্ষে উচিত হয়নি।

এ কে, উদ্বাহ বামন কিস্বা চালিয়াৎ?

অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মিথ্যাবাদীর কপট পরিচয়ে ও কি লোলার সমাজপরিধির দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

“কিন্তু লোকের অন্য পরিচয়ও তো থাকে?” লোলা কথা টেনে নিয়ে গেল।

“কি পরিচয় চান আপনি?” হাসিমুখে সম্বরণ জিজ্ঞাসা করল।

“পরিচয় সামাজিক আছে, পারিবারিক আছে, সাংস্কৃতিক আছে।”

“সামাজিক, নিম্নমধ্যবিভ্র”—ভৌকু গলায় বলে চলল সম্বরণ, “পারিবারিক, বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। একান্নবর্তী পরিবারের নাম শুনে আজকল লোকে ভয় পায়। সাংস্কৃতিক, বিশেষ কিছুই নয়। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না এম-এটা পাশ করিনি। তবু তো আপনাকে খুজে বার করলাম।”

এ কী ভাষা! সোজা-সহজ। কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়শালী। বিমনা হয়ে লোলা ছোট টেবিলটায় চোখ নামিয়ে রইল। নবোকভের ললিটা সে নয়—হবেও না কোনোদিন। তরুণ কিশলয় বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে। পাপের হস্তলিপি হয়ে কালের বুকে ফুটে উঠতে সে সুযোগ পায়নি। সাধারণ নারীর যা চাহিদা, তারও তাই।

ইতস্তত করে সে বলল, “শাড়ীতে কে কে আছেন?”

‘মা, দাদারা, কাকারা, আর আমি। সকলেরি নিজস্ব একটি করে ইউনিট আছে। বাবা-মারা যাওয়ায় মা ইউনিট ভষ্ট।’

“আপনার?” সাগ্রহে লোলা প্রশ্ন করল।

“আমার ইউনিটে আমার স্ত্রী আর ছোট মেয়েটি।”.

পি-আনোর কর্ড এবার ভাসাসুরে শেষ হল।

তবু তো—

লোলা, ললিটা!

আমার স্বর্গ ও নরক, আমার পাপ, আমার মুক্তি।

দিনগুলো লোলার বিরক্ত হয়ে ওঠে। কি করে সে বোঝাবে সম্বরণকে তার সময় নেই? খেলাধূলার দিন তার শেষ হয়েছে। যেখানে পরিণতি নেই, সেখানে লোলা আর সময় কাটাতে পারে না।

সম্বরণের ডাকার বিরতি নেই।

টেলিফোনে সে শতবার ডাকে লোলাকে, চিঠি লেখে ক্রমাগত। উক্তর না দিলে অভিমান হয় তার। চায়ের নিমস্ত্রণ জানায় ক্রমাগত।

দুই-চারবার লোলাকে চা-খাওয়াবার পরে লোলা লক্ষ্য করে দেখল হাতে পাথরের আংটিটা নেই তার। লাল একটা পাথর বসানো মরা সোনার আংটি ছিল। হয় পৈতে নয় বিবাহ উপলক্ষে পাওয়া।

তারপরে সম্বরণ চায়ে ডাকলে কোন না কোন অজুহাতে লোলা না করত। সে নিয়ে মানাভিমানেরও অস্ত ছিল না। মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে তাকে ডাকতে হত লোলার।

ভিখারীর মত যে লোক চেয়ে থাকে লোলার দিকে, লোলার সামান্য অকৃত্তি যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাকে নিয়ে চলা বিপদ। অথচ ছাড়বে না সে লোলাকে।

“আপনি বিবাহিত। আপনি পিতা। এভাবে আমার সঙ্গে—”

একদিন দ্বিধার বাধা কাটিয়ে লোলা বলেছিল, “আপনার স্তৰী জানেন যে আপনি আমার সঙ্গে মিশছেন এত?”

“হ্যাঁ!”

“তিনি কিছু মনে করেন না?”

“না তো। আমি অনেক লোকের সঙ্গেই মিশি ওভাবে হয়তো তাই।”

“আপনি এত—বাইরে ঘোরা ছাড়ুন।” লোলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল। গায়ের জামার মত শাদা হয়ে উঠল সম্বরণের মুখ।

“না, না। না।” বলে উঠল সম্বরণ।

“না কি। আমার সঙ্গে মেশা হবে না আপনার।” তর্জন করে বলে উঠেছিল লোলা।

“লোলা, ললিটা! আমাকে দয়া কর। এমন কথা বলো না।”

শিহরিতা লোলা চুপ করে গিয়েছিল।

তারপরে?

দিনগুলো জট বেঁধে গেল লোলার। হাঙ্কা মেঘে ভাসা দিনগুলো আবগের বর্ষণবিকারে ভারী হয়ে উঠল।

যে প্রেমে শেষ দিগন্ত দেখা যায় না, কুয়াশায় আবৃত যার দিগন্ত, তেমন প্রেমে মনে শুধু আসে নৈরাশ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্পবিত্ত ছেলে স্তৰী আর মেয়েকে

নিয়ে ঘর বেঁধেছে। সে ঘর ভাঙতে চায় না লোলা।

ভেঙ্গে যা পাবে, তাতে লোলার চলবে না।

অথচ সম্বরণ বারণ শোনে না। এড়ানো যায় না তাকে।

ধর্মতলা দিয়ে গাড়ী চলছিল সেদিন লোলার বালিগঞ্জের দিকে। বাবাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল বাড়ীতে।

একটু বিষণ্ণ উদাস্যে রাস্তার দু'পাশে পেডমেটের দোকান দেখতে দেখতে চলেছে লোলা। চৌরঙ্গী পাড়ার এখারে বাজার করতে আসে না সে। এখানে নাকি খুবই সন্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়, বশুরা বলেছে।

আজকাল মন ভালো থাকে না লোলার। সম্বরণ তার প্রেমকে সম্বরণ করবে না, বারণ শুনবে না। ও রকম 'ড্যাম্পিং নোবাডি' লোককে লোলার দারোয়ান ও বেয়ারাই আদেশ পেলে ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু লোলা সে আদেশ দেয়নি। কেন লোলা সন্তা সাংবাদিককে সরাতে পারছে না, জানে না সে।

শুধু মন তার অবসাদে নিতে আসছে। অন্যমনক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে লোলা।

রাস্তার বেসাতির ওপর ঝুকে সম্বরণের মত দর্শনধারী এক ব্যক্তি কি যেন কিনছেন। ঠিক যেন সম্বরণ।

ও তো সম্বরণই। আরে! সোজা হয়ে বসল লোলা। বেলা প্রায় এগারোটা। ফুটপাতের সন্তা পশরা মেলার ধারে উবু হয়ে বসে সম্বরণ কি কিনছে?

হয়তো পঞ্চীর জন্য সন্তা প্লাস্টিকের চিকণী কিষ্মা কন্যার জন্য খেলনা। এখানে? এই পরিবেশে?

এই তো ওর যোগ্যস্থান। একান্ত সংসারী লোকটি ছিটকে এসেছে লোলার কাছে। সে প্রেমিক নয়, সুবিধাবাদী।

বিষণ্ণ মন লোলার শক্ত হয়ে উঠল। আঘাতান্ত্রিক উদয় হল।

তারপরে কয়েকদিনের মধ্যে লোলা চলে গেল বোম্বাই শহরে পিসতুতো দিদির বাড়ী। জামাইবাবু আধুনিক ও ধনী, দিদি মেহশীলা। এখানে সম্বরণকে জানিয়ে গেল না।

চন্দ্রালোকে জুহু বীচ, প্রমোদ ভ্রমণের স্বর্গ।

শীতের সন্ধ্যা, কিন্তু শীতের চিহ্ন নেই এখানে। চির বসন্ত বিরাজমান। ছোট ঢেউ নিয়ে সমুদ্র সমতল বালির বিছানায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আধো অঙ্কুরে দলে দলে লোকের সেখানে নানা আনন্দের আবর্তে গতায়াত। কলেজের ছাত্রছাত্রী শ্ল্যাকস সালোয়ার পরা খালি পায়ে সোনার মত উজ্জুল মিহি বালু ঠেলে ঠেলে জলের ধারে নেমে আসছে। বিরবিরে জল তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে, জামা-কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। কল কোলাহলে ছুটে তারা পালাচ্ছে, আবার জলের ঝুকে নেমে আসছে।

প্রবল বাতাসে জামা-কাপড় গায়ে লেগে যায়, গঠন-শ্রী ফুলে ওঠে। কামনার
স্বর্গ জুহসেকত।

লোলা এসেছে এখানে, পরিবারের সঙ্গে। দিদি জামাইবাবুর বক্ষুর দল এসেছে।

হৈ-চৈ চলছে কলিকাতাবাসিনী অনৃতা, আধুনিকা লোলাকে কেন্দ্র করে।
পুরুষের ছেট একটি দল ঘিরে আছে ওকে।

“লোলা, বল তো কাকে পছন্দ তোমার? এরা সবাই যে শেষে ডুএল লড়ে
ধ্বংস হবে!” জামাইবাবু সহাস্য প্রশ্ন করলেন। “কি যে বলেন, অসিতদা!” লোলা
অনুযোগে স্বর অসহিষ্ণু করে তুলল।

এদের সঙ্গে সামান্য আলাপ তার, গভীরতার প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার সমাজে
এমন রসিকতার চালান আসে অবিরত।

এদের কাউকে ভাল লাগে না। মনে হয়, বাইরে পোষাক পরানো ডামি।
অঙ্গঃসারশূন্যতা কথাবার্তায়, চলাফেরায় থ্রেকট হয়ে উঠছে।

“না, না, বেছে নিতে হবে, নিন একজনকে।” হাঙ্কা পরিহাসটাকে বিলম্বিত
করে নৃতন রসক্ষেত্র সৃষ্টি করল তারা। চাঁদের আলোয়, শান্ত সমুদ্রের মণ্ডু
যুম্পাড়ানিয়া গর্জনে যেন নেশা জয়ে উঠেছিল।

ব্যারিষ্টার অমরেশ বসু এগিয়ে এল। আন্তে কাঁধে হাত রাখল তার, পাইপ-
ধরা ঠোটে টিপে টিপে বলল, “না হে না, তরশুর দল। আমরা দুঁজনই পৃথিবী
বহুদিন দেখেছি। লোলা ইজ মাই গেল।”

অমরেশ বসুর সম্প্রতি দ্বিতীয়া পত্নী শ্বেতাঞ্জিনীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা
চলছে। বয়স হয়েছে তাঁর চমিশ! মেদসম্পর্ক বেঁটে চেহারা, কালৰণ, বর্তুলাকার
মুখে মেচেতার ছাপ।

লোলার মুখ চাঁদের আলোয় নীলাভ হয়ে গেল অপমানে। তখনি উঠে এল
অঙ্কুরার সমুদ্র কিনারা থেকে অস্পষ্ট যেন জলদেবতা কোনো। দু-একটি লোকের
সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল সে এতক্ষণ দূরে।

বালি বেয়ে আসতে হচ্ছে, পায়ে জোর লাগছে। তাই দেহ ঈষৎ অবনত তার।
বাতাসে গায়ের জামা ফুলে ফুলে উঠছে। স্থির লক্ষ্যে সে দৃঢ়ভাবে জটলার দিকে
এগিয়ে এল।

লোলার কাঁধে তখনও প্রৌঢ় লস্পটের হাত ধাবার মত আঁকড়ে আছে। হাসছে
সকলে তাদের ঘিরে।

কঠিন হাতে লোলার মণিবক্ষ চেপে ধরল আগস্তক, দৃশ্য গলায় বলল, নো,
শী ইস মাই গেল।”

তরুণ সুন্দর একথানা মুখ। চুলের খোকায় তার সামুদ্রিক বাতাসের খেলা।
দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ অঙ্গ তার। লোলা চমকে উঠল। সারা জটলায় তখন চমক
লেগেছে। লোলার দিদি জামাইবাবু স্তুপ্তি হয়ে গেছেন। হাসিষ্টাট্রার কথার মধ্যে

সম্পূর্ণ বাইরের ব্যক্তি চলে এল কেন?

“তুমি? এখানে এসেছ?” লোলার প্রশ্নে সে উত্তর দিল, “হ্যাঁ। অৱ টাকার একটা ট্যুরের লোভ ছাড়তে পারিনি। তুমি এখানে আছ, তা অবশ্য জানতাম না। জুহতে এসে পেলাম।”

“সম্বরণ,—তুমি কি একা—?” প্রশ্ন পাঠাল লোলা।

“না, একা নই।” অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সম্বরণ বলল, “আমার ক্রী ও মেয়েও এসেছে। এই যে ওখানে তারা দাঁড়িয়ে।” জলের দিকে আঙুল দেখাল সে।

জলের ধারে বালির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সজীব পৌঁছিলা একটি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অশিক্ষিতা ঘরোয়া বৌ। ভুল হবে না কারুর যে জড়দগবকে টেনে এনেছে উৎসাহী স্বামী। সন্তা পোষাকে মোড়া সজ্ঞানটি গেঁয়ো মেয়েদের মত ট্যাকে গেঁজা।

এরই স্বামী সকলের সম্মুখে লোলার হাত ধরে টেনে বলতে সাহস পায় লোলা তার প্রিয়া!

অসহ্য রাগে লোলার সভ্যতার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ঝাঁকুনী দিয়ে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল সে, ‘কী আশ্পার্ধা! আমার কাজ নেই তোমার মত একটা লোকের—তায় আবার বিবাহিত, মেয়ের বাবা! আকাশ-কুসুমের স্ফপ দেখো না। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।’

লোলা নিজেই গট্টগট্ট করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল উঠে বালি পেরিয়ে পথের দিকে।

পেছনে জটলা শতধা হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে অনেক দূর থেকে একখানা চিঠি এল—“লোলা আমার পাপ, আমার স্বর্গ! তেরো হাজার ফিট উচু থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখন নেফা এলাকায়। বাড়ীতে মিথ্যা বলে পালিয়ে এসেছি এখানে আমি। সাংবাদিক হিসাবে দেশের প্রতি আমার কর্তব্য করা হয়নি।

আমি নবোকভের নায়ক নই। ক্রীর প্রতি উদাসীন না হয়েও তোমাকে ভালবেসেছিলাম সত্য। সেজন্য আমাকে তুমি ঘৃণ করেছ, তা-ও জানি। আমি চরিত্রহীন নই। দুটো ভালবাসাই আমার কাছে সত্য। কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম।

আজ এখানে এসেছি আর এক ভালবাসার টানে। আমার চারদিকে নির্মম—বিশ্বাসঘাতক শক্র। যে কোন উপায়েই পররাজ্যগাসী, লোলুপ পরদেশী দ্রাগনের গ্রাসে হয়তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেছি। তবু এই ভালবাসা আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছে।

লোলা, ললিটা! আমার জীবনে এই তিন ভালবাসার সমষ্টিয়ে গড়া মানুষ আমি। কোন্ ভালবাসা আমার কাছে প্রেষ্ঠ এখনও জানা হয়নি।

—সম্বরণ



প্রেমিক ও স্বামী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যুবকটির সঙ্গে দোকানটায় ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছিল নিখিলের। তখন যুবকটি নিখিলের চেখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনো কথা বলেনি।

নিখিলও ঠিক মনে করতে পারলো না যুবকটিকে আগে কোথাও দেখেছে কিংবা তার নাম কি। অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যাকগে, নিখিল আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না। সিঁড়ির ওপর একটা লোহার টুকরো পড়েছিল, নিখিল শাস্তাকে বলল, দেখো, হোঁচ্ট খেয়ো না।

রবিবারের সকাল। নিখিল শাস্তাকে নিয়ে পার্ক ষ্ট্রাইটের, একটা নিলামের দোকানে এসেছে। বিশেষ কোনো কিছু যে কেনার উদ্দেশ্য আছে তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু চোখে লেগে যায়। এখানে সাহেব বাড়ির কুপো বাঁধানো আয়না থেকে শুরু করে খেতপাথরের টেবিল পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, কিছু না কিনেও দু'একবার দাম হাঁকতে মন্দ লাগে না।

রোজউডের একটা ছেট্ট বেডসাইড টেবিল খুব পছন্দ হয়েছে শাস্তার ; সে দাম বলতে শুরু করেছে। আরও হয়েছে পনেরো টাকা থেকে—একজন স্তুলকায় মাড়োয়ারী এবং একজন গন্তীর চেহারার পার্শ্ব মহিলা অনবরত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দর ওঠার পর নিখিল ইশারা করলো শাস্তাকে। এরপর জেনাজেন্দির জন্য দাম বেড়ে যাবে—সাধারণতঃ এইরকম হয়। শাস্তা তবু বললো, ষাট টাকা। তারপর থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত পার্শ্ব মহিলাই সেটা কিনে নিলেন একানকাই টাকায়।

শাস্তা নিখিলের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, তুমি বারণ করলে কেন? জিনিষটা ভাল ছিল কিন্তু!

নিখিল বললো, তা বলে অত দাম দেবার কোনো মানে হয় না। রোজউড হোক আর যাই হোক—ঝটকু তো জিনিষ, পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হয় না।

এই সময় সেই যুবকটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। শাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

শাস্তা চিনতে পেরেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, ওমা, আপনি? বাঃ, কেন চিনতে পারবো না! আপনি এখন কলকাতায় আছেন?

যুবকটি এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসম্মত হাসি দিয়ে বললো, আপনি ভালো?

নিখিল এবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো ওকে। ছেলেটির নাম অলোক ব্যানার্জি, দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ।

নিখিল চাট্ করে একটা মজার ব্যাপার ভেবে নিল। মজাটা হচ্ছে এই, দোকানে ঢোকার মুখে সে ছেলেটিকে চিনতে পারেনি—ছেলেটিও নিশ্চয়ই চিনতে পারেনি। —তা হলে কথা বলতো। ছেলেটি তখন শাস্তাকে দেখেনি। কিন্তু ছেলেটি শাস্তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এবং শাস্তাও চিনতে পেরেছে ওকে। অথচ একসঙ্গেই তো আলাপ।

দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। নিখিল আর শাস্তা সদ্য বিয়ে করে গিয়েছিল হনিমুনে। তখন বর্ষাকাল—বিশেষ লোকজন নেই। হোটেলের পাশের ঘরটাতেই থাকতো এই অলোক ব্যানার্জি। নিজে থেকেই যেতে আলাপ করেছিল।

অলোক শাস্তাকে বললে, টেব্লটা না কিনে ভালই করেছেন। ওর লক্টা খারাপ, আমি আগেই দেখেছি।

শাস্তা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কলকাতায় থাকেন?

অলোক বললো, হ্যাঁ, আপাততঃ দু'এক বছরের জন্য কলকাতায়।

দার্জিলিং-এ যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন অলোক বলেছিল, ও জামসেদপুরে থাকে। একলা একলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিল কেন? সে সম্পর্কে অলোক জানিয়েছিল যে, প্রায়ই সে একা একা নানান জায়গায় ধূরে বেড়ায়। কোন এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে তার ভালো লাগে না। কখনো পাহাড়ী জায়গায় কখনো সমুদ্রের ধারে ছুটি পেলেই সে চলে যায়।

ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক মনে হয়েছিল ওদের কাছে। যুবা বয়েসে সাধারণতঃ কেউ একা একা বেড়াতে যায় না। নিখিল যেমন কখনো যায়নি। হয় যাওয়া হয় বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বৈঁধে—অথবা বিবাহিত হলে স্তীর সঙ্গে।

একদিন জলাপাহাড় অঞ্চলে একটা পাথরের ওপর একা অলোক ব্যানার্জিকে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে দেখে শাস্তা পরিহাসের সঙ্গে বলেছিল, দ্যাখো, দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয় ব্যর্থ প্রেমিক। কিংবা কবি-টবি নয় তো! নইলে সঝ্যেবেলা কেউ ঐরকম একা বসে থাকে?

শাস্তা আর নিখিল দার্জিলিং-এ ছিল দশদিন। এর মধ্যে অলোক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে। কখনো বেড়াতে যাবার মুখেই দেখা হওয়ায় অলোক ব্যানার্জি বলেছে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

নতুন বিয়ের পর যারা হনিমুনে গেছে—অন্যদের উচিত নয় তাদের সঙ্গে

বেশী দেখা করা। তাদের নিরালায় থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অলোক ব্যানার্জি তা বোনেনি। এ নিয়ে শাস্তা প্রথম প্রথম দু'একবার বলেছে, তদ্বলোক বজ্ড গায়ে পড়া আমরা আলাদা কোথাও যাবো—তার উপায় নেই। ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হবেই! নিখিল উদারভাবে বলেছে তাতে কি হয়েছে, লোকটা তো খারাপ নয়! কথাবার্তা বেশ ভদ্র! পৃথিবীতে একেবারে নিরালা জায়গা আর তুমি কোথায় পাবে?

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শাস্তা লোকটিকে মোটামুটি সহ্য করে নেয়। অলোক ব্যানার্জি সবসময় বেশ ফিটফাট সেজেগুজে থাকে, ব্যবহার খুবই ভদ্র, নানারকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। এরকম লোক গায়ে পড়া হলেও এড়ানো যায় না।

নিখিল দু'চারদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অলোক ব্যানার্জি পেশায় সেল্স রিপ্রেজেন্টেটিভ। নানা জায়গায় ওকে একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় চাকরির কারণে। সেটাকেই ও একটু রোমান্টিক রূপ দিয়ে বলেছে। হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে অলোক ব্যানার্জির কথাবার্তা শুনে নিখিল বুবাতে পেরেছে—এই হোটেলেই সে বছরে দু'তিনবার আসে। অথচ শাস্তার কাছে কথায় কথায় ও একবার বলেছিল, দাজিলিং-এ এই ওর প্রথম আসা। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘূম-এ গিয়েছিল, শুধু ওদের সঙ্গ পাবার জন্য। নইলে দাজিলিং-এ বারবার এসে কেউ প্রতিবার ঘূম কিংবা টাইগার হিল্স দেখতে যায় না।

নিখিল অবশ্য এ কথাটা বলেনি শাস্তাকে। এটুকু মিথ্যে কথা বলে লোকটি এমন কিছু দোষ করেনি। শুধু ওর সম্পর্কে শাস্তার ধারণা খারাপ করে দেবার কোন মানে হয় না। নিখিল শাস্তার স্বামী, আর অলোক ব্যানার্জির চোখে শাস্তা একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলা। একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলার কাছে নিজেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য করে তোলার জন্য ওরকম একটু আধ্যু মিথ্যে কথা সব পুরুষ মানুষই বলে! নিখিলও হয়তো বলতো। সংসারে মন টেকে না এমন একজন যুবক সমুদ্র কিংবা পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—এই চরিত্রটি মেয়েদের পছন্দ হবে। তার বদলে, চাকরির জন্য নানা জায়গায় ট্যুরে যেতে হয়—এই সাদা সত্তি কথাটা এমন কিছু না।

যুবকটি শেষপর্যন্ত শাস্তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। শেষের দিকে শাস্তাকে দেখলেই একটা গদগদভাব এসে যেত। মাথা নুইয়ে নুইয়ে এমনভাবে কথা বলতো যে দেখলেই প্রেমিক প্রেমিক মনে হয়। কখন নিখিল একটু দূরে যাবে—শাস্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলা সম্ভব হবে—সেই সুযোগ খুঁজতো।

সদ্য বিবাহিতা এবং স্বামী সঙ্গে উপস্থিত—এমন মেয়ের প্রেমে পড়া যে উচিত নয় সেটা বুবাতে পারেনি ছেলেটি। তা আর কি করা যাবে। প্রেমে তো সবাই হিসেব করে পড়ে না! ভালবাসা অঙ্গ—একথা আর তাহলে বলে কেন? নিখিল

এইসব ভাবতো। নিখিল মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতো। হঠাৎ বেড়াতে এসে দেখা, একটু সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনটা একটু নরম হয়ে যাওয়া—তার সঙ্গ পাবার একটি ইচ্ছে—এর বেশি কিছু তো নয়! এতে দোষের কিছু নেই।

নিখিল অবশ্য মনে মনে বুঝতে পারলো, অলোক ব্যানার্জি মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তা তো করবেই। মনে মনে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তার স্বামীকে কেই বা পছন্দ করে। স্বামীরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আপনী। তাদের কেউ-ই পছন্দ করে না। নিখিল মাঝে মাঝে নিজেকে অলোক ব্যানার্জির জায়গায় বসিয়ে ভাবতো, সে যদি শাস্তার মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে এইরকম প্রেমে পড়তো তাহলে সেও কি মনে মনে চাইতো না—স্বামীটা এখানে না থাকলেই ভালো হয়! বস্তুত এরকম ঘটনা তো নিখিলের জীবনেও ঘটেছে।

নিখিল অবশ্য অলোক ব্যানার্জিকে খুব বেশী খুশী করতে পারেনি। অলোকের সঙ্গে শাস্তাকে বেশীক্ষণ একা থাকার সুযোগ দেওয়া সঙ্গে হয়নি। সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে পরপুরুষের কাছে রেখে দূরে সরে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেটা কি ভাল দেখায়? ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যতদূর যা করা যায়, নিখিল তাই করেছে।

শাস্তাও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। নিশ্চয়ই বুঝেছিল এবং বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল। একটা ফিটফাট চেহারার সুর্দশন যুবক সবসময় খাতির করে, প্রশংসা করে কথা বলছে—এটা কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে? এমন কি সদ্য বিবাহিতা মেয়েদেরও ভালো লাগে। এর প্রতিদান হিসাবে শাস্তা আর কি-ই বা দিতে পারে, টুকরো টুকরো হাসি আর দু'চারটে রহস্য ঘোষণা সংলাপ। মেয়েদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না। মেয়েরা যে মেয়ে—এটাই তাদের মন্তব্ধ শুণ, ছেলেদের কাছে। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। নিখিল জানতো, শাস্তা কক্ষনো চুপিচুপি রাস্তির বেলা অলোক ব্যানার্জির ঘরে চুকবে না। শাস্তা ভালো মেয়ে এবং সে নিখিলকে সত্যই ভালোবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে এই রকম দু'একটা ছেট-খটো প্রেমিক-প্রেমিকার সাইড ক্যারেষ্টার এলেও কোন ক্ষতি হয় না।

জলাপাহাড়েই আর একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেদিনও ওখানে অলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিখিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল অলোক ইচ্ছে করেই সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক জানতো ওরা ওদিকেই আসবে। এরকম অনেকেই করে। অলোক ওদের দেখে কমলো, আরেং! আগবোরাও আজ এদিকে এসেছেন? আমার কিছু করার উপায় নেই, তাই ঘূরতে ঘূরতে এদিকটায় এলাম।

নিখিল বলল, চলুন, একসঙ্গে বেড়ানো যাক।

শান্তা বললো, বেড়াবার কি উপায় আছে? সারাদিন ধরেই তো বৃষ্টি! এতদিনে একবারও কাঞ্চনজঙ্গলা দেখতে পেলাম না।

অলোক বললো, আজ মেষ সরে যাচ্ছে! দেখনু, দেখুন—কি রকম উড়ে যাচ্ছে হালকা হালকা মেষ। আজ কাঞ্চনজঙ্গলা দেখা যেতে পারে।

নিখিল ওকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি রেন-কোট কিংবা ছাতা আনেন নি কেন? শুধু শুধু ভিজছেন।

অলোক বললো, একটু ভিজলে কি আর হবে!

নিখিলদের সঙ্গে একটা মাত্র ছাতা। তাতে তারা শামী-স্ত্রী গা রেঁবার্ঘেবি করে গেলে কোন দোষ নেই। হনিমুনের সময় স্টেটাই শাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি আর একজন ভিজতে ভিজতে গেলে অস্বস্তি লাগে। নিখিল বললো, আপনিও আসুন না!

অলোক খুব আপত্তি করা সত্ত্বেও নিখিল তাকে টেনে আনলো। তবে, এক ছাতার তলায় শামী-স্ত্রী আর স্ত্রী-র প্রেমিক কিছুতেই ধরানো যায় না—তাতে তিনজনেরই অসুবিধে। যাই হোক একটু বাদে বৃষ্টি করে গেল অনেকটা। পাউডারের মত মিহি মিহি বৃষ্টি এসে লাগছে গায়ে—নিখিল ছাতা শুটিয়ে ফেলেছে। বহুদূর পর্যন্ত নিচু উপত্যকায় যেন হালকা একটা জাল বেছানো রয়েছে।

এদিকটা খুবই নির্জন, আর কোন ভ্রমণ-পিপাসুকে দেখা যায় না। এই সময় শান্তার হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় ছেট বাথরুম। শান্তা ইশারায় নিখিলকে জানালো সে কথা—এখন নিখিলকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা শৌখিন প্রেমিকদের কাছে বলা যায় না, শামীকেই বলতে হয়।

এমনিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কাছাকাছি মানুষজন নেই—একটা কোনো গাছের আড়ালে শান্তা বসে পড়তে পারতো। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু অলোক রয়েছে যে। অলোকের সামনে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যে লজ্জার ব্যাপার। নিখিল শান্তাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, হোটেলে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। শান্তা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ওরা অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

অগত্যা নিখিলকে ব্যবস্থা করতেই হলো। একটা সুবিধামতন গাছ দেখে নিখিল গভীর মুখ করে শান্তাকে বললো, তুমি কোথায় যাবে বলেছিলে যাও, আমি আর অলোকবাবু রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি।

অলোক প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাগিস কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অলোক যেমন সব সময় শান্তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য ব্যস্ত, এ ব্যাপারেও সে সাহায্যের প্রস্তাৱ দিয়ে ফেললে হয়েছিল আর কি। যাই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেচারা খুব লজ্জা পেয়ে

গেল।

নিখিল অলোককে নিয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই নিন, সিগারেট নিন।

তারপর আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। দু'জনের মধ্যে কোনোরকমে ঘতের মিল নেই—কথাবার্তা আর কি হবে। নিখিল হঠাতে লক্ষ্য করলো, অলোক বেশ চক্ষুল হয়ে পড়েছে। কথা বলায় তার একটুও মন নেই। যেন তার ভেতরের একটা দুর্বার ইচ্ছে চাইছে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে শাস্তাকে। এটাও তো স্বাভাবিক। নিখিল তার স্ত্রীকে প্রতি রাত্রে দেখে—তার এখন ওরকম ইচ্ছে জাগবার কথা নয়! কিন্তু একজন সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে একজন অনাধীয় পুরুষের তো সেরকম মনোভাব হবে না। ভদ্রতা সভ্যতার মোড়ক দিয়ে এটাকে যতই ঢেকে রাখা যাক—ব্যাপারটা তো জলের মত সোজা। বেশ কোতুক বোধ করে নিখিল মিটিমিটি হাসতে লগলো।

যাইহোক, সেবার নিখিলরা চলে আসবার পরও অলোক ব্যানার্জি দাঙিলিং-এ থেকে যায়। অলোক ওদের স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিতে এসেছিল। ঠিকানা বিনিময়, আবার দেখা হবার আশ্বাস ইত্যাদি যা যা হয়—সেবার তো হয়েছিলই। অলোক জামসেদপুরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল ওদের। নিখিলও বলেছিল, কলকাতায় এলে অলোক যেন নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসে। চিঠিপত্রেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ থাকবে ইত্যাদি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও নিখিল দেখলো, অলোক তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শাস্তার প্রেমিক পেছনে পড়ে রইলো।

চলে আসবার আগের দিন নিখিল টের পেয়েছিল যে অলোক ব্যানার্জি বিবাহিত। কি একটা কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। এটা জানার জন্য নিখিলের কোতুহল ছিল, অথচ জিজ্ঞেস করাও যায় না সরাসরি—তাই সে প্রসঙ্গটা ধরে ঠিক বুঝে নিয়েছে। অলোক অবশ্য কোনদিনই বলেনি যে সে বিবাহিত নয়—কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথা সে একবারও উচ্চারণ করেনি এবং তার ঐ একা-একা ভাবটার জন্য যেন ধরেই নিতে হয় যে সংসারেও সে একা। শাস্তার সেই রকমই ধারণা।

নিখিল অবশ্য শাস্তার এই ভুলটাও ভেঙে দেয়নি। অলোক ব্যানার্জি এ কথাটা চেপে গেছে, বেশ করেছে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিবাহিত লোকদের কি প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ? পৃথিবীতে চের চের বিবাহিত পুরুষই প্রেম করে। তবে মেয়েরা তাদের প্রেমিক হিসেবে বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে অবিবাহিত ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। প্রেমিক—এই ধারণাটাই বিবাহের সম্পর্কের উৎসে যেন। নিখিল চেয়েছিল শাস্তার এই শৌখিন প্রেম-প্রেম খেলাটুকু অবিকৃতই থাকে। শেষ মুহূর্তে ধারণা ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা।

অলোকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা হয়নি অবশ্য। বেড়াতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই আলাপ আর বেশীদুর গড়ায় না। তাছাড়া দাজিলিং-এ যাকে ভালো লাগে, কলকাতায় তাকে আর ভালো না-ও লাগতে পারে। কখনো কখনো ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অলোক ব্যানার্জির প্রসঙ্গ তুলে হাসাহসি করেছে বটে—তবে তার বেশী আর কিছু না।

আবার হঠাৎ এই নিলামের দোকানে দেখ। অনেকক্ষণ ওরা একসঙ্গে রইলো। অলোক কিনে ফেললো একটা বুক কেস এবং প্রায় তার পেড়াপিড়িতেই শাস্তাকে কিনতে হলো একজোড়া ফুলদানি! দাজিলিং-এর গঞ্জও হলো অনেকক্ষণ এবং অলোককে একদিন তাদের বাড়ীতে অবশ্যই আসতে বলা হলো।

কিন্তু আসতে বলা মানেই নেমস্তন্ত্র করা নয়। বিশেষ কোনো দিন ঠিক করে নেমস্তন্ত্র করা। আর, আপনি একদিন আসবেন—এই বলার মধ্যে অনেক তফাত। নিখিল নেমস্তন্ত্র করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। শুধু তাই নয়, অলোক ব্যানার্জিকে আজ দেখে সে খুশী হয়নি। শাস্তা আর অলোকের মধ্যে কথা হয়। তাকে স্বামী সেজে পাশে সারাক্ষণ বোকা বোকা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া ভদ্রলোকের যে রকম প্রেমে পড়ার বাতিক, তাতে বেশী প্রেম জমিয়ে ফেললেই মুশকিল। দাজিলিং-এ ছুটির সময় সে এ ব্যাপারটাতে মজা পেয়েছিল—কলকাতায় নানা কাজের বামেলায় এসব ঠিক সহ্য করা যায় না। কোনো ভদ্রলোক কি তার স্ত্রীকে সব সময় পাহারা দিতে পারে? তাছাড়া, কলকাতায় শাস্তার তো পুরনো দিনের দুর্দিন জন বন্ধু আছেই—দাজিলিং-এর বন্ধুকে তার কলকাতায় দরকার নেই।

নিখিল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল। অলোক যদিও একবার বলেছে যে সে কলকাতায় ফার্ণ রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের একবারও যেতে বলেনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী কি খুব কুৎসিত দেখতে?

বাড়ি ফিরে শাস্তা বললো, ভদ্রলোক বেশ মজার, তাই না! সবসময় এত বেশী বেশী ভদ্রতা দেখাতে চায় যে বোকা বোকা দেখায়!

নিখিল গভীরভাবে বললো, ও দেখছি, এখনো তোমার প্রেমে পড়ে আছে। শাস্তা চোখ কুঁচকে হাসিমুখে বললো, তবে? তুমি ভাবো কি? এখনো লোকে আমার প্রেমে পড়ে!

নিখিলও না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো, দুপুরবেলা যখন আমি বাড়ি থাকব না—তখন যেন না আসা শুরু করে! দেখো বাবা!

শাস্তা নিখিলকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বড় অসভ্য।

আসবার আগেই আর একদিন নিখিলের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। ছুটির দিন, তবু নিখিলের অফিস ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাঙ্কি স্ট্যান্ডে দেখলো, সঙ্গে একজন মহিলাকে নিয়ে অলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিল আগে

দেখেও কথা বলেনি—হয়তো ছেলেটি আর একটি প্রেমিকা জুটিয়েছে—এ সময় কথা বলতে গেলে বিরত হবে। মহিলাটি বিবাহিত—বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার ন্যাক আছে ওর।

অলোক ব্যানার্জী নিজে কথা বললো। ডেকে বললো, এই যে নিখিলবাবু, কি খবর?

আলাপ হলো। মহিলাটি অলোকের স্ত্রী। মনে হয় সাত আট বছরের পুরনো বিয়ে—এর আগে যে অলোক নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে এখন আর তার মুখে কোনো লজ্জার চিহ্ন নেই। কোথাও বসে চা খাবার প্রস্তাব দিল অলোকই—কিন্তু নিখিলের তাড়া আছে। তখন ঠিক হলো, ট্যাঙ্কি পাওয়া তো একটা সমস্যা—সৃতরাং একটা ট্যাঙ্কি পেলে তাতে ওরা একসঙ্গে যাবে। নিখিলের বাড়িই দূরে, নিখিল ওদের নামিয়ে দেবে।

অলোকের স্ত্রীর নাম মমতা, ভারী সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে। নিখিলকে বললো, আপনাদের কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার স্ত্রী তো খুব সুন্দরী। একদিন নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ী।

নিখিল বললে, তার আগে আপনারা একদিন আসুন।

ট্যাঙ্কি পাওয়া গেল অতি কষ্টে। নিখিল সামনে বসতে যাচ্ছিল, অলোক বললো, না, না, আপনি ভেতরে আসুন। অনেক জায়গা আছে।

মমতা মাঝখানে বসলো, দু'পাশে দু'জন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অলোক খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে ইঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। অথচ দাজিলিং-এ দেখছে, তার সুন্দর কথার ফোয়ারা ছেটে, এমন কি এ কথাও বোঝা যাচ্ছে, অলোক তার স্ত্রীকে একটু একটু ভয় পৃষ্ঠ।

নিখিল হঠাৎ দূম করে মমতাকে বলে ফেললো, আপনি ভারি সুন্দর সেন্ট মেখেছেন তো। চমৎকার গন্ধটা।

মমতা একটু লজ্জা পেল। নিখিল তাকালো অলোকের দিকে। অলোকের মুখখানা উদাসীন ধরনের। ভূমিকা বদলে গেছে—অলোক এখন আর প্রেমিক নয়, সে স্বামী। যে-কোন স্বামীর মতনই গো বেচারা ভঙ্গিতে সে অন্য লোকের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাপারটায় নিখিল এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মমতাকে বললো, শুনুন সামনের সোমবার আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন সক্ষ্যাবেলো আমাদের বাড়িতে আপনারা থাবেন। আসতেই হবে কিন্তু, বুঝলেন!

বাকিটা রাস্তা নিখিল আর মমতাই শুধু কথা বলে গেল। অলোকের আর কোন উৎসাহ নেই, সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে।



প্রেমিক * দিব্যেন্দু পালিত

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ভেবেছ তোমরা ! তোমাদের জ্বালায় কি আমার মানসম্মান থাকবে না !'

ভোর হয়ে গেলেও তখনো আলো ফোটেনি ভাল করে। বর্ষার আকাশ অন্ড হয়ে আছে মেঝে। শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

একটা সময় ছিল তখন বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতাম আমি। এতদিনের পরিচয়ে গ্যারাজের ওপর আমার ছেট কিন্তু ছিমছাম ফ্ল্যাটটির হাদিশ পাওয়া বিনয়বাবুর পক্ষে অসন্তুষ্ট নয়। আমার মনে পড়ল একবার কী কারণে যেন তাঁর গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন আমাকে। এই বাড়িটার রং চিরকেলে লাল, মনে রাখা কী আর এমন কঠিন !

কিন্তু এখন আমি অবাঞ্ছিত। তাই এই সজল ভোরবেলায় আমি হেন অবাঞ্ছিতজনের ঘরে বিনয়বাবুর আবির্ভাবে স্পষ্টই বিচলিত হলাম। চায়ের কাপে চুম্বক দিয়ে তখন সবেমাত্র খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি, বিছানাটা আগোছালো, আমার বেশবাসও কোনো আগস্তকের চোখের পক্ষে দূরস্ত নয়।

চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই সকালে আপনি ! বসুন, বসুন !'

'বসব না। বসবার জন্যে আসিনি !'

আমার আপ্যায়নে একটুও ভাবাস্তর ঘটল না বিনয়বাবুর। যেমন-কে-তেমন, অস্থির দেখাচ্ছিল তাঁকে। ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে বললেন, 'অপর্ণা কোথায় ! রাতে বাড়ি না ফিরে কোথায় গেছে আমাকে বলো। না হলে পুলিশে খবর দেব !'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোক কী বলছেন, কেন বলছেন, কিছুই বোধগম্য হল না। অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি, সেটা অবশ্যই চিন্তার কথা, কিন্তু তার খোঁজে এখানে আসার কী মানে হয়। কৈফিয়ত তলব করার মতো করে বললাম মনে মনে। কাল রাতের ট্রেনে জামশেদপুর থেকে ফিরেছি কলকাতায়। বিনয়বাবুর কথাবার্তা আমার কাছে ধীরার মতো মনে হল।

'অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি !' কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'তাহলে গেল কোথায়— !'

‘সেটা জানতেই ছুটে এসেছি। তোমার মুখ দেখতে আসিনি।’

রাগে উত্তেজনায় বিনয়বাবুর ভরাট মুখে একটা লাল আভা ফুটল। ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, ‘তোমরা কি ভেবেছ আমার মানসম্মান নেই! আমি জানি, ওই স্কাউন্ডেলটা ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমিও ছাড়ব না।’

হঠাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, ‘এ কেমন মেয়ে যে নিজের ভাল বোবে না! শী মাস্ট কাম ব্যাক। আদারওয়াইজ—’

অবাক হলেও আমি ততক্ষণে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পারছি। কোনোরকমে তাঁকে নিরস্ত করে বললাম, ‘আপনি এখন বাড়ি যান। আমি দেখছি। ও নির্মলের ওখানে যাবে—রাত্রে বাড়ি ফিরবে না, এটা হতে পারে নাকি! কোনো আঘাতীয় স্বজনের বাড়ি টাড়ি—’

আঘাতীয় বলতে তো ওর মামাবাড়ি। তারা এখন পুরীতে—’

‘আমি দেখছি। খোঁজ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।’

‘একটা পেটি স্কুলমাস্টারের সঙ্গে, উফ!’ দ্রুত নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে বিনয়বাবুর বললেন, ‘আমার মেয়ে এমন করবে! ছি ছি! ভাবতেই পারছিনা।’

বিনয়বাবুর উৎকষ্টিত কষ্টস্বর আমাকে স্কুল করল। কী করা যায়, কী করে অপর্ণাকে ফিরিয়ে আনা যায়, কিছুই চুক্তিল না মাথায়। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তিনি মিথ্যে বলবার লোক নন। তাছাড়া, কোন সমস্যায় পড়ে তাঁর মতো বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক এই সকালে আমার কাছে ছুটে আসতে পারেন—স্পষ্টই তা উপলব্ধি করলাম আমি। অপর্ণা কিছুদিন থেকেই মরিয়া হয়ে উঠছিল, কিন্তু বিনয়বাবুর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাড়াবাড়ি করেছে। চৰিষ-পাঁচিশ বছরের একটি যুবতীর পক্ষে রাত্রে বাড়ি না ফেরা শুধু তার বাবা-মার পক্ষেই অসম্মানের নয়। জানাজানি হলে অপর্ণার পক্ষেও খারাপ। ও কি সত্যিই এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

পুরনো রাগটা চাগিয়ে উঠল মাথায়। ভাবলাম, এ নিয়ে নির্মলের সঙ্গে একটা বোৰাপড়া হওয়া দরকার। আমি নির্মলের চেয়ে ওয়েল-অফ। নির্মলকে সন্দেহ করা সঙ্গেও বিনয়বাবু যে আমার কাছে ছুটে এসেছেন, তারও কি কোনো পরোক্ষ অর্থ থাকতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতেই তৈরি করে নিলাম নিজেকে। নির্মল-অপর্ণা-অপর্ণা-নির্মল—নির্মলের ঠিকানার দিকে যেতে যেতে অন্যমনস্কতার ভিতর আমি ওদের কথাই ভাবতে লাগলাম। আজ অনেকদিন পরে আমার বুকের মধ্যে থেবড়ে থাকা ক্ষতটা চিনচিন করছে।

কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। আমি, নির্মল, অপর্ণা। অপর্ণার মতো সুন্দরী চট করে দেখা যায় না। ও এমন এক ধরনের মেয়ে, যুবক দর্যসের শারীরিক প্রচণ্ডতায় খুব সহজেই যে আগুন ঝালাতে পারে। যার কষ্টস্বর

শুনলে, যাকে দেখলে ভালবাসা প্রথর হয়, কাছে পেতে ইচ্ছে করে—কখনো মনে হয় দুই প্রবল বাহুর নিষ্পেষণে পিয়ে ফেলি। আবার কখনো—খুব মন খারাপের মুহূর্তে—যাকে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছে করে, নৈঃশব্দের মধ্যে।

অপর্ণাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে রেষারেমির অস্ত ছিল না। অপর্ণার মন পাবার জন্য কী অসম্ভব চেষ্টাই না করেছিলাম আমি! গোড়ার দিকে ওর সম্পর্কটা ছিল আমারও সঙ্গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছেয় ছাই চাপা দিয়ে অপর্ণা নির্মলকেই তার দেহনের একমাত্র দাবিদার ভেবে চলে গেল!

কী পেয়েছিল অপর্ণা নির্মলের মধ্যে! সত্যি বলতে, আমার সঙ্গে নির্মলের কোনো তুলনাই হয় না। হতে পারে না। চেহারায় নিতান্তই সাধারণ, ছাত্র হিসেবেও তেমন ভাল ছিল না নির্মল। এখন বড়িশার দিকে একটা প্রায় গ্রাম্য স্কুলের মাস্টার। থাকে অবশ্য আমারই মতো, একা, একটা অঙ্গকার ঘর ভাড়া করে। অন্যদিকে অপর্ণা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, গানটান জানে, কলকাতায় বিশাল বাড়ি, গাড়ি, বিখ্যাত অ্যাডভোকেট বাবা—ইত্যাদি। এসব যতই ভাবি ততই আমার মাথার ভিতর সব হিসেব গঙ্গোল হয়ে যায়। অপর্ণার কথা ভাবতে ভাবতে আরও ভারী হয়ে এল আমার নিঃশ্বাস। স্পষ্ট অনুভব করলাম, নির্মলের সঙ্গে ও যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, এখনো আমি ভালবাসি অপর্ণাকে, যে কোনো মূল্যেই পেতে চাই ওকে। এখনো ঘুমের মধ্যে সে আমার চুলে বিলি কেটে যায়, তার দীর্ঘ চুম্বনের কঞ্চনায় অনেক রাতে আমি বিছানায় জেগে উঠে বসি।

ততক্ষণে হালকা রোদ উঠে পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছিল নির্মল। আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

‘আ-রে, তুমি! এসো, এসো—’

নির্মলের ঠোটে আলগা হাসি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোনো নৈশ বিনোদনের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘নির্মল, অপর্ণা কোথায়?’

‘অপর্ণা!’ নির্মলকে চিহ্নিত দেখাল, ‘তুমি কি অপর্ণাকে খুঁজতে এসেছ এখানে?’

‘হ্যাঁ।’ কোনো দ্বিধা না করে ক্ষুক গলায় বললাম, ‘তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ, নির্মল! বিনয়বাবু আজ সকালে এসেছিলেন আমার কাছে। অপর্ণা রাতে বাড়ি ফেরেনি।’

‘কিন্তু—’ সময় নিয়ে নির্মল বলল, ‘অপর্ণার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কাল সক্ষেত্রেলায়। এখান থেকে ওর মামা বাড়ি যাবার কথা—’

‘মামা বাড়ি! ওর মামা রাবা এখন পুরীতে—’

‘না, সেটা সত্যি নয়। অপর্ণা মিথ্যে বলবে কেন।’

নির্মলের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ও রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বললাম, ‘তুমিই যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কী?’

নির্মল একটু চুপ করে থাকল, কী ভাবল যেন। তারপর বলল, ‘তুমি এটা কেন ভাবছ ও এখানে রাত কাটাবে? আমিই বা তা চাইব কেন?’

নির্মলের শেষের কথাগুলো আমার কাছে তেমন জরুরি মনে হল না। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই পেয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ‘আমি কিছু ভাবছি না। তদ্দলোকে ছুটে আসতে দেখে খারাপ লাগল, তাই এসেছিলাম। অপর্ণা তাহলে ওর মামাবাড়িতেই গেছে। যাক, চলি।’

‘একটু দাঁড়াও।’ নির্মল বলল, ‘আমিও বেরুব। কথা আছে।’

খাতাগুলো গুছিয়ে রেখে নির্মল বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি ওর ঘর, ঘরের দীন আসবাব, বিবর্ণ দেওয়াল লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখতে দেখতেই শিথিল হয়ে এল আমার হাত পা। যদি এমন হয়, আমি ভাবলাম, ওদের বিয়ে হল, অপর্ণা এসে উঠল এই ঘরে—ও কি থাকতে পারবে! মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল বিনয়বাবুর নিউ আলিপুরের বাড়ি—সেখানে অপর্ণার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা বাথরুম। দৈর্ঘ্যে প্রস্ত্রে ওই বাথরুমের আয়তনই তো নির্মলের ঘরের চেয়ে কম নয়। অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যায় অপর্ণার ঘর থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর শব্দে বেজে উঠেছিল আমার রক্ত। সেই অপর্ণাকে এখানে কল্পনা করা যায় না।

নির্মল বলল, ‘চলো। বাইরে বেরিয়ে একটু চা খাই। টানা দুঃঘন্টা খাতা দেখছি, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।’

নির্মলই আগে বেরুল। পিছন থেকে আমি ওর ক্লান্ত শরীর লক্ষ্য করলাম। দুঃখী মানুষদের একরকম চেহারা হয়—ভিতর ঝাঁপা গাছের মতো, যে কোনো মুহূর্তেই হেলে পড়তে পারে। কিন্তু সম্ভবত এটা আমার কল্পনা, আমি জানি এই মুহূর্তে নির্মলের চেয়ে সুখী আর কেউই নেই। বস্তু হলেও ও আমাকে বাধ্যত করেছে, কোনোই পাত্তা দেয়নি অপর্ণার প্রতি আমার আকর্ষণকে। ওর জন্যে আমি দৃঢ়িত হব কেন!

কাছেই একটা রেঙ্গোরাঁয় চুকে মুখোমুখি বসলাম আমরা। নির্মল চা বলল। ক্লান্তির মধ্যেও ওর চোখে একটা সরল হাসি ফুটেছে। আমি দীর্ঘ বোধ করলাম। ওই হাসির উৎস আমি জানি। নির্মল হয়তো আমার আর অপর্ণার আগের সম্পর্ক স্মরণ করে এখনো করুণা করছে আমাকে। ওর চোখে চোখ রাখতেও অস্বস্তি হচ্ছিল আমার।

বয় চা দিয়ে যাবার পর নির্মল হঠাতে জিজ্ঞেস করল, ‘কিছু খাবে?’

আমি না বললাম।

‘খেতে পারো।’ নির্মল বলল, ‘এখন মাসের শুরু, খুব একটা গরিব অবস্থায় নেই।’

অসহ্য! নির্মল যেন তার দৈন্যকেই সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। ওর সামনে নিজেকে কেমন খেলো মনে হল আমার।

‘থাক !’ আমি বললাম, ‘আমার ফেরার তাড়া আছে—’

কথা এগোচ্ছিল না। খানিক চৃপচাপ বসে থাকার পর নির্মল বলল, ‘অপর্ণা বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি কী করতে বলো ?’

‘বেশ তো !’ আঘাতরঙ্গার চেষ্টায় উল্টো গলায় বললাম, ‘এভাবে ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি ! অনেকদিন তো হল। যত দেরি করবে ততই ঘোরালো হবে।’

‘বাড়িতেও ও খুব শান্তিতে নেই !’ নির্মল বলল, ‘ওর বাবাকে তো তুমি জানো ! আমাকে উনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না। অপু কাল আমাকে বলছিল, বাড়িতে থাকা আর ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।’

নির্মলের কথাগুলো আমার বিশেষ অচেনা লাগল না। খেলাটা কি তাহলে শেষ হয়ে গেল, বিচলিত হয়ে আমি ভাবলাম, যা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে কি তাই ঘট্টতে যাচ্ছে !

কিছু বলতে হবে বলেই বললাম, ‘তুমি কী ভাবছ ?’

‘ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, আমি কোনোদিন ভাবিনি, এখনও ভাবছি না। কিন্তু !’ নির্মল ঝুকে এল। একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘ভাবছি, এই বিয়েটা না হলেই ভাল হত। আমার সদেহ হয়, শেষ পর্যন্ত অপু হয়তো আমার জীবন সহ্য করতে পারবে না।’

অবাস্তুর ভেবে জবাব দিলাম না আমি।

নির্মল বলল, ‘কাল অনেক বুঝিয়েছি ওকে। শুনতে চায় না। দেখি, আবার বোঝাব। চলো—’

ফেরার রাস্তায় অনুভব করলাম বুকের ভিতর ঘন ও ভারী হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। ভাবলাম, অপর্ণা যে নির্মলের সঙ্গে রাত কাটায়নি, তার মামা-বাড়িতেই গেছে—ওর বাবার কাছে সে খবর পৌছে দেবার দায়িত্ব আমাকেই বা নিতে হবে কেন !

বস্তুত, এক ধরনের ক্ষোভ পাগল করে তুলেছিল আমাকে। এমন কিছু কি এর মধ্যে ঘট্টতে পারে না, ভাবলাম, যে-ঘটনা অপর্ণা ও নির্মলকে বরাবরের মতো আলাদা করে দেবে ! রোজই তো কলকাতার রাস্তায় কত দুর্ঘটনা ঘটে, কত লোক মারা যায়। তেমনিভাবে, খুব সহজে, আর একজনও তো চলে যেতে পারে ! কে যাবে ! নির্মল ? না অপর্ণা ?

না, না, অপর্ণা নয়, অপর্ণা নয়।

কিন্তু আমার কোনো ইচ্ছাই কার্যকর হল না। কিছুদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল ওরা।

সাক্ষী হিসেবে নির্মল তার এক দূর সম্পর্কের দাদাকে ডেকে এনেছিল। অপর্ণা এনেছিল ওর বন্ধু শ্যামলীকে। আর আমি—অপর্ণা এবং নির্মল দু'জনেই আমাকেও খবর দিয়েছিল।

আমার সমস্ত ঈর্ষা, দুঃখ ও যন্ত্রণা উসকে দিয়ে সেদিন আরো চমৎকার হয়ে উঠল অপর্ণা। শুধু নিজের জন্যে নয়, আমার কষ্ট হচ্ছিল অপর্ণার জন্যও। নির্মল তো ওর

যোগ্য নয়, আমিও কি যোগ্য ছিলাম!

এসব দার্শনিক চিন্তার জেরও বেশিক্ষণ থাকল না মনে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রেঙ্গেরাঁয় কিছু খাওয়া-দাওয়া হল, খানিক রঙ-রসিকতাও। চোরা চোখে সারাক্ষণ আমি লক্ষ্য করছিলাম অপর্ণাকে—এখন ওকে দেখাচ্ছে রানির মতো, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পুরুষের অধিকারে চলে যাওয়া নারীর লাবণ্য। আমার বুকের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন ধীরে ধীরে গুড়িয়ে যেতে থাকল। এমনই কি হবার কথা ছিল, ভাবলাম, একদিন খুব কাছাকাছি এসেও যে অপর্ণা প্রত্যাখান করেছে আমাকে আমার তো প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল তার ওপর। বদলে আমি সাক্ষী থাকলাম ওর বিয়ের! সম্পর্কটা তাহলে শেষই হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সব সজ্ঞাবনাও। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীরে ঘনিয়ে এল প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে।

রেঙ্গেরাঁ থেকে বেরিয়ে নির্মলের দাদা আর শ্যামলী চলে গেল। আমিও যাচ্ছিলাম। অপর্ণা যেতে দিল না।

এরই মধ্যে গড়িয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল ওরা। এখন সেখানেই যাবে। নির্মল আমাকেও ট্যাঙ্কিতে উঠতে বাধ্য করল।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে সারাক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। কঠোর হয়ে উঠল চোয়াল। পিছনে বসে আছে আমার দুই আততায়ী, আমাকে খুন করার পর আজ রাতে ওরা শরীরে শরীর ঘষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে।

‘কী, চুপ করে আছ কেন! অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসে অপর্ণা বলল, ‘তোমাকে হঠাৎ ভীষণ গভীর লাগছে! ’

‘না, কিছু নয়—’ বুকলাম না অপর্ণা আমাকে ঠাট্টাই করল কিনা।

‘আমি জানি তুমি এখন কী ভাবছ! ’

অপর্ণার কথা শুনে এই প্রথম পিছনে তাকিয়ে আমি দেখলাম, অপর্ণার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে নির্মলের একটা হাত ঘিরে রেখেছে ওকে। অসম্ভব। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

অপর্ণা কী বলবে এরপর? এমন কিছু কি, যা আমাকে আরো ছোট করে দেবে! না, তা আমি হতে দেব না।

আমি বা অপর্ণা কিছু বলবার আগেই নির্মল বলল, ‘অপ্প, তোমার বন্ধুকে একদিন আমাদের সঙ্গে থেতে ডাকো না?’

অপর্ণা বলল, ‘হ্যাঁ, এসো না একদিন! পরশু রবিবার। আসবে?’

অসহ্য! সমস্ত ব্যাপারটাকে অসহ্য মনে হচ্ছিল আমার কাছে। অনুভূতি বলে দিল, আর এক মুুর্তও এদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

ট্যাঙ্কি ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়ে অন্ধকারেই অপর্ণার মুখের দিকে তাকালাম আমি।

দু'জনেই আবাক হল। অপর্ণা বলল, ‘কী হল? নেমে যাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।’ ট্যাঙ্গি থেকে নামার আগে বললাম, ‘তোমরা একটু গুছিয়ে নাও, তারপর একদিন যাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার অসুখটার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব চেপে রাখতে নেই। এখন তোমার বাবা তো আর দেখছেন না—নির্মলকে খুলে বোলো সব—’

‘অসুখ! অস্ফুটে উচ্চারণ করল নির্মল।

‘কী বলছ এসব! চমকে উঠে অপর্ণা বলল, ‘আমার তো কোনো অসুখ নেই।’

‘লুকিয়ে রেখে লাভ নেই, অপর্ণা। তুমি জানো, কেন তোমার বাবা বিয়েতে রাজি হচ্ছিলেন না। নির্মলের প্রতি তোমার একটা দায়িত্ব আছে।’ ট্যাঙ্গির দরজাটা বন্ধ করার আগে আমি বললাম, ‘ভয় কি! এখন নির্মলই তোমার সব। একদিন যা আমাকে বলতে পেরেছিলে, তা নির্মলকে বলতে পারবে না কেন?’

দেখলাম, ট্যাঙ্গির অঙ্ককারে স্তুপিত মুখে পরম্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। পরের মুহূর্তে ট্যাঙ্গিটা আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল।

অনেকদিন পরে হাসিতে খলবল করে উঠল আমার বুক। চমৎকার, চমৎকার হয়েছে। আমি জানি, অপর্ণার অসুখ কোনো দিনও সারবে না। আর যত দিন যাবে, আমার কথার বিষে অসুখটা নির্মলের মধ্যেও সংক্রামিত হবে ত্রুমশ। ও সন্দেহ করবে অপর্ণাকে। তেমন-তেমন হলে অপর্ণাও কি ঘৃণা করতে শুরু করবে না ওকে?

প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে আমার পা দুটো এরপর সাবলীল হয়ে উঠল।



দিচারিতা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বাড়ি ফেরার পথে মনস্তির করে ফেলল রঞ্জন। অনেক হয়েছে, আর নয়, আজই কথাটা বলে ফেলতে হবে সীমাকে। বলতেই হবে। কতদিন আর এভাবে দু-নোকোয় পা দিয়ে চলা যায়! এবার একটা এস্পার ওস্পার দরকার।

চুট্টি মিনিবাস এখন ভিড়ে ভিড়। একটু আগেও রঞ্জন স্ট্যান্ড থেকে উঠেছিল। বেশ ফাঁকা ছিল বাস, বসার জায়গাও ছিল এক আধটা, পার্কস্ট্রিট পেরোতে না পেরোতে মানুষ উপচে পড়েছে, কটু ঘামের গন্ধ বিজবিজ করছে চতুর্দিকে। ক'দিন ধরে গরমও পড়েছে খুব, জানলার ধারে বসেও ঠিক যেন আরাম হচ্ছিল না রঞ্জনের। কসরৎ করে পকেট থেকে রুমাল টেনে এনে মুখ মুছল রঞ্জন। এখনও রুমালে গহ্নিটা লেগে আছে। মল্লিকার সুবাস। হয়তো বা চোখের জলও। রঞ্জন কাছে থাকলে মল্লিকা কক্ষনো নিজের রুমাল ব্যবহার করে না, রঞ্জনেরটাই তার চাই।

চোখ বুজে মল্লিকাকে চোখে আনল রঞ্জন। মেয়েটা এখনও বড় ছেলেমানুষ। বাচ্চা মেয়ের মতো কারণে আকারণে হাসি, কথায় কথায় অভিমান, দ্যাখ না দ্যাখ চোখ টলটল। খুশীও হয় কত সহজে। কে বলবে মেয়েটার ভেতরে অত চাপা কষ্ট আছে? কোন এক মোদো মাতালের সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল, এক বছরের মধ্যে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে, ডিভোস নিয়েছে, মনের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাকরি করছে...

নাকি কষ্টটা আছেই? রঞ্জনকে পেয়ে সব কিছু ভুলে থাকে মল্লিকা? নিশ্চয়ই তাই। রঞ্জনই তো তাকে আবার ভালোবাসতে শেখাল, স্বপ্ন দেখাল নতুন করে, জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল। রঞ্জন এখন মল্লিকার সব থেকে বড় আশ্রয়।

তবু আজ মল্লিকা দূর করে বলল, —এভাবে আর কতদিন কাটাব আমরা? এরকম ভেসে ভেসে?

রঞ্জন কাছে টেনেছিল মল্লিকাকে, —কেন? হঠাৎ আজ এ কথা মনে হল কেন?

—অফিসে সব জানাজানি হয়ে গেছে। মণ্ডুদি আজ জিজ্ঞেস করছিল, তোদের সম্পর্কের পরিণতি কী?

—তুমি কী বললে?

—কী বলব। আমি তো নিজেই জানি না। মল্লিকা আঙুলে রঞ্জনের রুমালটাকে পাকাছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, —ডিভোর্স মেয়ে আমি, আমায় নিয়ে কত লোক কত কিছু বলে ... মণ্ডুদি বলছিল, রঞ্জন রায় বউ ছেড়ে তোকে বিয়ে করবে না, দেখে নিস। তোকে খেলাচ্ছে।

রঞ্জন শুন হয়ে গিয়েছিল, —তোমারও কি তাই বিশ্বাস? তোমারও কি মনে হয় আমি তোমায় খেলাচ্ছি?

—আমি কি তাই বলেছি! অফিসে সবাই যা বলাবলি করে...

—বলুক যে যা খুশী! ঠিক সময়ে সবাইকে দেখিয়ে দেব আমরা। রঞ্জন একটু দম নিয়ে বলেছিল,

—তুমি তো জানো আমি তোমায় কী ভীষণ ভালোবাসি। তোমায় ছাড়া আমি...। আমাকে আর কটা দিন সময় দাও প্লিজ...

টালিগঞ্জ এসে গেছে, হাঁকাহাঁকি করছে কন্দাকটার। পকেটে রুমাল গুঁজে রঞ্জন উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে এগোল গেটের দিকে। সামনেই মায়ের হাত ধরে একটা বাচ্চা ছেলে, গুঁতোগুঁতিতে ছটফট করছে বেচারা। একদম বাবুনের বয়সী। রঞ্জন টপকে যেতে গিয়েও কী ভেবে ছেলেটার হাত ধরে ফেলল, সাবধানে নামিয়ে দিল বাস থেকে। ছেলেটার মা ধন্যবাদ গোছের কিছু বলল যেন, রঞ্জনের কানে গেল না। অন্যমনস্ক মুখে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বাবুনের জন্য আজ কী একটা যেন নিয়ে যেতে বলেছিল না সীমা? রঙ পেনসিল? স্টিকার? চার্টপেপার? মনে পড়ছে না। থাক, সীমা নিজেই কিনে নেবে। সীমা যদি বাবুনকে না-ছাড়ে, যদি জোর করে নিয়ে চলে যায়, তখন তো ছেলের জিনিস তাকেই কিনতে হবে। এখন থেকেই বরং অভ্যেসটা তৈরি হোক।

ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল রঞ্জনের। সাড়ে চার বছরের বাবুন্টা তার বড় আদরের। সীমাকে নয় ছেড়ে দিতে পারবে, কিন্তু বাবুন? ওদিকে আবার ছেড়ে না-দিলে সীমাই বা থাকে কী করে? সমস্যা। সমস্যা। একটা ব্যবহা অবশ্য করা যায়। বাবুন নয় মার কাছে কিছুদিন রইল, কিছুদিন বাবার... কিন্তু সীমা তাতে রাজি হবে কি?

যাক গে যাক, তখনকার ভাবনা তখন ভাবা যাবে। রঞ্জন মষ্টর পায়ে হাঁটা শুরু করল। হঠাৎ কোথাকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করছে শরীরে। অফিস ছুটির পর প্রতিদিনই প্রায় মল্লিকার সঙ্গে গিয়ে বসে থাকে গঙ্গার ধারে, নদীর নিম্ফ বাতাস আর মল্লিকার টাটকা নিঃশ্বাস সঞ্জীবনী হয়ে সপ্রাণ করে দেয় তাকে। তবু কেন এত শ্রান্তি? তবে কি মল্লিকার কথা সীমাকে বলতে হবে বলে মনে

মনে টেনশান হচ্ছে রঞ্জনের ?

বাড়ির দরজায় এসে বেল টিপল রঞ্জন। অন্য দিনের মতো জোরে জোরে নয়, আস্তে। যেন কোনও অপরিচিতের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সীমা দরজা খুলেছে, —এসেছ? দাখো দিদি তোমার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

দিদি মানে রঞ্জনেরই দিদি। কাছেই থাকে, রানিকুঠিতে। রঞ্জনের বিয়ের পর ভাইকে কাছাকাছি রাখবে বলে নিজে বাড়ি দেখে দিয়েছিল। আগে প্রায়ই আসত, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর চাপ বাড়ায় ইদানীং উপস্থিতি একটু করেছে।

রঞ্জন ঘরে ঢুকতেই দিদি বলল, —হ্যাঁ রে, তুই নাকি রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরিস? কী করিস এতক্ষণ?

রঞ্জন গভীর মুখে বলল, —কাজ থাকে। ওভারটাইম।

—তা বল। তা এই যে রোজ রোজ ওভারটাইম করছিস, টাকাগুলো জমাচ্ছিস তো?

—যেটুকু পারি জমাই।

—হ্যাঁ, জমা। কদিন আর ভাড়াবাড়িতে থাকবি? এবার একটা নিজের ফ্ল্যাট-ট্যাটের চেষ্টা কর।

‘সীমা রান্নাঘরে গেছে, চায়ের জল বসাচ্ছে বোধহয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, —এই কথটাই তোমার ভায়ের কানে ভালো করে চুকিয়ে দাও তো! এইটুকু-এইটুকু দু’খানা ঘরে থাকি... জল নিয়ে নিত্যদিন অশান্তি...’

রঞ্জন মনে মনে বলল, অশান্তি তোমার যাবে না সীমা। ফ্ল্যাট হয়তো কোনও দিন আমার হবে, তবে সে ফ্ল্যাট তোমার হবে না।

মুখে বলল, —আমার মাথায় ফ্ল্যাট আছে রে দিদি। চেষ্টাও করছি।

—খুঁটুব ভালো। করতে হলে এই বয়সে করে ফ্যাল। আমাদের তো কিছু হয়ে উঠল না, তোর হলে আমার খুব আনন্দ হবে।

দিদির স্বরে হাল্কা বিষাদ। দুঃখবিলাস! নিজের অত বড় শ্বশুরবাড়ি, তবু আপনি কোপনি হয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি বলে হাহাকার।

অনর্থক কথা বাড়াল না রঞ্জন। ঘরের কোণে ছোট ছোট পিচবোর্ডের টুকরো জোড়া লাগিয়ে ছবি বানাচ্ছে বুবুন। পশু পাখি মাছ ফুল পাতা। ছেলেটা বড় শাস্তি, নিজের জগতেই তন্ময় হয়ে থাকে সারাক্ষণ। রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে ছেলের কোঁকড়া চুলে হাত বোলাল। তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে সোজা বাথরুম।

বাথরুমটা বেশ ছোট। মলিন। স্যাঁতস্যাঁতে। এ-বাড়িতে ঢোকার সময়ে বাড়িওয়ালা শাওয়ার লাগিয়ে দেবে বলেছিল, আজও দেয়নি। চৌবাচ্চা ব্যাপারটাকে বড় স্তুল গেঁয়ো মনে হয় রঞ্জনের, তবু কী আর করা! সীমার মতো রসকবহীন নারীকে সে যখন এতদিন সহ্য করেছে, চৌবাচ্চাও নয় চলুক আর

কিছুদিন। সীমার মতো শুটকো হওয়ার মেয়ে নয় মল্লিকা, দু'জনের চাকরি করা সংসারে স্বচ্ছদে একটা আধুনিক ফ্ল্যাট বানানো যাবে। মগে করে হড়াস হড়াস জল গায়ে ঢালল রঞ্জন। মল্লিকার রঞ্জি আছে, তারি শৌখিন ভাবে সাজাবে সংসারটা।... কিন্তু সীমাকে কথাটা বলা যায় কী করে? বাপ করে বলে দেবে? আকস্মিক আঘাতে বির্বণ হয়ে যাবে কি আটপৌরে সীমা? গায়ে সাবান ঘষল রঞ্জন, ডলে ডলে সারাদিনের ক্রেত তুলছে দেহ থেকে। রইয়ে সইয়েও বলা যায় সীমাকে, যাকে কিনা বলে আস্তে আস্তে ভাঙ্গে। একথা-সেকথার মাঝে অল্প ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে, তারপর পুট করে একসময়ে...।

তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে রঞ্জন আবার একটা শ্বাস ফেলল। বেচারা সীমা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা খেল রঞ্জন। দিদির সঙ্গে টুকটাক গল্প করল। দিদি চলে যাওয়ার পর আয়েশ করে সিগারেট ধরাল একটা। লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়ছে।

বাবুন চিভিতে মগ্ন এখন। কার্টুন চ্যানেল। চলমান ছবি দেখে ছেলে কখনও হেসে উঠছে নিজের মনে, কখনও বা চোখ বড় বড়।

রঞ্জন ছেলেকে ডাকল, —কী বে বাবুন, আমার সঙ্গে আজ একটাও কথা বললি না যে!

—বাবে, তুমি পিসির সঙ্গে কথা বলছিলে!

—এখনও তো বলছিস না?

—বাবে, চিভি দেখছি যে।

রঞ্জন বলতে চাইল, আমায় ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো বাবুন? স্বর ফুটল না। ছেলের এই নিমগ্ন ঘোর কাটিয়ে দেওয়া বড় বেশি নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে।

সীমা পাশে এসে বসেছে। ছেলেকে বলল, —তুমি কিন্তু আজ সঙ্গে থেকে একটুও পড়াশুনো করলে না বাবুন।

বাবুন-এর চোখ আবার চিভিতে, —বাবে, বিকেলে তুমিই তো ওয়ান টু থ্রি ফোর লেখালে।

—আর রাইম্স কে মুখস্থ করবে?

—আমি সব রাইম্স জানি।

—বল তো দেখি।

—উঁ উঁ উঁ... বাবুন শরীর মোচড়াচ্ছে।

রঞ্জন ইঙ্গিতময় সুরে বলে উঠল, —ছেলে নিয়ে তোমায় অত চিঞ্চা করতে হবে না সীমা। বাবুন খুব ইন্টেলিজেন্ট, দেখো ও একদিন ঠিক সাইন করবে।

—যত ইন্টেলিজেন্ট হোক, ঘৰামাজা না-করলে কিছু হয় না।

—সব হয়ে যাবে।

—তোমার তো খালি ওই এক কথা। বাবুনকে সামনের বছর বড় স্কুলে দিতে

হবে সে খেয়াল আছে?

—দিয়ো।

—কোন স্কুলে চেষ্টা করা যায় বলো তো?

—তুমি কোথায় দিতে চাও?

—আমার তো বাবা সেট পিটারসই বেশি পছন্দ।

শখ কী বাপস। ওই স্কুলে ভর্তি করতে কম করে বিশ হাজার টাকার ধাক্কা, তাও যদি চাঙ্গ পাওয়া যায়। সীমা অত টাকা পাবে কোথু থেকে? অবশ্য রঞ্জনও দিয়ে দিতে পারে। আইন মোতাবেক খোরপোষ তো কিছু দেওয়াই উচিত। তাছাড়া বাবুনকে বড় করার দায় রঞ্জনেরও আছে একথা সে অবীকার করেই বা কী করে?

এখনই কি কথাটা বলে ফেলবে সীমাকে? বলাই যায়! এটাই বোধহয় প্রকৃষ্ট সময়ও। রঞ্জন মনে মনে শুরুটা ভেঁজে নিল, —তোমাকে একটা কথা বলার ছিল সীমা।

—কী, সীমা ফিরে তাকিয়েছে।

—কথাটা একটু সিরিয়াস। তোমায় খুব ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে।

পলকের জন্য ভুরুতে ভাঁজ পড়ল সীমার, পলকে মিলিয়েও গেল। সহজ স্বরে বলল, —সত্যি সত্যি কোনও ফ্ল্যাট বুক করেছ নাকি?

—না।

—অফিসের কোনও প্রবলেম?

—না। রঞ্জন সামান্য অসহিষ্ণু হল, —অন্য কথা।

—তাহলে পরে বলো। আমি আগে বাবুনকে খাইয়ে দিই। সীমা উঠে রাস্তাঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকাল, —তুমি কুটি খাবে তো? না ভাত?

রঞ্জন হতাশ। *চোখ বুজে ফেলেছে, —রাটিই করো।

কাজের পর কাজ চলছে সীমার। বাবুনকে খাওয়ানো রীতিমত সময়সাপেক্ষ কাজ, অনেক সাধ্যসাধনা করে, ছেলেকে বকে-ধর্মকে সেই পাট চোকাল সীমা, ফের রাস্তাঘরে গিয়ে খান আস্টেক রুটি বানাল, ফ্রিজের হিমায়িত খাবার বের করে করে গরম করছে, দুধ জাল দিল, তারপর স্বামী-স্ত্রীর নৈশাহর সাজাচ্ছ ডাইনি টেবিলে। রঞ্জনের সিরিয়াস কথা শোনার তার এখন সময় কোথায়!

নাহু খেতে বসেও প্রসঙ্গটা তোলা গেল না। রোজ রোজ বাজার থেকে পটল আনছে বলে উস্তা দেখাতে শুরু করল সীমা, কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বাজারের হাল বাজারদর শোনাতে হল রঞ্জনকে। তার মধ্যে ঝুপ করে সীমা ইলেক্ট্রিক বিলে চলে গেল, সেখান থেকে রেশনে। এই সপ্তাহে রেশনে নাকি ডবল চিনি দিচ্ছে, রোববারের ভরসায় থাকলে সব চিনি হাপিস হয়ে যাবে, সুতরাং রঞ্জন যেন কালকেই...

রঞ্জন ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। কথাটা কি তবে আজ বলাই যাবে না?

বাবুন ঘুরিয়ে পড়েছে। খাওয়া সেরে ছেলের পাশে এসে আধশোওয়া হল রঞ্জন। চোখের সামনে মল্লিকা হাজির আবার। মল্লিকাকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে সে। বাসতেই পারে। বট বাচ্চা আছে বলে কি রঞ্জনের আর কাউকে ভালোবাসার অধিকার নেই? একজনকে ভালো লাগছে, আর একজনকে লাগছে না, যাকে ভালো লাগছে তার সঙ্গে থাকতে চাওয়া কি পাপ? অন্যায়? সমাজ চোখ রাঙাবে? সমাজকে কেয়ার করে না রঞ্জন। মল্লিকা মিশে গেছে তার অস্তিত্বে, মল্লিকা বিনা বেঁচে থাকা এখন রঞ্জনের পক্ষে অসম্ভব।

সীমা ঘরে এল। রঞ্জনের জন্য প্লাসে জল ঢাকা দিয়ে আয়নায় চুল বাঁধতে বসেছে। আড়চোখে রঞ্জন অনুজ্জ্বল চামড়া, টিকটিকির লেজের মতো চুল, গালে মেচেতার দাগ, বুক পিঠ প্রায় একই। কাঠি কাঠি। তুলনায় মল্লিকা তো রাজহংসী। শুধু বাবুনের মা বলে ওই সীমাকে সহ্য করে যাওয়ার আর কোনও মানেই হয় না।

মন থেকে সমস্ত ধ্বনি ঘেড়ে ফেলল রঞ্জন। ঘড়স্বত্তে গলায় ডাকল,—
সীমা শোনো। এদিকে এসো তো একটু।

— চিরনি হাতে খাটের ধারে এল সীমা,—কী হয়েছে?

— ওই যে তখন বলছিলাম! তোমার সঙ্গে সত্যিই খুব জরুরি কথা আছে।

—আমারও।

— তোমার আবার কী কথা?

— দিদি সঞ্চেবেলা কেন এসেছিল জানো? জামাইবাবুর কোম্পানীর হাল খুব খারাপ। যাকে তাকে নাকি ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে।

— সে কী? প্রশ্নটা করতে না-চেয়েও করে ফেলল রঞ্জন,— দিদি তো আমায় কিছু বলল না?

— তুমি তখন সবে খেটেখুটে এসেছ... বলবে। মাত্র দু-চার লাখ দেবে। ওতে ওদের কী ভাবে চলবে বলো তো?

— টাকা তো পাবে। জামাইবাবু কোনও ব্যবসা-ট্যবসা শুরু করতে পারে।

— হ্যাঁ... তুমি কী বলবে বলছিলে?

— বলছি। বিছানায় এসো।

কথাটায় কি কোনও আহান আছে বলে ধরে নিল সীমা? লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ চলে এসেছে। বাবুনকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে মাঝখানে শুয়ে পড়ল। শুয়েই উঠে বসেছে। সায়ার দড়ি আলগা করল। খুলে দিল ব্লাউজের হক। এই গরমে এভাবেই শিথিল হয়ে শোয় সীমা।

রঞ্জন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল,— তোমাকে যে কথাটা কী ভাবে বলি! আমি... আমি...

—কী তুমি? সীমা ঝুঁকল।

—ধরো... ধরো... আমি যদি কখনও অন্য কাউকে ভালোবাসি? মানে... মানে... এমন তো হতেই পারে। মন তো কোনও বাঁধা নিয়মে চলে না...! এক দমে বলে ফেলেই সীমার চোখে চোখ রেখেছে রঞ্জন,—তেমন হলে তুমি কী করবে?

সীমা ছির। অপলক চোখে দেখছে রঞ্জনকে।

রঞ্জন তোতলা হয়ে গেল,—ক্রক্রকী? কী দেখছ? আমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পারি না?

—পারো কী? সত্যি পারো?

—যদি পারি, তুমি তাহলে কী করবে? বলেই রঞ্জন একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলল। খপ করে চেপে ধরেছে সীমার হাত,—তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে?

সীমা ফিক করে হেসে ফেলেছে এবার,—মুরোদটা আগে দেখাও, তখন ঠিক করব। বলতে বলতে আরও ঝুঁকছে। হাত রেখেছে রঞ্জনের খোলা পিঠে,—এমা... এই... তোমার এখানে কী হয়েছে?

রঞ্জন আরও বোকা হয়ে গেল,—কী হয়েছে?

—ইশ, একেবারে চাপড় চাপড়া হয়ে গেছে। সীমা হাত বোলাচ্ছে পিঠের মাঝাখানটায়

—নির্ধারণ গরমের থেকে হয়েছে। ইশ, জুলা করে না তোমার? দাঁড়াও, একটু মলম লাগিয়ে দিই।

আঙ্গুল নড়ছে পিঠে? নাকি যাদুকাঠি? রঞ্জনের শরীর অসাড় হয়ে এল। মনটাও।

উফ, ভালোবাসি বলার থেকেও ভালোবাসি না বলা কেন যে এত কঠিন।



এক কম্বলের নীচে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাঝে মধ্যে মাঝ রাস্তিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাতে ঝগড়া শুরু হবে, এ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

বিয়ের প্রথম দু'বছর বাদ, সে তো একটানা পিকনিক। তারপর যদি একটি-দুটি সপ্তান জন্মায়, তখন স্ত্রী তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে কয়েক বছর। বাচ্চারা এই পথিকীতে জবরদস্থল করতে আসে, তাদের দাবিও থাকে অনেকরকম। ইঁরিজিতে দাম্পত্য জীবনের সেভেন ইয়ার ইচ বলে একটা কথা আছে, তা নিয়ে একটা চমৎকার ফিল্মও হয়েছিল রূপসী-মোহিনী, মেরিলিন মন্ডেলো-কে নিয়ে, বাংলায় বলা যায় এক দশকের গাঁট, সেটা পেরুলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা হয়ে যায় নদীর মতন, কখনো প্রবল বর্ষায় খরঞ্জেতা, কখনো শীতকালের শীর্ণ, নিরস্তাপ চেহারা।

কখনো ঝগড়া হয় না, সব সময় স্বামী আর স্ত্রীর হাসি-হাসি মুখ, পরম্পরের মন জোগানো কথা, সে জীবন খুবই কৃত্রিম। আর সন্দেহজনক।

ঝগড়া তো হবেই। তবে, ঝগড়া অনেকরকম। বেশির ভাগ ঝগড়াতেই আগুন থাকে না। আলেয়ার মতন হঠাতে হঠাতে দপ্ত করে জুলে ওঠে, আবার সকাল হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। আগুন-জুলা ঝগড়ায় অনেক সংসার পুড়ে যায়। এ গম্ভীর তাদের নিয়ে নয়।

অরূপ আর বিশাখার মাঝে মাঝে আলেয়া-ঝগড়া হয়। সব সময় নিজেদের বাড়িতেই। অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে তারা সামলে-সুমলে থাকে। বিশেষত কোথাও বন্ধু-বান্ধবের কাছে অতিথি হয়ে থাকলে বড় জোর একটু-আধটু কথা কাটাকাটি পর্যন্ত চলতে পারে, তা ছাড়া একেবারে আদর্শ দম্পত্তির ছবি।

তবু একবার একটু বেশি ঝগড়াই হয়ে গেল।

আগে তার একটু পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

অরূপের বন্ধু অগ্নিভ থাকে শিলচরে, ঠিক শহরে নয়, অদূরের চা-বাগানে। অনেকবার সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ঠিক সুযোগ হয়ে ওঠেনি, এবাবে অরূপের অফিসের কাজে মণিপুর যেতেই হল, সুতরাং অতিরিক্ত কয়েকটা দিন বন্ধুর সঙ্গে

কাটিয়ে আসা যেতেই পারে। বিশাখা কলেজে পড়ায়, তারও এখন ছুটি, ওদের ছেলে পড়ে নরেন্দ্রপুরে, সে হস্টেলে থাকবে।

অগ্নিভ চা-বাগানের ম্যানেজার, তার অতি চমৎকার বাংলা, দু-তিনখানা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবহার দারণ, অগ্নিভ'র স্ত্রী রীতার স্বভাবটাই হাসিখুশি, খুব ভালো গানও গায়। সুতরাং চারজনে মিলে বেড়ানো, আজড়া, খাদ্য-পানীয়ের স্ব-ব্যবহারেই ছুটির কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে ঝগড়ার্হাটির তো প্রশ্নই ওঠার কথা নয়। তবু এক রাত্রে, দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে দপ্ত করে জুলে উঠল আলেয়া। এ আলেয়াতে বেশ আঁচও আছে।

ঝগড়ার উপলক্ষ একটি কস্বল।

দ্বিতীয় দিনে অগ্নিভ কাছাকাছি চা-বাগানের কয়েকজন বন্ধুকে নেমস্তম্ভ করেছিল সঞ্জেবেলা। আরও তিনটি দম্পত্তি। সবাই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চচাকুরে এবং উচ্চবংশের মানুষ। কাবাব ও মাছভাজা সহযোগে প্রিমিয়াম ক্ষচ, চিতাবাঘ শিকারের গঞ্জ (আসলে লেপার্ড), গান ও হাসিঠাটায় কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা, তারপর ডিনার। এসব জায়গায় এরকমই হয়ে থাকে।

অগ্নিভ আর রীতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সওকত আর রোশেনারা। চেহারার দিক থেকে অস্তত এমন মানানসই স্বামী-স্ত্রী খুব কমই দেখা যায়। সওকত যেমন সুপুরুষ, রোশেনারা তেমনই রূপসী। যেন সিনেমার নারী-পুরুষ। বস্তুত চলচিত্রের নায়ক-নায়িকা না হয়ে ওরা দৃজন কেন চা-বাগানের নিষ্ঠরঙ্গ জীবন দিন কাটাচ্ছে, তা বোঝা শক্ত।

রোশেনারা বসেছিল অরাপের পাশে। কেউ পাশে বসলে তার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলা হয়েই যায়। আবার খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করছিল অরূপ, এখন তিলোক্তমার মতন এক নারী তার সঙ্গে বেশি গঞ্জ করছে, এতে অন্য পুরুষদের হিংসে হচ্ছে না তো? বিশাখা কি কিছু মনে করছে? অরূপ তো ইচ্ছে করে রোশেনারার পাশে বসেনি। একটি সুন্দরী মেয়ে পাশে বসলে উঠে যাওয়াটাও তো চরম অভদ্রতা!

সওকত ঘৰে ঘৰে গঞ্জ করছে সকলের সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গেও কী নিয়ে যেন আলোচনা করল খানিকক্ষণ। অরূপ এক জায়গাতেই বসে থাকে, সেটাই তার স্বভাব। রোশেনারা একবার উঠে গেল, কী যেন কাজের কথা বলল রীতার সঙ্গে, আবার ফিরে এল অরাপের পাশে। অনেক চেয়ার ও সোফা খালি রয়েছে, রোশেনারা তো অন্য কারুর পাশে বসলেও পারত, তবু সে কেন আগের জায়গাতেই ফিরে এল, তা অরূপ কী করে জানবে? মেয়েটির কিন্তু তার রূপের জন্য একটু গর্বের ভাব নেই, ন্যাকামিও নেই, যৌন ইস্তিও ছড়ায় না, সোজাসুজি ঢোকের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে কথা বলে।

রোশেনারা গানও জানে। একটি নজরলগ্নীতি গাইতে গাইতে সে কথা ভুলে

গিয়েছিল মাঝপথে। অরূপের অনেক গান মুখস্থ থাকে, বিশাখা যখন গান গায়, অনেক সময় অরূপ কথা জুগিয়ে দেয়, সেই অভ্যেসে সে রোশেনারার ‘কাবেরী নদীজলে কে গো’ গানটির দ্বিতীয় স্তবকের বাণী ধরিয়ে দিল, তখন অন্যরা বললেন, আপনিও গান না ওর সঙ্গে, রোশেনারাও মিনতি করল চোখের ইঙ্গিতে।

দু'জনে শেষ করল গানটা। ডুয়েট।

অরূপ রোশেনারার সঙ্গে সূর মিলিয়েছে, গলা মিলিয়েছে, কিন্তু সে একবারও রোশেনারার হাতও স্পর্শ করেনি।

কিছুটা মদ্যপানের পর অন্য মেয়েদের একটু গা ছুঁয়ে কথা বলার বেঁক থাকে পুরুষদের, অরূপ কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে। মাঝে মাঝে তার চোখাচোখি হচ্ছিল বিশাখার সঙ্গে, বিশাখা অবশ্য কোনোরকম রাগের ভাব দেখায়নি। অরূপের মনে হল, তার বড়ও এখনো বেশ সুন্দর আছে।

ডিনারের পর বিদায় নেবার পালাতেও কিছু সময় কেটে যায়। গাড়িতে ওঠার আগেও থেকে যায় গঞ্জের রেশ। সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরের চাতালে। এখানে উজ্জ্বল আলো থাকলেও একটু দূরেই মিশমিশে অঙ্ককার। বেশ শীত পড়েছে। দূরে ডাকছে একটা রাতপাখি।

অতিথিরা চলে যাবার পরেই বিশাখা বলল, আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।

অরূপ আর অগ্নিভ একটুখানি কনিয়াক নিয়ে আরও বসল খানিকক্ষণ। অরূপের চোখ ঘুমে চুলে এল আগে।

ওদের শুতে দেওয়া হয়েছে ডানদিকের একটি কোশের ঘরে। সে ঘরটি খুবই প্রশস্ত, সংলগ্ন বাথরুমটিই বৈঠকখানার মতন বড়। জানলা খুললেই দেখা যায় বাগান, দূরে পাহাড়ের পটভূমিকা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দিরের আলো জ্বলে।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা নীল আলো জ্বলছে। কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে বিশাখা, স্তব্যত ঘুমাঞ্চ। পা টিপে টিপে এসে, শব্দ না করে পোশাক বদলে ফেলল অরূপ, বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। কলকাতায় ঘুমের আগে কিছু না কিছু বই পড়া অভ্যেস, এখানে বিছানার পাশে আলো নেই, রাতও হয়েছে অনেক।

রাতপাখিটার ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল অরূপ।

কতক্ষণ পর কে জানে, কিসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অরূপের। কেউ কি কাঁদছে? কোনো নারীর আর্ত বিলাপ? না কি এটা স্বপ্ন?

চোখ মেলে দেখল, বিছানার অন্য পাশে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে বসে আছে বিশাখা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আপন মনে কী যেন বলছে!

ব্যস্ত হয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, মণি? পেট ব্যথা করছে?

বিশাখা কোনো উত্তর দিল না।

অরূপ গড়িয়ে কাছে এসে বিশাখার একটা হাত ধরে আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে
বলল, কী হয়েছে, কিছু কষ্ট হচ্ছে?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বিশাখা বলল, যাই হোক না, তাতে তোমার
কী আসে যায়? আমি মরে গেলেও তো তুমি খুশি হবে!

অরূপ একটা দীর্ঘস্থান গোপন করল। থত্যেকবার বাগড়ার সুত্রপাত ঠিক
এইভাবেই হয়। বিশাখা নিশ্চিত জানে, এই কথাগুলো অরূপের বুকে বিষের
তীরের মতন বিধবে। মানুষ যে-দোষ করে না, সেই দোষের অভিযোগ করলে
সবচেয়ে বেশি আহত হয়। বিশাখার মৃত্যু হলে কেন খুশি হবে অরূপ, সে কি
অতটাই খারাপ লোক? বিশাখার বিরক্তে তার তো তেমন কোনো অভিযোগ
নেই। বিশাখাকে এখনও সে ভালোবাসে, হয়তো নতুন প্রেমিকার মতন নয়, কিন্তু
ঞ্চি হিসাবে, তার সন্তানের জননী হিসাবে, তার জীবনসঙ্গনী হিসাবে।

অরূপ আহত হলেও সংযত গলায় বলল, মরে যাবে কেন? কী অসুবিধা
হচ্ছে, সেটা বলো।

বিশাখা বলল, তোমার জ্ঞানার দরকার নেই। তুমি মদ খেয়ে মাতাল হবে,
তারপর ভোস ভোস করে ঘুমোবে, তাই ঘুমোও!

এটাও আর-একটা বিষের তীব্র। অরূপ নিয়মিত মদ্যপান করে বটে, কিন্তু
বিশাখা ছাড়া তাকে আর কেউ মাতাল বলে না। সবাই বলে, অরূপকে কখনো
বেচাল হতে দেখা যায় না। তাতে অরূপ গর্ব অনুভব করে। মাতাল শব্দটি সে
অপছন্দ করে। এক-একদিন হয়তো মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়, শরীর কিছুটা
দোলে, কথা বলে উচ্চকর্ত্তে, কিন্তু সে কাকুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে না, নিজের
পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হারায় না, গালমন্দণ করে না। মেজাজ ফুরফুরে হয়। তারপর
তো সকলৈ ঘুমোয়। সে ভোস ভোস করে ঘুমোয়, কে নিঃশব্দে, তা কে জানে?
অরূপের নাক-ডাকা সম্পর্কে বিশাখা কখনো তেমন অভিযোগ জানায়নি।
আজকাল বিশাখাও পিচ পিচ করে নাক ডাকে, ঘূম না-এলে অরূপ তা শুনতে
পায়। কিন্তু একবারও সে-কথা বলেনি বিশাখাকে।

অরূপ বলল, আমি মোটেই মাতাল হইনি! তুমিও তো আজ দিব্যি জিন
খাচ্ছিলে দেখলাম। দুবার না তিনবার নিলে।

বিশাখা কঠস্বরে অনেকখানি বাল মিশিয়ে বলল, তুমি দেখেছিলে, আমার
দিকে দেখার তোমার সময় ছিল? তুমি তো একজন সুন্দরীকে নিয়েই মন্ত হয়ে
ছিলে।

অরূপের মনে মনে এই আশক্ষাই ছিল। রোশেনারা। সে কেন অরূপের পাশে
বসেছিল সারাক্ষণ, তার জন্য তো অরূপ দায়ি নয়! সে তো মহিলাকে ডাকেনি,
টানাটানিও করেনি।

এবার কি একটু ঝাঁঝ এসে গেল অরূপের গলাতেও? সে বলল, মন্ত

হয়েছিলাম মানে? একজন পাশে বসলে কথা বলব না?

বিশ্বাখা বলল, শুধু কথা? চোখ সরাতেই পাছিলু না। তারপর হিন্দি সিনেমার নায়কের মতন মাঝপথে গান জুড়লো!

এরপর কথার পিঠে গরম গরম কথা। চাপা গলায় ঝগড়া।

একসময় অরূপ আবার বিশ্বাখার হাত ধরে বলল, এত রাস্তিরে এইসব কথা বলে কোনো লাভ আছে? শুধু শুধু ঘূর্ম নষ্ট। শুয়ে পড়ো। কাল সকালে কথা হবে।

বিশ্বাখা বলল, তুমি ঘুমোছিলে, ঘুমোও না! কে বারণ করেছে? আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি এতক্ষণ। তুমি নেশার কৌকে কস্বলটা টেনে নিছিলে বারবার। ওঃ, আমার ইচ্ছে করছে, এক্সুনি কোথাও চলে যেতে। এরকম বিছানায় কেউ উত্তে পারে? শীতে কাঁপছি! কাল সকাল হলেই আমি কলকাতা ফিরে যাব। তুমি থাকো এখানে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি করো, আমি এখন দেখতে খারাপ হয়ে গেছি—

অরূপ বলল, মণি, প্রিজ, প্রিজ। তুমি মোটেই দেখতে খারাপ হওনি। আমি তোমাকে আগের মতনই ভালোবাসি!

বিশ্বাখা বলল, বাজে কথা বলো না। সব পুরুষরাই স্বার্থপর, কস্বল টেনে নিয়ে নিজে ঘুমোচ্ছো, কার স্বপ্ন দেখছো, এদিকে আমি...

আসল সমস্যাটা কি তা হলে কস্বল নিয়ে?

এ-কস্বলটা খুবই অভিনব। খাটটাই মন্ত বড়, অস্তত তিন-চারজন শুতে পারে। চারখানা মাথার বালিশ, দুখানা পাশ বালিশ, কিন্তু কস্বল একটিমাত্র। এতবড় কস্বল দেখাই যায় না। এবং মখমলের কভার, ভেতরে যে উল আছে তা বোঝাই যায় না, ভারি নরম আর আরামের। এ-কস্বলের নিচে অস্তত চারজন শুতে পারে।

চা-বাগানের বাংলোয় নিশ্চয়ই আরও অনেক কস্বল আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জন্য যে এই একটিমাত্র কস্বল দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই কস্বলটার বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

মধ্যরাত্রির বিবাদ একসময় থেমে যাবেই। স্বামী আর স্ত্রী দু'দিকে ফিরে শোবে, একসময় ঘুমিয়েও পড়বে।

কিন্তু অরাপের আর ঘূর্ম আসছে না।

মাতাল হবার অভিযোগ তাকে কষ্ট দিয়েছে। একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে যেতে উঠে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করার অভিযোগ সে মানতে পারেনি। অবশ্য এরকম অভিযোগ সে আগেও কয়েকবার শুনেছে থ্রকারাস্তরে।

সবচেয়ে বেশি আঘাত সে পেয়েছে স্বার্থপরতার কথা শুনে। সে স্বার্থপর, স্ত্রীকে শীতের কষ্ট দিয়ে সে একা কস্বল উপভোগ করেছে? অরাপের মতন পুরুষরা নিজের স্ত্রীর কাছেও শিভালুরাস থাকতে চায়। নিজে কস্বল গায়ে না দিয়ে জড়িয়ে

দিতে চায় বিশাখাকে।

এক-একজন পুরুষের শোওয়াটা বেশ অস্ত্রুত ধরনের হয়। ঘুমের মধ্যে তারা সারা বিছানা ঘুরে বেড়ায়। পাশের লোকের গায়ে পা তুলে দেয়। বিয়ের আগে অরূপের এই দোষ খুবই ছিল। এখন শুধরে গেছে, বিশাখা কখনো অরূপের শোওয়া নিয়ে দোষ দেয়নি। কিন্তু কস্বল টেনে নেওয়া? কলকাতায় দু'জনের জন্য আলাদা কস্বল থাকে। বিয়ের পর প্রথমদিকে দু'জনের আলাদা কস্বল, ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইদানীং দু'জনে যখন শুভে যায়, মাঝে মাঝে শরীর নিয়ে মন্তব্য পর, ঘুমোয় আলাদা আলাদা কস্বলে। শরীর-সুখের পর ঘুমের সুখ আরও বেশি। আলাদা কস্বলের ঘুমের সুখ অবধারিত।

ইদানীং শরীর নিয়ে মন্তব্য রাখি ক্রমশ কমছে, বাড়ছে ঘুমের সুখের ব্যাকুলতা। ঘুম বিস্তৃত হলে বিশাখার খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সব মেয়েরই হয়।

এখন বিশাখার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ কস্বল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঝগড়ার পর বিজয়নী হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিশাখা। শুধু জেগে থেকে ছটফট করছে অরূপ। এ জাগরণ অন্যরকম।

আমরা অনেক সময় ভাবি, সারারাত ঘূম আসছে না। আসলে, পুরোপুরি জাগ্রত থাকার বদলে এ এক ধরনের আধো-ঘূম। পাতলা পাতলা স্বপ্নের মধ্যে কেটে যায় সময়।

অরূপও আধো-জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনবরত ভেবে যেতে থাকল, একটাই কথা— সে স্বার্থপর! সে বিশাখার কাছ থেকে এতবড় কস্বলের অনেকটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঘুমিয়েছে! বিশাখার অভিযোগ হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। সে কি অন্যদিনের তুলনায় আজ বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে? রূপসী রোশেনারা পাশে ছিল বলেই তার শরীর বেশি চনমনে হয়ে গিয়েছিল? এত বড় কস্বল, তবু ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে টেনে নিয়েছিল অনেকখানি? হতেও তো পারে।

আধো-ঘুমের মধ্যে অনুতপ্ত বোধ করল অরূপ। বিশাখাকে তার আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে হল। কিন্তু এরকম ঝগড়ার পর হঠাতে ভালোবাসার কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না। মনে হয় যেন মনযোগানোর কথা।

হঠাতে একটা যুক্তি মাথায় এসে গেল অরূপের।

হতে পারে, সে আজ একটু বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে। হতে পারে, নেশাগ্রস্ত ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে কস্বল টেনে নিয়েছে। কিন্তু তার তো একটা সহজ সমাধানও ছিল। বিশাখা কেন তার দিকে সরে এল না? বিশাখা যদি তাকে জড়িয়ে ধরত, তা হলে তো দু'জনের জন্যই প্রচুর কস্বল থাকত? কেন এল না বিশাখা? সে তো বিশাখার শক্র নয়, শীত করলে বিশাখা তাকে

জড়িয়ে ধরবে না কেন?

এক্সুনি বিশাখাকে জাগিয়ে এই যুক্তিটা কি শোনানো যায়? কী উত্তর দেবে সে?

কিন্তু বিশাখা এখন দিব্য ঘুমোচ্ছে। এখন তাকে জাগাবার প্রশ্নই ওঠে না।

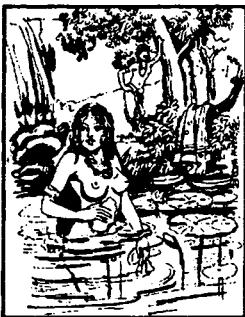
অরাপের আধো-ঘুমের স্বপ্নটা ত্রুমশ অন্যরূপ নিতে লাগল। সে দেখল, একটা বিশাল কস্বল, শত শত মাইল লম্বা, তার নিচে অনেক মানুষ। এরা কারা? এরা সারা দেশের মানুষ। এক কস্বলের নিচে শুয়ে আছে। কখনো কস্বলটা সরে গেলে সবাই কাছাকাছি এসে জড়াজড়ি করছে, হাসছে, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী, সুন্দরবনের মানুষ। কস্বলটা একদিক থেকে অন্যদিকে বেশি সরে গেলে সবাই হাসাহাসি করে ঠিক করে নিচ্ছে।

শেষ রাতের স্বপ্ন হঠাৎ তো থেমে যায় না, চলতেই থাকে। যারা এরকম স্বপ্ন দেখে, তারা জানে, অন্যমনক্ষ হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও স্বপ্নটা চলতেই থাকে। অরাপ দেখতে লাগল, সারা আকাশ জুড়ে উড়ছে একটা কস্বল। রং বদলাচ্ছে, তবু, প্রধানত নীল রঙের।

তারপর অরাপ দেখল, সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একটা নীল রঙের কস্বল, আকাশের বদলে, সেই কস্বলের নিচে পৃথিবীর সব মানুষ। আকাশের সেই কস্বল নিয়ে টানাটানি চলছে, আবার ঠিকঠাক করে নিয়ে খলখল করে হাসছে সব মানুষ, কালো-সাদা, খয়েরি রঙের মানুষ, ঝগড়া হচ্ছে, আবার মিটেও যাচ্ছে। মানুষ কাছাকাছি এলেই ঝগড়া মিটে যায়, দূরত্বেই যত গণগোলের মূল।

আধো-ঘুমস্ত অরাপের ঠোটে ফুটে উঠেছে হাসি, সে পৃথিবীর কী দারুণ একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে আজ। আকাশটাকে সমগ্র মনুষ্যজাতির একটা কস্বল বলে ধরে নিলেই তো হয়। আর কখনো ঝগড়া হবে না।

সকালে যখন অরাপের ঘুম ভাঙল, তখনও বিশাখা ঘুমস্ত, নিজের অঙ্গাতেই সে জড়িয়ে আছে অরাপকে। শরীরে শরীর, বুকে বুক অতবড় কস্বলটা পড়ে আছে খাটের নীচে।



ব্যাভিচারণী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘খাবে পদ্ম, খা, একটা চুমো খা’, বলতে বলতে লখীন্দর তার পেশল কজিতে পদ্মকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটদুটো ভবে নেয় নিজের ঠোঁটের ভেতর। একটা পিছিল শিরশির চেতনা লখীন্দরের শরীরময়, আর মুহূর্তে পদ্মর লাল চেরা জিব ছাঁয়ে ফ্যালে লখীন্দরের জিব। পদ্মর ঠোঁট দুটো বার করে কিছুক্ষণের জন্য অবশ হয়ে যায় সে, তার শরীরে যিম ধরে, জিব থেকে রক্তের ভিতরে ক্রমশ সৌধিয়ে যেতে থাকে একটা ঘূম। ততক্ষণে পদ্ম লখীন্দরের শরীরে জড়িয়ে মাথাটা রাখে তার কাঁধের ওপর। এক-একবার চেরা জিব বার করে চকিতে ঢুকিয়ে নেয় মুখে, শরীরের কফোটা বিষ ঝরে যেতে তারও শরীরে অবশভাব। আধো-ঘূম-আধো-জাগরণে তাদের লখীন্দরের জিব অস্ফুট কঠে আউড়ে যাচ্ছে, পদ্ম, পদ্ম রে আ, জেবন জুড়ায়—

চারচালা খোড়ো ঘরের দরজা তখন হা-হা খোলা, দখনে হাওয়া কপাট ঠেলে হ হ করে ঘরে ঢুকছে। বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, কিন্তু না লখীন্দর না পদ্ম, কারো তাতে ছিঁশ নেই। তেলচিটে বিছানায় একমুখ কালো পিঙ্গল রঙে মেশা দাঢ়িগোঁফ নিয়ে আরামে গোঙাচ্ছে লখীন্দর। এখন তার সমস্ত সন্তা, রক্ত মাংস ভরে রয়েছে পদ্মের দেওয়া আরাম। গাঁয়ের একধারে কালনাগিনী নদীর প্রাণে তার ঘর। নদীর নামও কালনাগিনী, লখীন্দরের ঘর ভর্তিও নানা জাতের সাপ। সে সমস্ত সাপই তার পোষ্যপুত্তুর। শুধু এরমধ্যে এই পদ্ম, এই সোনার বর্ণপদ্মগোখরো, যার চোখের ভেতর লখীন্দরের জন্য এক অস্তুত চোরাটান, তার সঙ্গেই লখীন্দরের যতো-ভাব-ভালবাসা। ঘোরের মধ্যে সে পদ্মের পিছিল শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ‘পদ্ম পদ্ম রে, তুই আর জন্মে লিচ্ছয় আমার বউ ছিলিস।’

বিশের কণাগুলো জিব থেকে আস্তে আস্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে নেমে আসে একটা লাল-নীল জাল, সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা। তার সুতো বেয়ে সে ক্রমশ ভাসতে থাকে, উড়তে থাকে, এক অঙ্গীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় স্বর্গের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি একটা হাল্কা-ভাব, বঁঁচুলির

রঞ্জে রঞ্জে আন্তুত এক ধরনের সুখ তাকে বুঁদ করে রাখে। কখনো মনে হয় আকাশ থেকে একটা নীল রঙের পরী, যার গাঁটা তুলোর মত নরম, লখীন্দরকে উম উম শব্দ করে চুমকুড়ি দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

এভাবে পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে লখীন্দর, আর তার শরীরে লেপ্টে থাকে পঞ্চের পিছিল শরীর। লখীন্দরের স্যাঙ্গত ষষ্ঠীপদ একবার উঁকি মেরে দেখল, তার গুরু বিম মেরে পড়ে আছে, চোখ দুটো বৌজা, উক্ষখুস্ক চুল, লালা গড়াচ্ছে তার দুকষ বেয়ে। এসময় তাকে বিরক্ত করাটা লখীন্দর পছন্দ করে না। এর আগে ষষ্ঠীপদ ক'বাৰ ডেকে ভীষণ দাবড়ানি খেয়েছিল তার গুৱৰ কাছে।

পঞ্চের সঙ্গে তার এই ক'বছরের ভাব ভালোবাসা, তার বিয়ের এই ছোবল লখীন্দরের শরীর একেবারে বদলে দিয়েছে। টানটান চামড়ার রং কালচে মেরে গেছে, কুঁকড়ে গেছে আঙুলগুলোর চামড়া, হল্দেটে হয়ে গেছে চোখের রঙ। এসব বুবাতে পারে লখীন্দর, মাঝে মাঝে পঞ্চকে বলে, ‘শুধু চামড়ার রঙ নয় রে পঞ্চ, তোর চুমু খেয়ে আমার রক্তের রঙটাই বদলে গেল রে।’ একদিন ষষ্ঠীপদকেও হাসতে হাসতে তাই বলেছিল।

ষষ্ঠীপদ বিশাস করেনি, লখীন্দর হঠাৎ তার দিকে তীব্রচোখে চেয়ে বলে, ‘প্রেত্যয় হয় না? দেখবি তবে—বলে একটা ধারালো অস্ত্র বিছানার তলা থেকে বার করে নিজের কঙ্গিতে একটা আঁচড় কাটে, অমনি কালো রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে থাকে তার শিরার ভেতর থেকে। ষষ্ঠীপদ দেখে থ হয়ে গিয়েছিল।

২

এই পঞ্চের সঙ্গে লখীন্দরের ভাব-ভালবাসার আজ দু-আড়াই বছরের। বিম কেটে যেতে লখীন্দরের মনে পড়ে যায় পঞ্চের সঙ্গে তার প্রথম দেখার কথা। কি বিশাল ফণা তার, সোনার বর্ণ রঙ, সারা গায়ে মাছের অংশের মতো দাগ, মাথায় একটা খড়ম চিহ্ন। খৌদল থেকে বেরিয়ে একলাফে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফণাটা তাক করেছিল লখীন্দরের কপাল বরাবর, চোখে জিবে গনগনে রাগ, দাঁতে আ-কামানো লকলকে বিষ। লখীন্দরের শরীরে বেদেনীর রক্ত। তার বাপ ছিল জেলে, কিভাবে যেন এক দলছুট বেদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর সেই বেদেনীর পাণ্ডায় পড়ে তার বাপ মাছ ধরার পেশা ছেড়ে সাপের গুণিন হলে খুব নামডাক হয়। সেই রক্ত লখীন্দরের শরীরে ছিল বলে মৃহুর্তে গোখ্রোটার গলার কাছে চেপে ধরে বশ মানিয়ে ফেলেছিল। খেয়াল হতে দেখল এটা সাপ নয়, সাপিনী, তাই এত চোখের ছেলালি। পোষ মানতেই লখীন্দর তার নাম দেয় পঞ্চ।

পদ্মর খবর প্রথম এনে দিয়েছিল ষষ্ঠীপদ, তার স্যাঙ্গত। বয়সে তার চেয়ে চের ছেট ষষ্ঠীপদ তাকে ‘সাপের মাস্টার’ নাম দিয়েছে। নামটা তার মন্দ লাগে না। প্রায়ই ষষ্ঠীপদ তার পায়ের কাছে বসে বলে, ‘গুরু, সাপের নাড়ী নক্ষত্র তোমার মতো ভূ-ভারতে কেউ জানে না।’ সেই ষষ্ঠীপদই একদিন ভোর-ভোর এসে বলেছিল, রামনবমীপুরের বোসবাড়ির ফাটলে নাকি সাপ দেখা গেছে। বোসবাড়ির বোসবাবুরা এখন আর গাঁয়ে থাকে না। ছেলেপুরের চাকরি-বাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাবার পর ওখানেই বাড়িয়ারদোর করেছে। গাঁয়ের অত বড় বাড়িখান এখন পোড়োবাড়ি। তার দালানে বাস করে নটে ভিখিরি। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। সাপটা নাকি তাদের বেছনার পাশে এসেছিল রাতের বেলা।

লখীন্দরের রক্তে তখন সাপ ধরে বেড়ানোর নেশা। জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে, পুরোনো বাড়ির ফাটল থেকে টপাটপ সাপ ধরে আনে। এমনকি ধানক্ষেতের আলের উপর ঝিলিক ছড়িয়ে পালিয়ে যেতে থাকা আলকেউটেও ছুটে ধরে ফেলেছে সে। তার খোড়োঘরে ঝাঁপির পর ঝাঁপি সাপে ভরে উঠেছে। ষষ্ঠীপদর কাছে নতুন সাপের খবর পেয়ে তক্ষুনি বোসবাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল।

প্রায় সাতদিন সাপটার সঙ্গে জড়িবুটি খেলায় গুম হয়েছিল লখীন্দর। তিনতলা পোড়োবাড়িটার কোন ফাটলে কিংবা চোরাকুলস্থিতে সাপটা লুকিয়ে রয়েছে তা মগজে আনতেই বেশ ক'দিন ক'রাত কেটে গিয়েছিল। তারপর এক ঠা ঠা দুপুরে এক ফাটলের ফাঁকে একজোড়া ছুলন্ত চোখ তার লাল চেরা জিব লখীন্দরকে দেখিয়ে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। তারপর থেকে সেই জড়িবুটি খেলা, কখনো তার ফণাটা এক নজর চোখে সেঁধোয়, কখনো তার এক চিলতে লেজ। আবার মুহূর্তে সে ফাটা ফাটলের ফাঁকে ফেরার। একঘর থেকে অন্য ঘরে, দোতলা থেকে তিনতলার চিলে কোঠার ঘরে। তক্তে তক্তে লখীন্দরও তার পিছু পিছু গুঞ্জ শুকেই সে বুঁৰেছিল এটা পদ্মগোখরো না হয়ে যায় না। তারপর সোনালী রঙের ঝিলিক দেখে তার ধারণা মিলে যায়। সাতদিনের দিন এক খৌদলে পুরো হাতখান ঢুকিয়ে গোখরোটাকে বার করে নিয়ে আসে লখীন্দর। জড়িবুটি খেলে পোষ মানিয়ে শুকে ঘাড়ে ফেলে বলেছি ‘চ রে পদ্ম, ঘরে চ। এই পোড়োবাড়িটায় তরে আর মানায় না।

চারচালার খোড়ো ঘরটাতে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝাঁপি। কোনটায় কেউটে, কোনটায় শঞ্চাচূড় কোনটায় খান কুড়ি-পঁচিশ আইরাজ। অন্য পাশের ঝাঁপিতে রয়েছে শাঁখামুটি, রক্তকানড়, কালাজ। বিশ-পঁচিশটা ঝাঁপির ভেতর ভিনজাতের সাপের বাস, আর এদের নিয়েই লখীন্দরের সংসার। তার এই ছেট ঘরখানাকে ষষ্ঠীপদ নাম দিয়েছে সাপঘর। লখীন্দরের চেতনা, অনুভূতি জীবিকা সবকিছুকেই ঘিরে রয়েছে মা মনসার এই জীবগুলো। বলা যায় এদের সঙ্গে তার নাড়ীর

যোগ, এদের চাউনি, লকলকে জিবের ওঠাপড়া, ফণার দুলুনি দেবে সে বুঝতে পারে ওদের কথা। জীবগুলোও লখীন্দরকে ভালোবাসে, সোহাগ জানায়। আবার লখীন্দরের চোখে রাগ দেখলে তয়ে কুঁকড়ে যায়, ফণসুজ একলাফে পিছিয়ে গিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে সভয়ে লক্ষ্য করে লখীন্দরকে। এক-একটা সাপের এক-একরকম কেতা, লখীন্দর সব বুঝতে পারে।

সাপঘরের ইসব জীবের দেখাশোনা করার ভার ষষ্ঠীপদের ওপর। লখীন্দরকে গুরু মেনেছে সে। তার ভারী ইচ্ছে, ‘সাপের মাষ্টারে’র পা ধরে একদিন সেও মাষ্টার হবে। লখীন্দর যখন গোখরো কিংবা রস্তকানড় গলায় ঝুলিয়ে দুকোশ পথ ভেঙে নারাণগঞ্জের সনাতন মঞ্চিককে নেশা বেচতে যায়, তখন সঙ্গে থাকে ষষ্ঠীপদ। সাপের ছোবল জিবে দিয়ে বুদ হয়ে যায় সনাতন মঞ্চিক। এক ছিলিম গাঁজার মতো এক ছোবল বিষ। ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে একবার সনাতন মঞ্চিককে দ্যাখে, একবার লখীন্দরকে, আরেকবার লখীন্দরের গলায় ঝোলানো গোখরোকে, ষষ্ঠীপদের চাউনি দেখে লখীন্দর কখনো বলে ওঠে, ‘আবি নাকি রে, এক ছিলিম।’ বলে গোখরোটাকে এগিয়ে ধরতেই ষষ্ঠীপদ তিড়িক লাফ মারে, কিন্তু তার পিছু ছাড়ে না। আবার লখীন্দর যখন রাত বিরেতে ভিনগায়ে সাপের বিষ ঝাড়াতে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার সঙ্গে থাকে। অবাক হয়ে দ্যাখে কিভাবে লখীন্দর বিষদাঁতের ক্ষতের উপর খোলামুকুট চেপে ধরে মন্ত্রের অমোঘ টানে বিষ নামিয়ে নিয়ে আসে। আবার শহুরে বাবুরা যখন কাঁচের টিউব এনে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার পাশে। বস্তুত এসব ব্যাপারে ষষ্ঠীপদই সব যোগাযোগ করে। দেনাপাওনা দরদাম সব ষষ্ঠীপদের হাতে। মামনসার জীবের খাবারও জোগাড় করার ভার তার ওপর তাদের বাস করার ঝাপির দরকার হলেও সে।

ষষ্ঠীপদ এ সবই করে বিদ্যে-শেখার লোভে। লখীন্দর ‘সাপের মাষ্টার’ একদিন তার সব বিদ্যে নিশ্চয় সে ষষ্ঠীপদকে দিয়ে যাবে। কখনো লখীন্দরের কাছে ভয়ে ভয়ে এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু লখীন্দরের সেই এক কথা, ‘দূর বেটা, তুই সাপের লেজ ধরতে ভয় পাস, তুই সাপের মন্ত্র শিখবি কি রে। যা ভাগ।’

গাঁয়ের অন্যবাসিন্দাদের সঙ্গেও লখীন্দরের সম্পর্ক খুব কম। সে পড়ে থাকে গাঁয়ের একপাণ্ঠে, নদীর ধারে, একা তার মা মনসার জীবদের সংসারে বুদ হয়ে। এক ষষ্ঠীপদ ছাড়া বাকি মানুষজন সাপঘরের নাম শুনলে তার সাত হাত দূর দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা লখীন্দরের ঘরের ত্রিসীমানায় কেউ পা মাড়ালে সে তার সাপদের লেলিয়ে দেবে। লখীন্দর এ সব কথা শুনে হাসে, দাঢ়ি গোঁফের জঙ্গলে সে হাসির বিলিক বড় অঙ্গুত।

লখীন্দর ষষ্ঠীপদকে বলে, ‘বুঝলি বেটা সবাই আমাকে ডরায়, আবার সাপে কাটলে আমাকেই আবার তারা তালাশ পাঠায়। এ ভারী মজার কথা।’

কখনো ষষ্ঠীপদকে বলে, সাপের মস্তুর শিখবি, তার আগে সাপের চোখ ভাল করে নজর দিয়ে চেন। সাপের নজরই হল আসল। শীঁখামুটির চোখ আর বাঁশবনে কেউটের চোখ একরকম নয়, একটার চোখে খচরামি তো অন্যটার চোখে শয়তানি। আবার মেটে সাপের চোখ, তার মধ্যে কেমন সতর্কতা আর ভয়।

ষষ্ঠীপদ হাঁ করে শোনে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

৩

লখীন্দরের বাপ ছিল সাপের গুণিন। কিন্তু সাপের নজর লখীন্দর ভালো করে ঠাহর করতে শেখে যেবার ভীমরাজ বেদের দল তাঁবু গেড়েছিল তাদের গাঁয়ের ধারে। ষষ্ঠীপদ এখন যেমন ছুঁকছুঁক করে তেমনি জড়িবুটি খেলার লোভে সেও মূর ঘূর করতো বুড়ো বেদে ভীমরাজের আশে পাশে। একদিন বুড়ো রেগে গিয়ে নিজের গলা থেকে একটা মস্ত কেউটে সাপ খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। লখীন্দর সতর্ক হবার আগেই কেউটেটা ছোবল বসায় তার হাতে, মুহূর্তে চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মুখে গ্যাজলা। পরে জেনেছিল সেই ভীমরাজই তার কটা ক্ষত থেকে এক চুমুকে বিষ তুলে নিয়েছিল। লখীন্দরের জ্ঞান ফিরলে তার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, ‘যা বেটা, তোর হাতে খড়ি হল আজ।’

তারপর থেকে বুড়ো ভীমরাজ তাকে প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছিল, একে একে চিনে নিল সাপেদের ঘরসংসার, তাদের চাউনি। ক্রমে তার নিজের চোখেও সাপেদের মতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র হয়ে উঠল, যেরকম ছুরির মত দৃষ্টি সে দেখতে পেত বুড়ো ভীমরাজ আর তার ছেলে নগারির চোখে। নগারি তখন তার বয়সী এক যুবক। একমাথা বাঁকড়া চুল আর তামার মতো গায়ের রঙে অজস্র পেশী তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে চেন্নায়। নগারি তার বাপের মতই সাপের দোষ এবং যম। অন্যায়ে তাজা একটি গোখরোর টোট দুআঙুলে ফাঁক করে তার বিষদাত ভেঙে আনতো নিজের ঝকককে সাদা দাঁতের আঁকশি-তে। লখীন্দরের বউ গোলাপী একদিন এই কাণ্ডটা দেখে চোখ ছানাবড়া করে বলেছিল, ‘হাই মা, ই কি দস্যি না দানব!’

লখীন্দর তার দোন্তের দিকে গৌরবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বউকে বলেছিল ‘টটা একটা গুরুড় বটেক।’ গুরুড় শব্দটা নগারির পক্ষে সবচেয়ে মানানসই ছিল। সাপের উপর তার একটা অহেতুক হিংস্রতা। যে সাপটা তার কথা শনতো না, কিংবা হেরফের ঘটাতো তার আচরণে, ভীষণ রেগে যেত নগারি। তার বাঁকড়া চুল আরো খুলে উঠতো রাগে, কিড়মিড় করতো দাঁত। কখনো এমন হয়েছে, এক আঢ়াড়ে একটা গোখরোকে মেরে ফেলেছে। লখীন্দরের মুখে এমনটা শনে গোলাপী বিস্ময়ে হা হয়ে বলতো, ‘লোকটা কি গো, ই তো চাণালের

ରାଗ ।'

ସେଇ ନଗାରି ସଖନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରେର ଦୋଷ ହଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରେର ସଙ୍ଗେ ତାର ସରେ ଆସତ । ଗୋଲାପୀ ପ୍ରଥମଟା ଡମେ ଆଂତକେ ସରେ ଥାକତୋ ଦୂରେ । ବଲା ଯାଯ ନା, ଲୋକଟାର ଯା ରାଗ, କିନ୍ତୁ ତାକେ ସଖନ କାହୁ ଥେକେ ଦେଖିଲ ତଥନ ନଗାରି ଅନ୍ୟରକମ । ତାର ଦେଶ-ବିଦେଶ ସୁରେ ବେଡ଼ାନୋର ସାତ କାହନ ଗଲୁ ବଲତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଆର ଗୋଲାପୀର କାହେ । କଥନୋ ସମ୍ମଦ୍ରେର ପାଡ଼େ, କଥନୋ ଗଭିର ଜଙ୍ଗଲେ ତାବୁ ଫେଲେ ତାଦେର ବସବାସେର କଥା, ଭୟକ୍ଷର ସବ କାଣ୍ଡକାରଖାନାର ଗଲ । ତଥନ ଦୁଇନେଇ ହା କରେ ଶୁନନ୍ତ ମେ ସବ । ତାରପର ଏକଦିନ ସଖନ ନଗାରି ଗୋଲାପୀକେ ଏକଟା ହରେକ ଡିଜାଇନେର ପୁତିର ମାଲା ଦିଲୋ, ତାତେ ଝକକାକ କରଛେ ଲାଲନୀଳ ସ୍ଫ୍ରଟିକଥଣ ତାଇ ଦେଖେ ଗୋଲାପୀ ତୋ ଆନନ୍ଦେ ଥ । ମନେ ମନେ ଭାବିଲ ଲୋକଟାର ବାହିରେଇ ଅମନ ରାଗ, ଭିତରଟା ନରମ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ତଥନ ବୁଢ଼ୋ ବେଦେ ଭୀମରାଜ ଆର ନଗାରିର କାହେ ଏକେର ପର ଏକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖେଳା ଶିଖିଛେ, ବଶ ମାନାଛେ ବିଷେ ଟାଇଟ୍ସ୍‌ବୁର ସାପଗୁଲୋକେ, କୋନ ସାପେର ମେଜାଜ କିରକମ, କାର ଦୂର୍ବଲତା ଶରୀରେର କୋନ ଜାଯଗାଯ, ଏସବଇ ସାରାକ୍ଷଣ ତାର ମାଥାଯ । ରାତେ ସରେ ଫିରେ ଗୋଲାପୀକେ ତାର ବିଦେୟର ରକମ ବୋବାତୋ, ଜାହିର କରତୋ ତାର କ୍ଷମତା । ସାପ ସମ୍ପର୍କେ ଗୋଲାପୀର ପ୍ରାଥମିକ ଆଡ଼ିଷ୍ଟତା କେଟେ ଗେଲେ ମେଓ ହା କରେ ଶୁନନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରେର ବିଦେୟର ରକମ ।

ସଖନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦରେର ଜଡ଼ିବୁଟି ଖେଳା ଶେଖା ପାଯ ଶେଷ, ନତୁନଭାବେ ଜୀବନ ଶୁରୁ କରାର ସ୍ଵପ୍ନେ ସଖନ ମେ ମଣଗୁଲ, ଠିକ ତଥନେଇ ଏକଦିନ ବାଡ଼ି ଫିରେ ଦେଖିଲ ତାର ସରେ ଫର୍ସା । ବୁଢ଼ୋ ଭୀମରାଜ ବେଦେ ତାର ତାବୁ ଶୁଟିଯେ ଦଲବଳ ନିଯେ ସଖନ ଦେଶାନ୍ତରେ ରଖନା ଦିଯେଛେ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଗୋଲାପୀଓ କୋନ ଫାଁକେ ଭିଡ଼େ ଗେଛେ ନଗାରିର ସଙ୍ଗେ । ବ୍ୟାପାରଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଜେନେ ଏକେବାରେ ନିର୍ଧର । ମା ମନସାର ଜୀବକେ ସେ ଭାଲବାସତେ ଶିଖେଛିଲ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପୀକେ ତୋ ଭାଲୋବାସା ଦିତେ କିଛୁ କମ କରେନି । ସରେ ଏସେ ସଂବିଂଧି ଫିରତେ ସେ ବିଡ଼ିବିଡ଼ କରେ ଶୁଧୁ ବଲେଛିଲ, ‘ଯା ରେ ଗୋଲାପୀ, ତୁଇ ବେବାଜିଯା ହେଁ ଯା ।’

ଏ-କଥା ଠିକ, ଗୋଲାପୀର ପ୍ରାୟ-ଫର୍ସା ଚାବୁକେର ମତୋ ଶରୀରଟାର ମଧ୍ୟେ ସେ ଅନେକ ସୁଖ ପେଯେଛିଲ । ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗତ ଜାନତୋ ବେଶ । ଆର ବେଦେଦେର ସାପଗୁଲୋ ଚେନାର ପର ଗୋଲାପୀର ଶରୀରଟାଓ ମନେ ହତୋ ଆରେକଟା ସାପ, ଅମନେଇ ପିଛିଲ, ଅମନେଇ ସୋନ୍ଦର । ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ସରେ ଗୋଲାପୀ ଯେଣ ତାର ଅନ୍ତିମେର ଅର୍ଧେକ ଛିଲ, ସେଇ ଗୋଲାପୀ କଥନ ଯେ ତାର ରଙ୍ଗତେର ଭାଗ ନଗାରିକେ ଦିଯେଛିଲ, ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବୋବେନି । ସଖନ ବୁଝିଲ, ତଥନ ତାର ସାରା ସରେ ଗୋଲାପୀର ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁ ନେଇ । ବେବାଜିଯାର ଦଲ ତଥନ ତାବୁ ଶୁଟିଯେ କତ ଦୂରେ ଚଲେ ଗେଛେ କେ ଜାନେ ।

ଗୋଲାପୀ ଗେଲ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦିର ଭୀମରାଜେର କାହୁ ଥେକେ ସେ ବିଦେୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଶିଖେ ଫେଲେଛେ, ତାତେ ସେ ବିଦେୟର ଏକ ଜାହାଜ । ଜଡ଼ିବୁଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଡ଼େ ସମ୍ଭବ ସାପକେଇ ମେ ଏଥନ ବଶ ମାନାତେ ପାରେ, ସାପେ-କଟା ଝାଗି ବାଁଚାତେ ପାରେ, ସାପେର ଚାଉନି

দেখে তার কথা বুবতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে তার সাপঘর। ভেবেছিল, আরেকটা গোলাপী ঘরে নিয়ে আসে, কিন্তু বোসবাড়ির ফাটল থেকে হঠাত এই পদ্ম তার ঘরে এসে সব উলটপালট করে দিল।

এখন সেই পদ্মের আকর্ষণে সে প্রায় সম্মোহিত হয়ে থাকে সারাদিন। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পদ্মকে নিয়েই তার খেলা। কখনো পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে সে, আর পদ্মও তার শরীরে জড়িয়ে, সোহাগ দিয়ে, গায়ে লেস্টে পড়ে থাকে। কখনো পঞ্চের ঠোটে চুমু খায়, পদ্মও তার চেরা জিব মেলে চেটে দেয় লখীন্দরের গাল। দেখলে মনে হয়ও তার বে করা বউ। পঞ্চের পিছিল শরীরের স্পর্শে তার শরীর জেগে ওঠে, এক অস্তুত সুখ তাকে অবশ করে দেয়। শুধু চুমুই দেয় না, এক ভীষণ বর্ষার রাতে পদ্মের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে এক অস্তুত বিজাতীয় প্রতিক্রিয়ায় রত হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্রমশ তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে। এই অস্তুত রতিক্রিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে অমন নধর হিলহিলে সাপটার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানো তার কাছে মধুর হয়ে ওঠে। গোলাপীকে হারিয়ে তার ভিতরে যে ক্রোধ, হতাশা আর ক্ষোভ ছিল পদ্ম ঘরে এসে তা অনেকটা মিটিয়ে দেয়। বরং তার মনে হয়, পদ্ম তাকে যে আনন্দ দেয়, তা গোলাপী কখনো দিতে পারেনি। পদ্মকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে ভাবে, ‘যা রে গোলাপী, তুই বেজিয়া হয়ে যা, আমার পদ্ম তর চেয়ে চের ভালো, এ তর মতো বেইমানি করবে না।

ক্রমে পদ্মের উপর তার ভাব-ভালোবাসা এমন ওম হয়ে ওঠে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করে না লখীন্দর। যেখানেই যায়, পদ্ম তার সঙ্গে আছে। তা এই নিয়ে একদিন একটা বিটকেল কাণ ঘটে গেল। গোপালনগরের ভবগৌসাই লখীন্দরের এক বাঁধা খন্দের। হস্তায় একবার জিবে সাপের ছোবল নেয়। শুধু নেশাই করে না, সে একজন রাসিক মানুষ। কোন্ সাপের সোয়াদ কেমন তা নিয়ে লখীন্দরের সঙ্গে মশকরা করে, তোর ওই বাঁশবুনে কেউটে সেদিন আমার ব্রহ্মাণ্ড শুরিয়ে দিয়েছিল, বুরলি লখীন্দর। শালা মহা বজ্জাত আছে। তা, এই ভবগৌসাই হঠাত লখীন্দরের কাঁধে সুন্দরী পদ্মকে দেখে হাসতে হাসতে বলে, ‘পদ্মের চুমু কি তুই একলাই খাবি, লখীন্দর? একদিন আমাকেও দে না ওকে। না হয় একটু বেশিই দাম দেবে।’ বলে তার নীলচে জিব বার করে দেয়।

ইঙ্গিত বুবে লখীন্দর ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তখন তার চোখ দুটো লাল, মুখটা চকিতে হিংস্র হয়ে ওঠে, হয়তো ভবগৌসাইকে একটা ভীষণ আঘাত করে ফেলতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ‘তোমার বে-করা বউটাকে কি একদিন আমার সঙ্গে শুতে দেবে, ভবগৌসাই?’

মুখের ওপর এমন একটা জবাব দিতে পেরে বেশ খুশি হয়েছিল লখীন্দর।

পদ্মকে তার শরীরের সঙ্গে আরো আস্টেপুষ্টে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এসেছিল। টাকার গরম দেখাতে এসেছে ভবগোসাই, পদ্ম যে তার কতখানি, সেটা তো হারামখোরটা জানে না।

শহর থেকে একদল বাবু হপ্তায় একবার এসে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়। লখীন্দর জানে, এসব বিষে ওষুধ তৈরি হয়। বাবুরাও লখীন্দরকে বেশ খাতির করে। অতরকম সাপের বিষ নাকি আর কোথাও তারা পায় না, আর এখানে মেহনতও সবচে কম, দামেও সন্তা।

তা এসব থেকে টাকা-পয়সার যা আমদানি হয়, তার হিসেব রাখে ষষ্ঠীপদ। সাপের খাবার যেমন সে যোগাড় করে, তেমনি লখীন্দরের খাবারের দায়িত্বও তার উপর। এটুকু হলেও লখীন্দর খুশি, বাকি পয়সা ষষ্ঠীপদ কি করে, তা সে খোঁজ রাখে না। মাঝে মাঝে ষষ্ঠীপদ অবশ্য বলে, যা টাকা-পয়সা জমেছে, তা দিয়ে একটা পাকাবাড়ি বানাবো, তার ভেতর সাপঘর হবে। সাপ রাখার জন্যে বড় বড় কাচের বয়েম কিনে আনবো। দেখবার জন্যে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়বে।

লখীন্দর অবাক হয়। পাকাবাড়ির ভেতর সাপঘর। বলে, ‘তোর মাথাখান খুব পোকার ষষ্ঠীপদ।

একদিন ঝাঁঝা করছে দুপুর। কালীনারায়ণপুরের এক জোতদারের বাড়ি থেকে ফিরছে লখীন্দর, কাঁধে তাজা রক্তকানড়। একটু আগে জোতদার শ্রীধর সামন্তের জিবে বিষ ঢেলে দিয়ে এসেছে। ঘর থেকে বেরবার সময় পদ্মকে একটা ঝাঁপির মধ্যে রেখে সে বলে এসেছে, ‘একটু জিরেন নে, দুফারবেলা আসবো।’ ভরগোসাই পদ্মের উপর লোভ দেখানোর পর থেকে সে আর ওকে নিয়ে কারো বাড়ি যায় না। পদ্ম তার একার। তা ছাড়া অন্য সাপ থাকলে পদ্ম কেবলই গরগর করে। ফেঁসফেঁস শব্দে তার রাগ জানাতে থাকে।

ফিরতে ফিরতে লখীন্দর ভাবছিল, বেচারা জোতদারের এই নেশা তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। সর্বক্ষণ রাজনেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে জমিজমা দেখবার সময় কোথায়। সামন্তবাড়ির লোকজন লখীন্দরের ওপর মনে মনে অসম্প্রস্তু, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। তার গলায় এমন এক-একখানা রক্তকামড় কিঞ্চা পদ্মগোখরো ঝোলানো থাকে যে ভয়ে আর রা কাড়ে না। ইদানীং অবশ্য ওঁর এক ছেলে সাবালক হয়ে জমিজমা দেখাণ্ডনা করছে, তাতে একটু হাল ফিরেছে।

ফেরার পথে হঠাতে ষষ্ঠীপদ বলল, ‘গুরু, রূপনগরের পুজোর দালানে একটা পদ্মগোখরো দেখা গেছে।’

ଲୟିନ୍‌ଦର କ୍ଲାନ୍ଟ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମଗୋଖରୋର ନାମ ଶୁଣେ ଚମକ ଜାଗେ । ଏକ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ା ତାର କାହେ ଆର ସେ ଦୁ-ଏକଟା ପଦ୍ମଗୋଖରୋ ଆହେ, ତାରା ହୟ ବୁଡ଼ୋ ନା ହୟ ନିର୍ଜୀବ । ଆବାର ଏକଟା ଚନ୍ମନେ ପଦ୍ମଗୋଖରୋ ଘରେ ନିଯେ ଏଲେ ହୟ । ପରଙ୍କଣେଇ ଭାବେ ନତୁନ ଏକଟା ପଦ୍ମଗୋଖରୋ ଏଲେ ପଦ୍ମର ଆବାର ଗୋସା ହବେ ନା ତୋ !

କିନ୍ତୁ ସତ୍ତୀପଦ ବଲେ, ‘ନା ହୟ ଓଟା ଆମିଇ ପୂର୍ବବୋ ଥିଲେ । କଦିନ ତୋମାର କାହେ ରେବେ ବିଷ ଦାଁତ ଭେଣେ ଏକଟୁ ମାନୁଷ ପାନା କରେ ଦାଓ ।’ ଏକଟୁ ଭେବେ ହଠାତେ ପୋଚାନୋ ରଙ୍ଗକାନଡ଼ଟାକେ ସତ୍ତୀପଦର ଦିକେ ଛୁଟେ ବଲେ, ‘ତାହଲେ ଏଟାକେ ଧର । ଦୁଚାରଟା ସାପ ଧରେ କାଟାଇ ଆଜ । ଅନେକଦିନ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖେଳା ହୟ ନା । ଆମି ଜଙ୍ଗଲ ଥିକେ ଏକଟା ଶିକଡ଼ ଖୁଜେ ନେ ଆସି ।’

ସତ୍ତୀପଦ ଭଯେ ଭଯେ ରଙ୍ଗକାନଡ଼ଟାକେ ଲୁଫେ ଧରେ, ସାବଧାନେ ଗଲାଯ ପୋଚାଯ, ଏକଟା ହାତେ ଧରେ ରାଖେ ସାପଟାର ଗଲା । କି ଚମତ୍କାର ଦେଖତେ ରଙ୍ଗକାନଡ଼ଟା, ପେଟେର କାଛ ଥିକେ ଦୂଦିକେ ମାଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ଟକଟକେ ଦାଗ, ଯେଣ ଦୁପାଯେ ଆଲତା ପରାନୋ । ଲାଲ ଜିବଟା ଫାଲୁକ ଫୁଲୁକ କରେ ବାଇରେ ଏନେ ଆବାର ଚକିତେ ଭିତରେ ଢୁକିଯେ ନିଛେ । ହିଲହିଲେ ଶରୀରଟା ସତ୍ତୀପଦର ଗାୟେ ଗଲାଯ ଶିରଶିର କରେ ନଡ଼ିତେ ଥାକେ । ଶୁରୁ ଆଦିଲେ ସେଣ ରଙ୍ଗ କାନଡ଼ଟାର ଗାୟେ ଏକଟା ଚମ୍ବ ଥିଯେ ନେଇ ।

କୋଥେକେ ଏକଟା ଶିକଡ଼ ଜୋଗାଡ଼ କରେ ଆନେ ଲୟିନ୍‌ଦର । ଝାପନଗରେ ପୁଜୋର ଦାଲାନେ ଦୁଜନେ ପୌଛେଇଁ, ନାକେର ରୋଯା ବାଡ଼ିଯେ ବଡ କରେ ଘାଣ ନେଇ ଲୟିନ୍‌ଦର, ହ୍ୟା ଏକଟା ଗଞ୍ଜ ବେରିଛେ ବଟେ । ତାରପର ସେ କ୍ୟେକଟା ଫାଟଲେର କାହେ ପରପର ଟୋକା ମାରେ, ଆବାର ନାକେ ଘାଣ ନେଇ, ଶିକଡ଼ ବୋଲାଯ, ବିଡ଼ବିଡ଼ କରେ କି ସବ ବକେ ତାରପର ମାଥା ନାଡ଼େ । ସାପଟା ତାର ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖେଳଛେ । ଦାଲାନେର ସବ ଦେଇଲେଇ ଭୁରଭୁର କରେ ଗଞ୍ଜ ବେରିଛେ । କୋଥାଓ ବେଶି, କୋଥାଓ କମ, ତାର ମାନେ ଜୀବଟା ଚଟ କରେ ଧରା ଦେବେ ନା । ସତୋ ସମୟ ଯାଇ, ତାର ମନ୍ତ୍ର ଧରଚ ହୟ, ଶିକଡ଼େର ଗଞ୍ଜ ଉବେ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଗୋଖରୋଟା କାବୁ ହୟ ନା । ଏଦିକେ ଥିଦେଇ ଚୋ-ଚୋ କରଛେ ପେଟ, ଦୁପୁର ଗଡ଼ିଯେ ବିକେଲ ହୟେ ଗେଛେ । ସତ୍ତୀପଦ ବଲେ, ଚଲୋ ଶୁରୁ, ଆଜ ଆର ହବେ ନା, କାଲ ଆବାର ଆସବୋ ।

କିନ୍ତୁ ଲୟିନ୍‌ଦରର ତଥନ ରୋଥ ଚେପେ ଗେଛେ, ପଦ୍ମା ତାର ସଙ୍ଗେ ଏରକମ ଲୁକୋଚୁରି ଖେଲେଛିଲ, ଏହି ମା ମନ୍ଦିର ଜୀବଟାଓ ଠିକ ଏକଇ ରକମ ଖେଳା ଖେଲଛେ । ଲୟିନ୍‌ଦରର ଚୋଥ ଦୁଟୀ ଭାଁଟାର ମତୋ ସୁରତେ ଥାକେ । ସେଇ ଭୋରବେଳା କାଲୀନାରାଯଣପୂରେ ଗିଯେଛିଲ, ତାରପର ଥିକେ ଏହି ଟାନା ପୋଡ଼େନ । ଗାୟେ ମୁଖେ ଟଲଟଲ କରଛେ ଘାମ, ଘନ ଘନ ଶାସ ଫେଲଛେ, ଲାଲଚେ ହୟେ ଉଠିଛେ ଦୁଟୀ ଚୋଥ । ଏକଟା ପ୍ରଚାନ୍ଦ ନେଶା ତାକେ ଦାଲାନେର ଏକଥାନ୍ତ ଥିକେ ଆରେକ ପ୍ରାଣେ ଛୁଟିଯେ ନିଯେ ଯାଚେ ।

ବାଡ଼ା ଚାର ଘଣ୍ଟା ଲଡ଼ାଇ ଚାଲାନୋର ପର ଏକଟା ଖୌଦଲେର ଭେତର ଥିକେ ପଦ୍ମଗୋଖରୋଟାର ଟୁଟି ଟିପେ ଧରେ ଟେନେ ବାର କରଲ ସେ । ଦଢ଼ାମ କରେ ଶାନେର ମେରୋତେ ଫେଲିତେଇ ବିଶାଳ ଫୃଣା ତୁଲେ ଦାଁଡାଲ ଓଟା, ଏକେବାରେ ତାଜା, ଚକଚକେ, ସୋନାଲୀ

ରଙ୍ଗ । ଲଖୀନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର କରିଲ, ଓଟା ସାପିନୀ ନଯ, ସାପ । ବୋଧ ହୁଏ ମରଦ ବଲେ ତାର ଫୋସଫୋସାନିଓ ଭୟକ୍ଷର । କିନ୍ତୁ ଲଖୀନ୍ଦରର ଗାୟେ ବେଦେନୀର ରଙ୍ଗ ଆଛେ । ଅଞ୍ଚକଣେର ମଧ୍ୟେ ସାପଟା ତାର କୌଣ୍ଡି ଜଡ଼ିଯେ ଲେପଟେ ଥାକେ ଗାୟେର ସଙ୍ଗେ । ଘରେ ଫିରିତେ ଫିରିତେ ଭାବିଲ, ପଥ କି ଏକେ ଦେଖିଲେ ହିଂସେଯ ଜୁଲବେ । ପଥକେ କୌଣ୍ଡି-ଗଲାୟ ଜଡ଼ିଯେ ସଥିନ ମେ ତାର ଶଞ୍ଚାଚୂଡ଼, ରଙ୍କକାନଡ଼ କିଂବା ବୀଶବୁନେ କେଉଁଟେଟାକେ ଝାପି ଥିକେ ବାର କରେ ଘରେର ମେବୋଯ ରାଖେ, ଓଦେର ନିଯେ ଖେଳା କରେ, କିଂବା ଓରା ତାର ମାଲିକକେ ଏକଟୁ ସୋହାଗ ଜାନାଯ, ଅମନି ପଥ ଫୋସ-ଫୋସ କରେ ରାଗ ଜାନାତେ ଥାକେ, ଲଖୀନ୍ଦରର ଗଲାୟ ଆରୋ ଶକ୍ତ କରେ ଫୀସ ଜଡ଼ାଯ । ଏକଦିନ ତୋ ଏକଟା ଶାୟକଭାଙ୍ଗ କେଉଁଟେର ସଙ୍ଗେ ବାଗଡ଼ା ଲାଗିଯେ ଦିଲ । ସେତେ ସେତେ ସତୀପଦକେ ବଲଲ, ‘ବୁଝାଲି ସତୀପଦ, ଏଟାକେ ଦେଖିଲେ ଆମାର ପଥ ଥୁବ ଗୋସା କରବେ ।’

ଶତୀପଦ ଏସବ ବୋବେ ନା, ବଲଲ, ‘ଓଟାର ବିଷଦୀତ ଦେଖେଛୋ, ଶୁରୁ, ବିଷେ ଟଙ୍ଗ ହୁଯେ ରଯେଛେ, ଶହରେ ଖବର ଦେବେ ନାକି !’

ଲଖୀନ୍ଦର ହାସେ, ‘ତୋର ଶୁଧୁ ଟାକା ଆମଦାନୀର ଫିକିର । ବରଂ ଏର ବିଷଟା ଜିବେ ନିତେ କେମନ ଲାଗେ, ତା ଦ୍ୟାଖ ଦିଲି ।’ ବଲେ ସାପଟା ତାର ଗଲା ଥିକେ ଖୋଲାର ଭଞ୍ଜି କରେ ଅମନି ସତୀପଦ ଚିକାର କରେ ଓଠେ, ‘ଦୋହାଇ ଶୁରୁ, ଏକେବାରେ ମରେ ଯାବୋ । ଆଗେ ତୋମାର ବିଦ୍ୟେଟା ଶିଖିଯେ ଦାଓ, ତଥନ ତୋମାର ମତୋ ଅମନ ପଦ୍ମଗୋଖରୋ ନିଯେ ଆମିଓ ବିଛନାଯ ଶୋବୋ ।’

ଲଖୀନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରରା କରେ, ‘ଗୋଖରୋ ନିଯେ ବିଛନାଯ ଶୁବି, ତୋ ତୋର ବଟ କୋଥାଯ ଶୋବେ ?’

ମନ୍ତ୍ରରାଯ ଯୋଗ ଦେଇ ସତୀପଦ, ‘ବଟୁଓ ଶୋବେ, ଗୋଖରୋଓ ଶୋବେ, ଦୁଜନ ଦୁ’ପାଶେ ।’ ହେସେ ଓଠେ ଲଖୀନ୍ଦର, ଗଲାୟ ଝୋଲାନୋ ସାପଟାର ଲେଜ ଆଡୁଲେ ଜଡ଼ାତେ ଜଡ଼ାତେ ବଲେ, ‘ଦୂର ବୋକା, ଓରା ଯେ ସତୀନ, ଏକସଙ୍ଗେ ଘର କରେ ନା । ସାପଘରେର କାହେ ଦିଯେ ଦିଲ, ‘ଏବାର ଚଲି ଶୁରୁ । କାଳ ଏକଟା ନତୁନ ଝାପି କିନେ ଏନେ ଦେବ ।’ ବଲେ ସେ ଘରମୁଖେ ହାଁଟା ଦେଇ । ଲଖୀନ୍ଦର ଏବାର ତାର ଶିକଳ ଖୁଲେ ଘରେ ଢେକେ । ରଙ୍କକାନଡ଼ଟାକେ ଛେଡ଼େ ଦିତେ ସେ ଠିକ ତାର ଝାପିର ଡାଳା ସରିଯେ ଭିତରେ ଢୁକେ ଯାଯ । ଏଦିକେ ନତୁନ ପଦ୍ମଗୋଖରୋଟାକେ ଦେଖେ ପଦ୍ମର ଅଞ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର । ଅନ୍ୟଦିନ ସେ ଘରେ ଢୁକଲେଇ ପଥ ତାର ବୁକେ ଝାପିଯେ ପଡ଼େ ତାର ଠୋଟେ, ଗାଲେ, କପାଲେ ଜିବ ବୁଲିଯେ ଭାଲୋବାସା ଦେଇ । ଆଜ ଯେନ ସେ ଲଖୀନ୍ଦରେ ଗାୟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଞ୍ଜ ପେଯେଛେ, ଆର ସେଇ ଗଞ୍ଜ ନାକେ ସେତେ ତାର କି ଝାପା-ଝାପି, ଫୋସଫୋସାନି । ଦୁ-ତିନିବାର ଛୋବଲ ମାରଲୋ ଲଖୀନ୍ଦରେ ବୁକେ, କପାଲେ । ଲଖୀନ୍ଦର ଆଜ ତାକେ ସାମାଲ ଦିତେ ହିମସିମ ଖେଯେ ଗେଲ । ହେସେ ବଲଲ, ‘ବାପରେ, ମେଯେର କି ତେଜ ?’ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ମଗୋଖରୋ ଦୁଜନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ ନିର୍ଗମେର ଦୃଷ୍ଟିତେ । ଲଖୀନ୍ଦର ଅବାକ ହଲୋ, ବୁଝାତେ ପାରଲୋ ନା ଦୁଜନେର ଚୋଥେର ଚାଉନିର ଭାଷା, ଏକଟୁ ପରେ ଦୁଜନେଇ ଫଣ ନାମିଯେ ଦୁପାଶେ ସରେ ଗେଲ ।

কদিনের মধ্যেই বোৰা গেল নতুন পদ্মগোখৰোটার রেশ তেজ আছে। তা সত্ত্বেও লখীন্দৱের বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়ল। ষষ্ঠীপদ একদিন শহরে বাবুদের ধৰে এনে বেশ খানিকটা বিষ বেচে দিল তার। নতুন গোখৰোটা লখীন্দৱকে বেশ পছন্দ করছে দেখে কিন্তু পদ্ম তাকে মোটেই হিংসে কৱলো না, বৱং সেও নতুন সাপটাকে বেশ পছন্দ কৱতে লাগলো। আশৰ্চ্য, পদ্ম কি হঠাৎ ভালো মেয়ে হয়ে গেল?

৫

ষষ্ঠীপদ একটা মজার খবৰ দিল। লখীন্দৱের কাছে খবৱটা বেশ মজার বইকি। শহরের এক বাবু নাকি সাপ পোষে। মন্ত্ৰ বড় দালানবাড়ি, কিন্তু সারা ঘৰের দেয়ালে সাপের ছবি সাপের ওপৰ মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বই, বাবু সারাদিন সাপ নিয়ে পড়াশোনা কৱে। তার ঘৰে অনেকগুলো কাচের বয়ামে সাপ রাখা আছে, নানান ধৰনের কাচের বয়ামগুলোকে নাকি অ্যাকোরিয়াম বলে। সেই বাবু নাকি একটা গোখৰো সাপ কিনতে চায়। তার জন্যে মোটা টাকা দেবে।

লখীন্দৱ সাপ ধৰে বটে, কিন্তু সাপ বেচে না কখনো। হয় তার ঝাপিৰ মধ্যে রাখে, নচেৎ পছন্দ না হলে মাঠেঘাটে ছেড়ে দেয়—যা মা মনসাৰ জীৱ, চৰে থা।

ষষ্ঠীপদ বড় বড় চোখ কৱে বলে, একদিন দেখবে চলো শুৰু, কি সোন্দৱ দেখতে কাচের বয়ামগুলান। অমনি কটা বয়াম তোমার জন্যেও কিনে দেবো। তোমার তো অনেক সাপ, কটা বেচে দাও। কাচের বয়াম কিনে ঘৰে সাজাই।

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ে লখীন্দৱ, উষ্ট, সাপের গুণিন আমি, সাপ বেচতে নেই। মা মনসাৰ গৌসা হবে।

শহরের বাবু সাপ নিয়ে লেখাপড়া কৱে শুনে অবাক হয়ে যায় লখীন্দৱ, সাপ নিয়ে আবাৰ লেখাপড়া কৱা যায় নাকি। আশৰ্চ্য তো! সে তো সাপ নিয়ে তার জীৱন কাবাৰ কৱতে চলল, তা নিয়ে আবাৰ বই হয় তা তো সে জানতো না। মানুষ যে কতৰকম ধ্যানাটি জানে।

লখীন্দৱেৰ কথা শুনে ষষ্ঠীপদ মুষড়ে পড়ে, তুমি তো ইচ্ছে কৱলৈই অনেক সাপ ধৰতে পাৱো শুৰু, কটা, সাপ বেচলে কিছু যাবে আসবে না।

কিন্তু লখীন্দৱেৰ সেই এক রা, সাপ বেচবো না। ষষ্ঠীপদ ফাঁপৱে পড়ে। বোঝে না তার শুৰু অত বেশি কৱে তার পোষ্যপুতুৱেৰ ভালোবাসে কেন।

দু-একদিনেৰ মধ্যে লখীন্দৱেৰ মনে হল, পদ্ম আৱ তাকে আগেৱ মতো সোহাগ দিচ্ছে না, বিছানায় তার সঙ্গে জড়াজড়ি কৱে না, কেমন যেন নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে থাকে। মাৰাতে সে পদ্মকে সোহাগ দেয়, তার ঠোট নিজেৰ ঠোটেৰ মধ্যে

নেয়, কিন্তু পদ্ম আর চুমো দেয় না তাকে, গায়ে জড়ায় না, বুকের উপর ফণা তুলে নাচ দেখায় না। হল কি পদ্মর? লখীন্দরের অভিমান হয়, রাগ হয় পদ্মকে হঠাতে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেবোতে যা ভাগ, ছুড়ি, তুই মেবোয় শয়ে থাক, তর বেছানা মানায় না।

কদিন এরকম মান-অভিমানের পালা চলল, গুটি-গুটি সাপটা তার বিছানায় উঠে এলো। লখীন্দর আর তাকে কাছে নেয় না, কাঁধে-গলায় জড়ায় না। চুপচাপ তার বিছানায় পড়ে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। ষষ্ঠীপদ একদিন ডাকতে এসে প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে চলে গেল। বুঝতে পারল না। গুরুর মেজাজ এত তিরিক্ষি কেন?

একদিন মাঝরাতে ফোস-ফোস শব্দ শুনে লখীন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। নিশ্চিতি রাত সমস্ত ঘরে ডঁই হয়ে জমে আছে। চালের একটা খড়ও চোখে নজর কাড়ে না। ফোসফোসানি শব্দটা আসছে ঘরের কোণ থেকে। কি মনে হতে উঠে বসলো লখীন্দর। ষষ্ঠীপদ শহর থেকে তাকে একটা লাইটার কিনে এনে দিয়েছিল, তার ছেট্ট চাকাটা ঘোরাতেই ফস্করে আলো জ্বলে ওঠে। খাট থেকে নেমে অঙ্ককার হাতড়ে ঘরের কোণের দিকে যায় সে। মনে হল কি একটা গুঁক বেরুচ্ছে ঘরে, গম্ভটা তার খুব চেনা। ফস্করে লাইটার জ্বালাতেই দেখল, ঠিক যা ঠাহর করেছিল তাই। পদ্ম তার বিছানা থেকে নেমে নতুন সাপটার চারপাশে ঘূরঘূর করছে, যার মধ্যে সদ্য ধরে আনা পদ্মগোথরোটা রাখা আছে।

মাথাটা গরম হয়ে গেল লখীন্দরে। বুকের মধ্যে একটা বিষ-পর্ণিপড়ে কুটুস করে কায়ড় দিল। গত ক-বছরের মধ্যে যা ঘটেনি, হঠাতে পদ্মর এমনধারা হয়ে যাওয়াতে তার চোখের সামনে একটা বিদ্যুৎ বিকমিক করে খেলে যায়, কি রে পদ্ম, তোর খুব গুমর হয়েছে, তাই না? আমার বেছানায় তর আর ভালো লাগে না!

লাইটার জ্বালাতেই পদ্ম হতচকিত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়ালো, তারপর লখীন্দরের পায়ে জড়িয়ে সোহাগ জানাতে শুরু করে, যেন পদ্ম খুঁজে পাচ্ছিল না লখীন্দরকে, এখন দেখতে পেয়ে পা থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে গায়ে ওঠে, গালে জিব বুলিয়ে দেয়। লখীন্দরের রাগ তৎক্ষণাতে নেমে যায়, গলে জল হয়ে যায় তার অভিমান। পদ্মকে বিছানায় নিয়ে চলে আসে, পদ্মর পিছিল শরীরে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়—পদ্ম রে, দেখ, তরে কতো ভালোবাসি, আমি, তর জন্যে আরেকটা বউ আনি নাই। নইলে গোলাপী আমারে অমন একটা দাগা দিল।

পদ্ম ওর বুকের ওপর ফণা তুলে দাঁড়ায়, মাৰো-মাৰো লতিয়ে নেমে চুমু খায় ওর গলায়, গালে। অস্তুত সুখ পায় লখীন্দর। ঘোরা রাত আরো ঘনঘোর হয়ে আসে। বাইরে ঝিরি ঝিরি তাকে শিশির পড়ার মতো টুপটাপ শব্দ হয়।

তোৱে উঠে পদ্মকে বলল, “তুই তোৱ ঝাপিৰ মধ্যে আজ সারাদিন থাকবি। আমি শহরে যাচ্ছি।” বলে পদ্মকে তার ঝাপিৰ মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। প্রথমে মুখ,

তারপর সরসর করে তার সমস্ত শরীর, তারপর লেজ, আস্তে আস্তে পদ্মর শরীর ঝাঁপির মধ্যে চলে যায়। শহরে বেরক্ষণার আগে নতুন পদ্মগোখরোটার ঝাঁপির উপর দুটো থান ইট চাপা দেয়। লখীন্দ্র ভাবে, পদ্মটার হঠাতে কি নোলা ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন পদ্মগোখরোটা মদ্দা সাপ, সাপেদের মধ্যে মরাদ। এমন একটা মদ্দার গন্ধ পেয়ে পদ্ম কি তার জাতপুরুষকে খুঁজে পেলো। আর লখীন্দ্র যে এতকাল ওকে তার সোহাগ আর ভালোবাসা দিয়ে আসছে, সেটা কি পদ্মর মনে নেই? হঠাতে লখীন্দ্র ভাবল, এসব কি এলোমেলো ভাবছে, হয়তো নেহাতে খেয়ালবশে পদ্ম তাদের নতুন অভিথির তালাশ নিয়ে গিয়েছিল।

আসল তার মনের এই যে বিষ পিংপড়েটা, তা চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে গোলাপী। নইলে আগে সে এমনধারা ছিল না। গোলাপী তো তার সামনেই নগারির সঙ্গে কতো রসের কথা বলেছে, সে তো কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি গোলাপীর মনে অন্যরকম ছিল। নতুন পদ্মগোখরোটা লখীন্দ্র বেচে দেবে, এই খবর শুনে ষষ্ঠীপদ লাফিয়ে উঠল। চলো গুরু, শহরে যাই, বাবুটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

সাপ নিয়ে লেখাপড়া করা বাবুটার সঙ্গে লখীন্দ্রেরও কথা বলার খুব ইচ্ছে। সে সাপের শুণিন, প্রতিটা সাপের নিষ্পাস সে চেনে, তার চে' বেশি আর কে জানে।

সেই কথাই বলল শহরে বাবু। লোকটার এককাঁড়ি বয়স না, মুখে ছেলেমানুষ ভাব। ঘরের চারপাশে অ্যাকোয়ারিয়াম, তার মধ্যে বেশ কটা সাপ, একটা কেউটে, একটা লাউটডোগা, একটা চিতে। টেঁড়া আর মেটে সাপও রেখেছে কটা। দেখে লখীন্দ্রের হাসি পায়। নির্বিষ সাপ কেউ বয়ামে রাখে। মাঠে ছেড়ে দাও, চরে থাক। দেয়ালে কতোরকমের সাপের ছবি, আলমারিতে কতো বই। টেবিলে দু-খানা বই-এর মলাটেও সাপের ছবি আঁকা।

শহরে বাবুটা তাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল, কত সব খবর জানতে চায়। লখীন্দ্রের জীবন ভর জানার জগৎ সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বার করে আনছে, সাপের নাডিভুড়ির খবর। বাবুটা তার সঙ্গে যত কথা বলেছে, ততই উত্তেজনায়, উৎসাহে লাফিয়ে উঠছে। লখীন্দ্র নাকি একটা হীরের খনি, তাকে খুঁজলে জগৎ সংসার নাকি চমকে যাবে।

পদ্মগোখরোটার দাম ঠিক হল মোটা টাকার। লখীন্দ্র যদি তাকে আরো সাপ ধরে দেয়, তবে ভালো দাম দিতে সে দ্বিধা করবে না। লোকটা আরো বলল, একদিন সে লখীন্দ্রের সাপঘর দেখতে যাবে।

শহরে বাবুকে লখীন্দ্রেরও বেশ ভালো লেগে যায়, ষষ্ঠীপদকে বলে, ওই পদ্মগোখরোটার সঙ্গে আরো কিছু সাপ দিয়ে আয় ষষ্ঠীপদ। আরামে থাকবে, খাবে। বাবু মন্ত বড়লোক, আর বেশ সমবাদার।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। ঘষ্টীগদ ফেরার পথে হোটেলে খাবার প্রস্তাৱ দিয়েছিল। কিন্তু লখীন্দৰ রাজী হয়নি। হয়তো পঞ্চাং এতক্ষণে মুখে কুটোটি কাটেনি। অনেকক্ষণ ধৰে যে বিষ পিংগড়েটা কামড় দিছিল, এখন তাৰ ধাৰ একটু ভোঁতা। নতুন পঞ্চগোখরোটা বিদেয় হবে ভেবে স্বস্তি পায়। মনে মনে বলে, তৰ কোন দোষ নাই রে, পদ্ম। ঘৱপোড়া গৰু সিংহুৱে মেঘ দেখলে ডৱায়। গোলাপটা বাজারে মেয়ে ছিল। বেবাজিঁয়া হয়ে গেছে, বেশ কৰেছে।

একৱাশ ঘাম, ঝাণ্টি আৱ ভাবনা মাথায় নিয়ে দৱজা খুলল লখীন্দৰ। ঘৰে চুকেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে তাৰ হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল। শৱীৱেৱ কোথাও উপছে পড়ল একবলক রঞ্জ, অথবা রঞ্জেৱ ভিতৱে একটা ঘূৰ্ণি টাল খেয়ে গেল। ঘোৱলাগা চোখে দেখল, মেঘেৱ উপৱ একজোড়া সাপ। প্রায় লেজেৱ উপৱ ভৱ কৱে শৰ্ষ লেগেছে। দুটো সোনালী সুতোৱ রেখা, নড়েচড়ে ঘৱেৱ মধ্যে বিদ্যুতেৱ রঙ ছড়াচ্ছে। অমন সোনারঙ দুটো সাপেৱ শৰ্ষ দেখে লখীন্দৰ অন্য সময় হলে মুক্ষ হত, পৱিবৰ্তে তাৰ শৱীৱে চাবুক মারতে লাগল কেউ। তুই পদ্ম, তুই এমনধাৰা,—

পঞ্চাং লখীন্দৰকে দেখে এক মুহূৰ্ত চমকে গিয়েছিল। তাৰ চোখ আৱ জিব মেলে একবাৱ তাকাল লখীন্দৰেৱ দিকে, কিন্তু তখন তাৰ শৱীৱ ভত্তি ভালোবাসা আৱ কাম। নতুন পঞ্চগোখরোটাও তাকে ছাড়বে কেন! এক লহমা থেমে আবাৱ শৱীৱে টক্কাৱ তুলল তাৱা, লেজেৱ উপৱ ভৱ কৱে সৱে সৱে যেতে লাগল লখীন্দৰেৱ কাছ থেকে। সেই মুহূৰ্তে লখীন্দৰ তাৰ বিছানাৱ তলা থেকে বাৱ কৱল একটা হাঁসুয়া। চোখেৱ পলক না ফেলতে বলকে উঠল চকচকে ফলাটি, আৱ মেঘেয় আছড়ে পড়ল দুটো সাপেৱ কাটা মুণ্ডু। লাল টকটকে চোখে সেদিকে তাকিয়ে হিংস্রভাৱে লখীন্দৰ বলে ওঠে, তালৈ তুইও গোলাপীৱ মতো।



পরকীয়া অঞ্জলি চক্ৰবৰ্তী

আসলে সেটা ছিল একটা গল্প। গল্প নয়তো কি? এও কি কখনো সন্তুষ? চেনা নেই জানা নেই হস করে একটা লোক আপন হয়ে গেল—একি সিনেমা না কি? নায়কের সঙ্গে চলতি পথে নায়িকার ধাক্কা লেগে গেল, তারপরই শুরু হলো বাইকে চেপে প্রেম, তাও আবার বিবাহিতা একটা মেয়ে, যার স্বামী সংসার ছেলে মেয়ে সবই বৰ্তমান। না, না, সুস্থি এটাকে কিছুতেই সত্যি বলে মানতে পারছে না। আবার ঘটনাটা গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারছে না। কোন্ এক অলৌকিক ঘটনায় একটা মানুষ কত কাছে এসে গেল, তাকে সে ভুলবে কি করে? আর সেই রাতটাকেই বা অস্বীকার কৰবে কোন্ মনের জোরে?

সুস্থির জীবনটা বৰাবৰই একটা অগোছালো প্ল্যাটফর্মের মতন। সাধাৰণ আৱ পাঁচটা মেয়ে যখন দৈব বা আশুব্ধাক্য মেনে স্বামী পুত্ৰ নিয়ে সুখে ঘৰ-সংসার কৰছে, সে-সময় ও সুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। আসলে সুখ জিনিসটা কি সেটাই ও আজও বুৰে উঠতে পারলো না। মহাভারতে যুধিষ্ঠিৰ অবশ্য বলেছেন অঞ্চলী আৱ অপবাসীৱাই সুখী। অৰ্থাৎ যে নিজেৱ দেশে বাড়ি বানায় আৱ সোপার্জনে জীবন-যাপন কৰে সেই সুখী। এই যদি সুখেৰ সংজ্ঞা হয়, তবে তো অৱশ্যাভক্তে নিয়ে ওৱ যথেষ্ট সুখী হবাবৰই কথা। অৱশ্যাভ, মানে সুস্থিৰ স্বামী, একটা বড়ো কোম্পানিৰ একজিকিউটিভ অফিসার, সকাল দশটা থকে পাঁচটা তাৱ সামনে বসে থাকে পি.এ. মিস্ সায়নী মিত্র। শুধু অফিসে নয় দৰকার হলো অফিসেৰ বাইরেও শাপিং-এ সাহায্য কৰে। এহেন অৱশ্যাভ একদিন কথায় কথায় সুস্থিকে বলেছিলো।

—তুমি তো মনটা কৰে রাখলো সোনায় মোড়া হীৱেৰ মতন, অনামিকা থেকে কেবলই দৃতি ছড়াচ্ছে। কিন্তু কাৱো দৃতি গ্ৰহণ কৰতে শেখনি। নিজেকে বিলোতে গেলে অন্যকেও গ্ৰহণ কৰতে হবে। না হলে লাইফ এন্জ়েয় কৰতেই পারবে না।

এই লাইফ এন্জ়েয়েৰ ব্যাপারটা সুস্থিৰ মাথায় একেবাবেই আসে না। সুস্থি অৱশ্যাভেৰ কথাটা মাঝে মাঝে ভাবে। হয়তো তাৱ নিঃসঙ্গতাৰ এটাও একটা

কারণ। তার জীবনটা বড়ো একপেশে, দেওয়ালে আঁটা ক্যালেগুরের মতন। ইউনিভারসিটির বস্তুদের মধ্যে একমাত্র অসীমকেই ওর একটু ভালো লাগতো; অসীমের মধ্যে কেমন যেন একটা কবি কবি ভাব ছিলো, বেধহয় বাংলায় এম.এ. করে ওটা ওর সহজাত হয়ে গিয়েছিলো। এককালে সুস্মির ওর কিছুটা পছন্দও ছিলো। আজও হয়তো তার কিছু রেশ রয়ে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার যাওয়া-আসার অকারণ আধিক্য দেখলে। তবে সুস্মি ওকে তেমন একটা পছন্দ না করলেও একেবারে অপছন্দ করে না। কারণ অসীমের সমসাময়িক সাহিত্যচর্চা ও জীবনচর্চা নিয়ে সরস আলোচনা ওর ভালোই লাগে। আশপাশের যে সব প্যান-প্যান ঘরোয়া আলোচনা তার চেয়ে এগুলো অনেক ভালো বলেই মনে হয়। শুধু আলোচনা নয়, মাঝে মাঝে অসীম সুযোগ মতো সুস্মিরে উপদেশও দিয়ে বসে। সুস্মির মধ্যে জীবনের ঘাটতি দেখলে বলে, দেখ সুস্মি, বার্ধক্য আর বৃদ্ধত্ব এক নয়। বয়স আমাদের বার্ধক্য এনে দেয় আর বৃদ্ধত্ব আসে মন থেকে। দেখনা আমরা যে লেখালেখি করি, সাহিত্যের মাধ্যমে যে চরিত্রসৃষ্টি করি, তাদের সজীব করি, সুন্দর করি, এককথায় যৌবনের দৃত করে তুলতে পারি, তার কারণটাই হলো আমরা মনে মনে সবাই যুক্ত, তা যদি না হতো তবে আমাদের সৃষ্টি সব চরিত্রই লোলচর্ম হয়ে লাঠি ধরতো।

অসীমের কথাগুলোর মধ্যে বেশ যুক্তি আছে। কথাগুলো শুনতে সুন্দর। সুস্মির ইচ্ছে করে এই বয়সেও এক একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে নিজেকে দেখে। আসলে এক-একটা মানুষ থাকে যাদের চোখে থাকে সর্বনাশের আলো, আর গায়ে থাকে প্রেম-প্রেম সুগঞ্জি। সুস্মি এই সব লোকগুলোকে খুবই ভয় পায়। মনের ব্যাপারে ও একটা বেশি রকম স্বার্থপর। ওর মতে যে যার মতন থাকাটাই ভালো। বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ নেই। জীবনটা যাপন করার জন্যে অবশ্যই। তবে তাকে প্রাণপনে আঁকড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। বাইরেটা যে কোনও ভাবে চলে গেলেই হলো। কিন্তু ভেতরটাতে বেশ একটা গল্প করার জায়গা থাকা চাই, সেখানে থাকবে তার স্বনির্বাচিত গল্প করার মতো, আজ্ঞা-দেওয়ার জায়গা। অথবা কোনও পছন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মনে মনে আজ্ঞা দিতে ওর খুব ভালো লাগে। তাই বাইরের কোনও লোককে সহজে ওর মনেই ধরে না। এহেন সুস্মির কিনা পরকীয়া রোগ? তাও আবার কবি নয়, সাহিত্যিকও নয়, এমন কি নিদেন পক্ষে তার মতন সামান্য রিপোর্টারও নয়। একেবারে অচেনা অজানা লোকের প্রেমে ঢুবে যাওয়া। না-না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়, এভাবে মনকে প্রশ্ন দেওয়া যায় না। কাগজের জন্যে বেশ কিছু ফিচার লেখা বাকি। সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছে। মাথার ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে বেশ কিছুদিন কাটানো গেছে। কিন্তু এবার তো টাকায় টান পড়বে। তাদের মতন ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারদের ভবিষ্যৎ তো ঐ কাজের ওপরই নির্ভরশীল। দু-একটা ব্যক্তি ইন্টারভিউ নেওয়া আছে সেগুলোকে

সাজাতে হবে, একটা সাময়িকপত্রের জন্য একটা আর্টিকেল লেখার কথা, সেটাও এখনো শুরু করা যায়নি, ওকে দেখতে আসার ভিড়ে। তারপর সেই পাহাড়ি জীবনযাত্রা নিয়ে একটা বড়ো রকমের লেখায় হাত দিতে হবে। এই লেখাটির কথা ভাবতে ভাবতেই মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুস্মি হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল সে-সময়ের প্রাত্যহিকতা, ঘর-সংসার সব—সবকিছু।

বাসের মধ্যে আছে সুস্মি। জানলা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে পাথর গাছ নদী কখনো কখনো মেঘ। ওর ইচ্ছে করছিলো নেমে একটু ছোঁয়া, কিন্তু সঙ্ঘের মধ্যে নিচে ফিরতে হবে, তাই ড্রাইভার কোথাও দাঁড়াতে রাজি নয়। সুস্মির অবশ্য এই আসাটা প্রথম নয় এর আগেও ও একা একা এসেছে অনেকবার। তবু যতবারই আসে ততবারই নতুন লাগে এই সব পাহাড়ি নদী পথ জনপদ। তাই যতটা পারে দু-চোখ দিয়ে শুবে নেওয়ার চেষ্টা করে। গাড়ি নামছে ঢালু পথে, দুপাশের পাহাড় আর খাদের মধ্যে চলছে লুকোচুরি খেলা। সঙ্ঘে হয়ে আসছে। ড্রাইভার একটু স্পিড তোলে গাড়িতে, তারপরই প্রচণ্ড একটা শব্দ। গাড়িটা বোধহয় ধাক্কা খেল কোথাও। আর সুস্মির কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আবছা অঙ্ককার। ঘরের আলোয় সুস্মি বুরতে পারলো, একটা সম্পূর্ণ অচেনা বাড়ির মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার মাথাটা যার হাতের মধ্যে ধরা তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকষ্ঠার ছাপ। জ্ঞান ফিরতে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কাঁচের গেলাস থেকে গরম দুধ ওর গালে চেলে দিয়ে বললেন, খেয়ে নিন। এখন একটু ভালো লাগছে তো? সুস্মি ভীষণ লজ্জা পেয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু মাথাটা কি রকম মেন ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ধরে ফেললেন, তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সুস্মির শুয়ে শুয়ে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। ঘরের আসবাব দেখে একেবারেই মনে হলো না সেখানে কোনও মহিলা থাকেন। একটা অস্তুত অজানা অনুভূতিতে চোখ বুজিয়ে নিল। একটু পরেই একজন ঘরে ঢুকলেন। হাতে ব্যাগ। সুস্মিকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে মৃদু স্বরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথায় চেটটা ভালোই লেগেছে। সারতে বেশ সময় নেবে। ভাগিস্য এ অ্যাক্সিডেন্টে আপনার কিছু হয়নি, তাহলে আর আপনার স্ত্রীকে বাঁচানোই যেত না।

আপনার স্ত্রী কথাটা কানে যেতেই চমকে ওঠে সুস্মি, বেশ বিস্ময় নিয়ে তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, কিন্তু সে সময় অস্তুত একটা অনুরোধ এই দুটো কাতর চোখে। সুস্মি বাধ্য হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়, পাশ ফিরে শোয়। ভদ্রলোক ডাঙ্কারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সুস্মির বিছানার কাছে। ওর দিকে একটু ঝুঁকে বলেন, আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোনও উপায় ছিল না, তাছাড়া—

সুস্মি আস্তে আস্তে চোখ তুলে বলে, বলুন তাছাড়া কি?

বিশ্বাস করলুম, আমি আপনার কোন অসুবিধেই করিনি। আসলে কাল রাত্রে গাড়ি এ্যাক্সিডেটের পর আপনার জ্ঞান ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আমার বাড়িতে এনেছিলাম। তারপর ডাঙ্কার লোকজন সব একে একে চলে যেতে একটা পুরো রাত আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোধহয় আপনাকে—

মাথা নীচু করলে ভদ্রলোক। বিড় বিড় করে বললেন, তাই ডাঙ্কারবাবু আপনাকে আমার স্তৰী মনে করাতে ততটা চমকে উঠিনি। আশা করি আমার অসহায়তাটুকু ক্ষমা করে দেবেন। একটু পরে সুস্মির দিকে চেয়ে বললেন, এতে অবশ্য অনেকটা সুবিধে হয়ে গেল। অনেক কৌতুহলী দৃষ্টি সরে গেল আমাদের ওপর থেকে, আর খুব সহজেই আমি আপনার কাছে আসতে পারলাম।

আবার ধাক্কা খেল সুস্মি, কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। ওর শরীর মন দুটোই দুর্বল হয়ে আসছে, পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক একটা প্লাসে আবার একটু দুধ আর দুটো বিস্কুট এনে বললেন খেয়ে নিন। এই সব পাহাড়ি এলাকায় বেশি কিছু তো পাওয়া যায় না। আগে থেকে বলে রাখলে না হয়—

সুস্মি আবার মুখ খুলল, ‘যা পাছি এই তো অনেক।’ ভদ্রলোক কিছু বললেন না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুস্মির দিকে। যেন বিশেষ আপন কাউকে খুঁজছেন। তারপর পরম সাবধানতায় ওকে তুলে ধরে দুধ আর বিস্কুট খাওয়ালেন। এই অসুস্থ শরীরে সুস্মিরও যেন কোথাও একটা পরম নির্ভরতার আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, ‘কাল কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছি। আপনার ব্যাগ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আপনার বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।’

সুস্মি হঠাতে জোরে একটা বিষম খেল। মনে মনে হাঁটতে মোড় পেরিয়ে অন্য পথে চলে এসেছিলো, হঠাতে ভদ্রলোক তার বহুদিনের চেমাপথটা এক ধাক্কায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অকারণেই ওর চোখের কোণদুটো চিক্ক চিক্ক করে উঠলো, সেসময় উনি আনলার সামনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা পোষাক বাতিল করছিলেন। তার দেওয়া খবরটা সুস্মির বাড়িতে ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা এটা জানতে চাওয়া তার কর্তব্য। সমস্ত আনলা নামানোর পর একটা সার্ট চড়িয়ে চাটিতে অতিরিক্ত আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে সুস্মি একটু একটু ক'রে গত রাতের ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলো। ডাঙ্কার বোধহয় যন্ত্রণার জন্যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলো। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু চোখ খুলছিলো দেখেছে একটা মানুষ নির্নিমিত্তে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, সুস্মি যন্ত্রণায় উসপাশ করতেই ধরে শুইয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, ‘আপনি ঘুমোন, আমি তো

আছি। সুস্মি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করেছে ‘আপনি?’

আমি তো কাল থেকে খুশিমতো ঘুমোবো, আজকের রাতটা আমাকে জাগতে দিন পিঙ্গ। সুস্মি আবার তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে।

সকালের গাড়িতেই চলে এসেছে অরুণাভ। সঙ্গে মেয়ে এসেই হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। ওরাও যে-এ-দুদিন খুব টেনসড ছিলো সেটাও জানালো। তবে সুস্মির ফেরাটা ঠিক ছিলো না। সুস্মি আস্তে আস্তে বললো, তিনি তাঁর কর্তব্য করতে পেরেছেন কিনা জানতে গেছেন। অরুণাভ এবার একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, ‘অন্য কোনও অসুবিধে?’ সুস্মি উত্তর না দিয়ে শুধু মাথার ব্যান্ডেজটা দেখাল। অরুণাভ হাহা করে হেসে উঠল, আরে না-না, আমি কি আর সেরকম কিছু—

ইতিমধ্যেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, হাতে স্ন্যাঙ্কের দুটো প্যাকেট। অরুণাভকে দেখে খুব খুশি। সহজ গলায় বললেন, এসে গেছেন দেখছি। নিন মশাই, আপনার জিনিসপত্র বুঝে নিন।

সুস্মি একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক আর ওকে পাঞ্চাই দিচ্ছেন না। উনি তখন অরুণাভকে নিয়েই ব্যস্ত। বললেন, আপনাদের গাড়ি দশটায়। ৮-৩৫, অতএব এই সময়টা কিছুটা জলযোগের কাজে লাগানো যেতে পারে। বলে টেবিলের ওপর খাবারের প্যাকেটগুলো রাখলেন। তিনজনের খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন, কাল থেকে উনি খুবই চাপের মধ্যে আছেন। যতই হোক বিপদের সময় নিজের লোক কাছে না থাকলে—

সুস্মি সমস্ত দৃষ্টিশক্তি এক জায়গায় এনে চেষ্টা করলো কালকের মানুষটাকে খোঁজার, কিন্তু পেল না। কষ্টে ওর চোখে জল এসে গেল। মনে মনে ঝঁপ্রকে বলল, এত ভালো মানুষ গড়ার কি দরকার? একটা প্রচণ্ড অভিমান ওর বুকে চাপ দিচ্ছিল। কালকের সেই লোকটাই আজ তাকে তাড়াবার জন্য কেমন উঠে-পড়ে লেগেছে। কত অভিনয় মানুষ করে। অরুণাভ সুস্মিকে কিছু খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো, সুস্মির গলা দিয়ে কিছুই নামতে চাইলো না।

ভদ্রলোক ট্যাঙ্গি ডেকে আনলেন। ততক্ষণ অরুণাভের গোছগাছ শেষ। নিঃশব্দে ফিরে অত্যন্ত উদাসীনভাবে অরুণাভর হাতে কিছু ওশুপত্র আর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে বললেন, এগুলো রাখুন, পথে একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর ওখানে নিয়ে একটা ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন। আঘাতটা কম হয়নি কিন্তু।

সুস্মি আর একবার স্নান হেসে ওঁর দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারেই দেখছেন না ওকে। বাইরে গাড়ি হৰ্ণ দিচ্ছিল। অরুণাভ পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ভদ্রলোককে বললেন, আপনার খণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারবো না। তবু বলছি অন্তত ওশুধ আর ডাক্তারের খরচ হিসেবে যদি

এটুকু রাখেন। এবার ভদ্রলোক চট করে একবাবে দেখে নিলেন সুস্মির দিকে। তারপর অরুণাভর দুটো হাত ধরে বললেন, একজন মানুষ হিসেবে একজন মানুষের জন্যে আমি খুব সামান্য কিছু করেছি, আপনার কাছে অনুরোধ, সেই পরিচয়টুকু আমাকে রাখতে দিন।

অরুণাভ টাকাটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর সুস্মিরে ও মেয়েকে নিয়ে আস্তে আস্তে ট্যাঙ্কিতে উঠে বসলো।

ভদ্রলোক অত্যন্ত স্বাভাবিক চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। ট্যাঙ্কি স্টার্ট দিয়েছে, হঠাৎ ভদ্রলোক চিংকার করে বললেন, একটু দাঁড়ান। বলেই ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ওয়াটার বটলটা হাতে নিয়ে। সুস্মির হাতে বোতলটা দিয়ে বললেন, আপনার ওয়াটার বোতলটা, বোতলের সঙ্গে একটা নেমকার্ড—অভীক চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্টো পিঠে লেখা মনে পড়লে খুঁজো। অরুণাভ দেখার আগেই সুস্মি কার্ডটা বুকের মধ্যে গুঁজে নিল, জলের বোতলটা এগিয়ে দিল মেয়ের দিকে। ততক্ষণে গাড়িটা বেশ কিছুটা গড়িয়ে গেছে।



ପରପୁରୁଷ ନାସରୀନ ଜାହାନ

କୁସୁମ ଦେଖିଲ, ସାରା ଚାରାଚର ନୀଳ କରେ ଧେଯେ ଆସତ ଯେସବ ଜାଲାଲି କବୁତର, କି
ଏକ ଧାକା ଥେଯେ ସେଶୁଲୋ କୁଦ୍ର ପିଣ୍ଡେ ଝରାନ୍ତରିତ ହୟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସବ ଶୁନ୍ୟ କରେ
କୋଥାଯ ଯେନ ମିଲିଯେ ଗେଲ । ପାଯେର ତଳାୟ କୁଟକୁଟ କାମଡ଼ ଦିଛେ ବିଷ ପିଂପଡ଼େ,
ଏର ମଧ୍ୟେଇ ଗାହପାଲାର ଓପର ତଥନ ଭର କରଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ।

କୁସୁମେର ତାଲାକ ହୟେ ଗେଲ ।

ଅଚେତନ୍ୟ କୁସୁମ ଏକ ସଂତ୍ରାହ ବାପେର ବାଡ଼ି ମଡ଼ାର ମତ ପଡ଼େ ଥେକେ ଆଟଦିନେର
ଦିନ ଖାଁଡ଼ା ହୟେ ଦାଁଡ଼ାଲ । ଏହି ସାତଦିନ ତାର ଚାମଡ଼ାର ଓପର ଦିଯେ ଗେଲ ଚିରକାଳୀନ
ନିଷ୍ଠର ଗଞ୍ଜନାଶୁଳି, ଯାର ବିଷାକ୍ତ ହଲ ଦୀଘଦିନ ତାର ହଂପିଣ୍ଡକେ ବିନ୍ଦୁ କରତେ କରତେ
ସେଟାକେ ରୀତିମତୋ ଅକେଜୋ କରେ ତୁଲେଛେ । ଏକସମୟ ଅବୋର କାନ୍ଦାୟ ରାତ ରାତ
ଢୁବେ ଥାକତ ସେ । ଶେଷେ ହଂପିଣ୍ଡର କାଜ ଫୁରଲେ କୁସୁମ ସବ ସ୍ପର୍ଶ କରତ ଚାମଡ଼ା
ଦିଯେ ।

ଶାଶୁଡୀ ବଲତ କାନକାଟା ବେହାୟା ।

ଆମୀ ବଲତ ଗାଛେର ଗୁଡ଼ି ।

ସେଇ ପାଟ ଚୁକେ ଯାଓୟାର ପର ସୁଡ଼ୁସୁଡ଼ କରେ ବାଡ଼ିତେ ଏସେ ପା ରାଖତେଇ ମା
ଝରାନ୍ତରିତ ହଲ ଶାଶୁଡୀତେ । ଭାଇଦେର କଥା ନା ହ୍ୟ ସେ ବାଦଇ ଦିଲ । ଛଲଭାଙ୍ଗ ମା
ଦେଉରିତେ ବସେ ହାପାତେ ଥାକଲେ ଚେତନାରହିତ କୁସୁମ ବେଡ଼ାଲେର ମତୋ ଗା ଝାଡ଼ା
ଦିଲ ।

ଜଡ଼ ଶରୀର ଟେଲେ ଲଞ୍ଚା ଉଠୋନ୍ଟା ପାର ହୟେ ସେ ସଥନ ଟଲୋମଲୋ ଦୀଘିର ପାଶେ
ଗିଯେ ବସଲ, ଦେଖିଲ ଚାରପାଶେ ଆନାରସ ଚକ୍ର କି ରକମ କୌତୁଳୀ, ଡ୍ୟାବଡ଼ାବ ।

କୁସୁମ ବୁଝିଲ, ସେ ଚିରଜୀବନେର ଜନ୍ୟ ଅତିଚେନା ବାପେର ବାଡ଼ି ଯାଓୟାର ରାଙ୍ଗାଟା
ହାରିଯେ ଫେଲେଛେ ।

ସେ ଅଚେନା ଦୀଘିତେ ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଟିଲ ଛୋଟେ, ଆର ଜଲେର ଛତ୍ରାକ ତରଙ୍ଗ
ଦେଖେ, ତତକ୍ଷଣ ଦେଖେ, ଯତକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଟି ଭାଙ୍ଗ ଚେଉ ମାଟିର ପ୍ରାନ୍ତ ନା ଛୋଯ ।

ଗରୁର ଦୀର୍ଘସାରି ଧୁଲୋ ଉଡ଼ିଯେ ଆସମାନେର ମତ ଟାନା ରାଙ୍ଗାଟା ଧରେ ସଥନ ଘରେ
ଫିରିଛେ, ଶେଷଦିନେର ମତ ହାଁସ-ମୁରଗିଣ୍ଡିଲୋ ଦିଛେ ପ୍ରାଣ ଫାଟାନ ହାଁକ, ହାଁଟୁର ଓପର

উঠে থাকা ল্যাপটান শাড়ি নিচ দিকে টেনে কুসুম হাই তুলে দাঁড়াল। ভোর থেকে মধ্যরাত অব্দি পরের বাড়িতে ধান সেদ্ধ, মাড়ই যাবতীয় কাজ করতে করতে মার পায়ের প্রতিটি ভাঁজে যেন আজন্ম বিষ জমে গেছে। এটি অনুভব করার ক্ষমতাও সে এক সময় হারিয়ে ফেলেছিল।

উঠানের মাঝখানে খড়ে আগুন জ্বলে চারপাশে বসে পুরো পরিবার। প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতে থাকায় মার ভেতর থেকে সাপিনী ভাবটা কমে এসেছে, তরে যে তালাক দিছে, চাইর দিকে কেউ সাক্ষী আছিল?

কুসুমের কষ্ট স্পষ্ট, বেবাকেই হচ্ছে।

এই প্রশ্নটিই মা এই সাতদিন কুদু হয়ে, হতাশ হয়ে, কামা বিজড়িত কঠে হাজারবার করেছে। কিন্তু কুসুমের উন্নত কিছুতেই তার মনঃপুত হয় না, বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু এই উন্নত দেয়ার ব্যাপারে কুসুমও ক্লান্তিহীন। শরীরে আঁচল ভাল করে টেনে হাত মেলে ধরল গনগনে শিখার ওপর।

মা জোরে নিঃশ্বাস টানতেই কুসুম দেখল তার গায়ের প্রশ্ফুটিত কালো হাড় যেন মড়মড় করে উঠেছে। সেদিক থেকে ভাবলেশহীন চোখ সে স্থাপন করল নিভন্ত শিখার দিকে।

হের পরে তুইই বাইর হয়া আইলি?

না, তাইনের মায় আমার ঘাড়ের মইধ্যে ধইবা—

ঠিক আছে বুঝছি, মাগীরে আমিও দেইখ্যা ছাড়ুম। কুসুমের শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে এই কথা উচ্চারণ করে মা লাঠি দিয়ে নিভন্ত আগুন উক্ষে দিল। গায়ের শরীরের ছাতলা পড়া চামড়া বাপসা আগুনে কেমন চকচক করে উঠল। পরিবারের সবাই নতমস্তকে সেই আগুন দেখছে। আকাশ কাঁপিয়ে উঠলেন ভেঙে পড়েছে রাজ্যের কুয়াশা। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দূর দূর প্রামে পিশাচের মত অঙ্ককার। এর মধ্যেই আচমকা স্পষ্ট হয়, একটি আলোকখণ্ড হাঁটছে। কুসুমের ভয়ার্ত চামড়া শিরশির করে। মহিলা জিন, যে জিন আবার অসম্ভব বদ, এরা হ্যাঁ করলেই ঘুটঘুটে অঙ্ককারে এমন আলো জ্বলে ওঠে। জন্মের পর থেকেই এই সত্য বিশ্বাস করে কুসুম।

একরাতে তেমন এক জিনকে ধরে ফেলেছিল গ্রামের লোক। তার কি অস্তুত জটা চুল, কালো চামড়া, কি রকম হি হি হাসছিল। সবাই তার চুলের গোড়া ধরে চতুর্দিকে সে কি ভয়ঙ্কর চক্র। শেষে নাক-মুখে রক্ত এসে ওর চেহারাকে আরও বীভৎস করে তুলছিল। সেই মহিলা জিনের প্রতি সবার একটিই চাহিদা, তুই হাঁ কর।

ভয়ে পাংশুপায় সেই বদ জিন হাঁ করে। কিন্তু ভেতরে আগুন নেই।

আগুন বাইর কর।

মহিলা শিরা ফাটিয়ে হাঁ করে, আগুন আসে না। এর পর ওকে বেদম মার।

আগুন কই লুকাইছস? মানুষের লগে চালাকি?

তয়ে থর থর করে কাঁপছিল কুসুম। তার কম্পিত চোখের সামনে সেই মৃতপ্রায় জিনের মাথা ন্যাড়া করে সবাই মহা-উৎসাহে অমাবস্যার শীতে পুকুরে ঝুঁড়ে দিয়েছিলো।

পরদিন কুসুম অবাক হয়ে দেখেছিল, পুকুরে তার ছায়ামাত্র নেই। আজও কি তেমন একজন যাচ্ছে? আহারে, সেই জিনের বেদনা প্রকাশের আর্তি হ্রস্ব মানুষের মত ছিল। কুসুম দূর আলোর দিকে হিম চোখে চেয়ে থাকে।

ঝাঁ-দের বাড়িতে ঠিকা ঘির কাজ নিয়ে ক'দিন পরই কুসুম তার চির জীবনের জের টানতে থাকে। পার্থক্য একটাই, রাত এলে যন্ত্রণাময় শরীরটা থেকে কেউ মাংস খুবলে নিতে চায় না। এ যে সৃষ্টিকর্তার দেয়া কি আজব শাস্তি কুসুম বুঁবুঁ পেত না। এই রকম যন্ত্রণার সম্পর্ক ছাড়া নাকি সন্তানও হয় না। সন্তান তাদের হয়েওছিল। দুটো ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ায় ও বাড়িতে তার অবশ্য আলাদা এক রকম কদর ছিল। সেই ছেলে দুটোকে আজরাইল যে কী ইশারা করল! এক দুপুরে গলা জড়াজড়ি করে কোনও এক ফাঁকে অঁথে পানিতে তারা অস্তিম ঢুব দিল।

সারাদিন কাজ শেষে রাতে গভীর শাস্তিতে ঘুমিয়ে থাকে কুসুম। নিজেকে বড় নির্ভার মনে হয়। তেমনই ফাঁপা মহুর্তে আচমকা মনে হল, জালালি কবুতরগুলো কেন অমন পিণ্ড হয়ে শূন্যে মিলিয়েছিল? এই তাবনার পরই চারপাশে গভীর রাত নামল।

আরেকটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে গেঁথে গেল কুসুমের জীবন।

কয়েকমাস পরে এক রাতে কি এক শব্দ। কুসুমের ঘুম ভাঙতেই প্রতিদিনের মত দেহ উজাড় করে প্রকৃতি ডাক দেয়। সারা ঘর জুড়ে সবাই এমনভাবে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়ে আছে এ যেন ঘর নয়, ঘুমের কারবালা।

আড়মোড়া ভেঙ্গে বাঁশের চাটাইয়ের দরজা খুলে কুসুম বেরিয়ে আসল। চাঁদ নেই, কিন্তু কি এক উজ্জল ছায়ায় কুয়াশায় মোড়ান রাত্রি উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ভয়ার্ত কুসুম দূরের দিকে তাকাল, না আলোর ঝুটকি নেই কিন্তু দেউড়ির কাছে কামরাঙ্গা গাছের নীচে ও কিসের ছায়া? কেমন গলাগলি ধরে আছে? বিহুল কুসুম শ্রথ পায়ে এগিয়ে গেল। তবে কি ওর পুত্ররা এসেছে? বুক ভেঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠতেই বাতাস এমন আচমকা ঝাপটা দিল, কুসুম একরকম ছিটকে বাড়ির পিছনের ঝোপের কাছে দাঁড়াল। কঠিন শীতে দু পাটি দাঁত আঠার মত লেগে যাচ্ছে, এর মধ্যে কি রকম কাঁচা লেবুর ছাণ আসছে।

নিজেকে নির্ভার করার প্রস্তুতি নিতেই তার উপর ছলোবেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়লো কেউ। হতচকিত কুসুম কিছু বুঁবুঁ ওঠার আগেই প্রচণ্ড শক্তিতে তার মুখ চেপে ধরল।

কুসুম সেই লোকের চেহারা দেখে সমস্ত হাত-পা ছেড়ে দিল।

দীর্ঘ সময় পর নিজেকে ধাতছ করে কুসুম অবসন্ন কঠে বলল, আফনে এইডা কি করলেন? পচণ্ড গরমে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। গামছা কোমরে কম্বে বেঁধে জামরুল গাছে হেলান দিয়ে হাফিজ নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি ধরাল। এরপর ঠাণ্ডা কঠে বলল—তরে আমি আবার ঘরে তুলুম।

কুসুম সব ছাপিয়ে বিস্মিত হচ্ছিল তার নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে, যাকে সে ভেতরে এতদিন লালন করে এসেছে। কিন্তু নিজেরই অজ্ঞাতে। ধৰল ছায়ায় ওই চিরচেনা একয়েমে মানুষটিকে দেখা মাত্রই সর্বাঙ্গ কেমন বিপুল উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল। কোনও কথা না বলে লোকটি যখন তার দেহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, কুসুমের তখন প্রথমেই মনে পড়ল কঠিন পাপের কথা। যে লোকটি তাকে নিজের সম্পত্তির মতো যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করত, সে এখন দুনিয়ার সমস্ত পুরুষের মতো তার কাছে বাইরের লোক। এর চেহারা দর্শন করাও তার জন্যে পাপ। এই ভয়, তার শরীরে এনে দিল এমনই এক নিষিদ্ধ অনুভূতি, যার তুলনা সে একমাত্র করতে পারে। অস্তুত, মোহগ্রস্ততার সাথে তার শরীর জেগে উঠেছে। অঁধারে ওৎ পেতে থাকা এই মানুষটিকে সে আর চিনতে পারে না। সে বিশ্বাসও করতে পারে না। এই লোকটির সাথে মাসের পর মাস মিলনের তার গোর আজাবের কথা মনে পড়ত।

এক সময় কুসুমের ভেতর থেকে উষ্ণতা অনুর্বিত হয়ে কুয়াশা ঢাকতে থাকে। তার দিক্ব্রান্ত কঠ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আফনে বেবাকের সামনে চিকোর দিয়া আমারে ছাড়ান দিছেন, অহন কেমনে নিবেন?

হাফিজ দৃঢ় কঠে বলে, হেই ব্যবস্থা আমি করুম। ইমাম সাইবের লগে আমার কতা হইছে, তুই তর বাড়িতে বুজায়া ক।

ইমাম সাইব কি কইছেন?

অহনও কতা শেষ অয় নাই, আমি তিনদিন পরে আবার আসুম।

হাফিজের কঠের তীব্রতার মধ্যেই কুসুম আবার তার পরিচিত লোকটিকে চিনতে পায়। উঠোনের মধ্যে তাকে আছড়ে ফেলে যে লোকটি তিনটি শঙ্কে তার আসমান-জমিন দুভাগ করে দিয়েছিল—তার সেই নিষ্ঠুর মুখ মুহূর্তে কুসুমের মধ্যে ঘৃণা এনে দেয়। সে কিছু বলার জন্য হাফিজের মুখের দিকে তাকায়। হাফিজ তখন দাঁড়িয়েছে। তিনদিন পরে রাইতে ঠিক এই সময় আমি আইয়া শিয়ালের মত আওয়াজ দিমু, তুই—।

আমারে আফনের কি দরকার? নিষ্প কঠে উচ্চারণ করে কুসুম, আফনের তাগড়া শরীল, কাম জানেন, গেরামে কত মাইয়া আছে।

হাফিজের কঠ এবার আর্দ্ধ হয়ে আসে, বিরাট সর্বনাশ কইরা ফালাইছিলে। আমি অহন অক্ষরে অক্ষরে বুবাতাছি, তরে ছাড়া আমার জুইৎ লাগে না।

স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া জীবনের প্রথম স্বীকৃতির ধাক্কা সামলে কুসুমের
মনে নতুন ভয় সঞ্চিত হয়, শাড়ির কেউ যদি টের পায়...।

কুসুমের নির্দিষ্ট ছক্রের জীবনের মধ্যে আবার একটা উল্টোপাল্টা লেগে যায়।
তার যন্ত্রচালিত পা টেকির গোড়ায় বিরামহীন চাপ দেয়, কিন্তু সম্মুখের পিষ্ট
ধানের মত তার বুকের ভেতরটার যাবতীয় খোসা অনর্গল ভাঙতে থাকে। বশদিন
পর কুসুমকে কি এক কষ্ট প্রাপ করে। খোসা খুলে পড়তে থাকায় মৃত্যুর মত
হ হ শীত ঢেকে ভেতরে। আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বেহায়া, গাছের গুঁড়ির
জীবনে? ওই লোকের যদি আবার জুৎ নষ্ট হয়ে যায়? এছাড়া এরকম বেশিরিয়তি
কারবার সমাজই বা মানবে কেন?

ঠিক আছে, সমাজ না হয় মানল, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে এরপর
তার অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তিনদিন পর অঙ্কুকার বৃক্ষের নীচে বসে ফিসফিস করে কুসুম এমন আশঙ্কার
কথাই ব্যক্ত করল। হাফিজ একটি নতুন শাড়ি কিনে এনেছে। তার এই জাতীয়
নতুন ব্যবহার, শাড়ির অভিনব ঘাস কুসুমের সবকিছু বিশৃঙ্খল করে তুলল, হাফিজ
বলল, দরকার হইলে আলাদা ঘর তুলুম। আমি কি আমার মা-বাপেরডা থাই?

আফনে নতুন দেইখ্যা একটা বিয়া করেন।

তাতে তর খুব সুবিধা আয়? উষণ কঠে হাফিজ বলে, চেহারা আছে, নতুন
মানুষ ধরবি। চেহারা গতর? কুসুমের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। এ সমস্ত জিনিস
তার কোনও কালে ছিল বা আছে এ নিয়ে কতকাল তার মধ্যে কোনও বোধই
নেই। ঢাঙা শরীরটা, যেটা দুসন্তান বিহুয়ে ডিম ছেড়ে দেয়া ইলিশের মত হয়ে
গেছে, সেটাকে তেলচিটচিটে শাড়িতে ঢেকে কোনও রকমে আঝু রক্ষা করে
চলা। সেই বিষাক্ত গঞ্জের মাংসের তলায় স্বামী যখন নিজেকে সেঁধিয়ে দিত,
সে চাইত মৃত দুই সন্তান পুনর্জন্ম নিক, এছাড়া তার স্বামীর বা তার নিজের
কোনওদিন কোনও অবকাশ হয়েছে, ‘গতর’ কিংবা ‘চেহারা’ নিয়ে কোনও কিছু
চিন্তা করার?

হাফিজ আজ শার্ট পরে এসেছে। আলো-ছায়ার খেলা তার চেহারাকে বিচ্ছিন্ন
করে তুলেছে। ঘন ঘন বিড়ি টানে সে, ভাবি একটা সমস্যায় পড়ছিলে কুসুম,
আমার ঘরে যাইতে হইলে তর হিল্লা করন লাগবো। ইমাম সাইবের বহুৎ হাতপাও
ধরছি, তাইনে কন এইডা ছাড়া আর কুনো রাস্তা নাই। কুসুমের পায়ের ওপর
দিয়ে সশব্দে ইদুর লাফ দেয়। সে চাপা কঠে এমন টানা আর্তনাদ করে ওঠে,
নিচের শুকনো পাতাগুলি মড়মড় করে ওঠে। ভাঁজ করা নতুন শাড়ি, মুখের
কাছে চেপে সে নিজেকে সামলায়। তারপরই তার স্তুক কঠ সমগ্র চরাচরে আছড়ে
পড়ে, আমার হিল্লা দিতে হইবো ক্যান? আমি আফনেরে তালাক দিছি?

হাফিজ চাপা কঠে বলে, কিন্তু নিয়ম যে এইডাই। আমার যদি হিল্লা দেওন

লাগতো তয় কি আমি অত চিন্তা করতাম? এক বেড়িরে এক রাইতের লাইগ্যা
বিয়া করন, বিষয়ড়া কি এমন খারাপ! তুই আরেক বেড়ারে বিয়া কইরা হের
বাদে আমার কাছে আইবি, আরেক বেড়ার জুড়া কইরা দেওয়া শরীল লাইয়া
আমার ঘর করবি, বিষয়ড়া বুঝ।

আফনের যদি হিল্লা অইতো তয় আফনে জুড়া অইতেন না?

পুরুষ মাইনবের শইল কুনদিন জুড়া আয়? হাফিজ বিস্মিত চোখে কুসুমের
দিকে তাকায়, তুইতো বহুত কর্তা শিখছস, বিষয়ড়া কি?

শীতে ঠকঠক কাঁপে কুসুম। ওকে টেনে বাঁশবাড়ের দিকে নিয়ে যায় হাফিজ।
কুসুমের পাণুরণ মুখ কুয়ায় ভিজে ওঠে। সে চুলে হাত দেয়, ভেজা। রাত্রি
যে এত আজব কোনওদিন কুসুমের দেখা হয়নি। গোরস্থানও এত নিষ্ঠুর হয়
না। কুসুম বলল, আপনে এইডা কি কন? আমারে হিল্লা করাইবেন? হের বাদে
আফনেগোর কাছে আমার কুনো ইজ্জত থাকবো?

এইডা ছাড়া ত গতি দেহি না, রীতিমতো মুষড়ে পড়ে হাফিজ।

আফনে আমারে বাদ দেন, কোড়ালের কুপ ত দিয়াই ফালাইছেন। অহন মইরা
গেলেও আর জোড়া দিবার পারবেন?

এ বিষয়টা আর তাদের দৃজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কুসুমের পরিবারে,
সমগ্র গ্রামে বিষয়টা আলোচিত হয়। সবার বিরক্তে দাঁড়িয়ে হাফিজের এক জেদে
কুসুমকে সে ঘরে তুলবেই। ধর্মমতে এর জন্যে যা প্রায়শিক্ত করার সে করবে।
গ্রামে শিক্ষিত যে দু একজন আছে তারা হাফিজকে বোঝায়, প্রায়শিক্ত ত
কুসুমেরই হবে তার জীবনটা নিয়ে উল্টাপাল্টা একটা খেলা হবে। এর জন্যে
ত সে দায়ী নয়। হাফিজের মন্তব্য স্বামীর পাপ মানেই স্ত্রীর পাপ। স্বামী কারাগারে
গেলে স্ত্রী বছরের পর বছর আজাব ভোগ করে না? সে যে অপরাধ করেছে
তার দায়িত্ব কুসুমকেও নিতে হবে।

কুসুমের ছিমূল পরিবারও বিষয়টি তুমুল প্রতিক্রিয়ার সাথে গ্রহণ করে।
তারা বলে, কুসুম সারাজীবন দরকার হইলে একলা থাকবো, হাফিজিজ্য মনে
করছে কী? কুসুম তাগোর হাতের খেলার পুতুল? তারা যা ইচ্ছে করবো,
তাই অইবো?

তাদের বাড়ির উঠোনে এসে বদরাগী হাফিজও নতমন্তকে বসে থাকে।
শাশুড়ীকে কোনওদিন সে পাঁচ আনা দিয়েও পোছেনি। স্ত্রীকে নাইওর আসতে
দেওয়ার ব্যাপারেও তার চিরকাল ছিল ঘোর আপত্তি। সে দেখে, আজ তার
বেকায়দা অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাঙও কেমন ঠ্যাং নাড়ছে। সে তার ওপর
শাশুড়ীর বর্ষিত সমস্ত গঞ্জনা সহ্য করে শাস্ত কঠে বলল, কুসুম কি কয়?

মহিলা হাঁপাতে থাকলে তার শরীর থেকে হাঙ্গি চামড়াসহ পাঁচ চক্ষু
বিস্ফারিত হয়। এর মধ্যে হাঁপানির টান থাকায় নিঃশ্বাসে এমন শব্দ হয়, মনে

হয় পেটের মধ্যে থেকে শিঙা ফুঁকছে কেউ। সেই মহিলার মেজাজের ন্যূনতম কিছুও যদি কুসুমের মধ্যে থাকতো, হাফিজ মনে মনে ভাবে, তা হলে পশ্চিমের খালে এতদিনে ওর লাশ ভাসতো।

শাশুড়ী শ্বাস টেনে খনখনে কঠে বলল, ও আবার কি কইবো? ওরে কইবার কিছু রাখছে তুমরা? মুখে চুনকালি দিয়া বিদায় দিছে না?

হাফিজ উঠোনে বসে হাসতে থাকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিস্ফারিত চোখে এই দৃশ্য দেখে ঠাণ্ডায় জমে উঠল কুসুম।

হাফিজ বলে আফনের মাইয়া দুইদিন আগেও রাইতে আমার লগে দেহা করছে। অহন আপনেই বুইঝ্যা দেহেন, এই সমাজের কুনহানে অবে জায়গা দিবেন?

প্রজ্জলিত অগ্নি মুহূর্তে দপ করে নিভে যায়। পরক্ষণেই মহিলার ডেতর নতুনভাবে তা জ্বলে উঠে। তার শরীরে ভর করে বাঘের শক্তি, তিন লাফে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে কুসুমের ওপর মার মার চড়াও হয়।

কুসুমের প্রতিটি আর্তনাদ হাফিজ বিনা প্রতিবাদে কান পেতে শোনে।

দিঘির মধ্যে শুধু কুসুম চিল ছোঁড়ে। ধীরে তরঙ্গ চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়। স্তরপড়া শ্যাওলা লক্ষ্যছত্র হয় নিটোল জলের সাথে মিশে যেতে থাকে। মাথার ওপর একটানা ডাকতে থাকত ভরদুপুরের ঘূঘু। কুসুমের ঘূঘু পায়। নিজেকে বেঢ়ে সে ঘাটের একদম কিনারে চলে আসল। জলের মধ্যে পা ডোবালো। পায়ের গোড়ালি ফেটে লাল মাংসে কেমন মাটি ঢুকে আছে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শিরশিরি করে উঠলে কুসুম অস্ত ভঙ্গিতে পা উঠালো। এরপর ঘাটের পাশে থাকা ঝামা দিয়ে আনমনে সেখানে ঘষতে থাকল। কদিন সে কাজে যাছে না। বাড়ির যে অবস্থা, দুদণ্ড বসা যায় না। সবাই তাকে জীবন থেকে খারিজ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় পেটের ক্ষুধায় মাথা বনবন করে। তার মাথায় কিছু খেলে না, না আলো, না ছায়া, না পুনর্বিবাহ, না পুরাতন সংসার, কিছু না।

সারা গাঁয়ের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে এক সময় কুসুমের হিল্লা বিবাহ সম্পন্ন হল। যুবক ঢুগডুগি বাজিয়ে গান গায়, ভিক্ষে করে। প্রামের কোণার আধভাঙ্গা ঝুপড়ির মধ্যে রাত হলে ঘুমিয়ে থাকে। হাফিজের ভাষায় ‘মাজা ভাঙা পোলা’। এই শব্দের কোনও অর্থ কুসুম জানে না। যার মাজা ভাঙা, সে সুস্থ মানুষের মতো হাঁটে কি করে, এই বাড়িতে এসে এইটাই সে প্রথম চিন্তা করল।

এরপর রাত্রি বাড়িতে থাকে। মাঠের শেষ প্রান্তে একলা শূন্য ঘর, ফলে নিস্ত্রুতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। ঘরের কোণায় চাটাইয়ের ওপর মাথা নিচু করে বসে আছে ভিক্ষুক গায়ক। তার শরীরটা এত ছোট আর এত হালকা,

ভিক্ষে দেওয়ার ব্যাপারে যে কারোই মায়া হবে। পাশের খেজুর গাছে শীতের
বাদুড় ডানা বাপটালে হাফিজের দেয়া নতুন শাড়ির আঁচল ভয়ার্ত হাতে কুসুম
গলায় প্যাচাতে থাকে। হঠাৎ তার সেই বদজিনের কথা মনে হয়, তার বিশ্ফারিত
হাসি, তার নীল হয়ে ওঠা মুখ। কুসুম নিষ্ঠেজ হয়ে আসল। মাঝখানে চাগিয়ে
উঠেছে কুপির দপদপে শিখ। হাফিজের পরামর্শ মনে পড়লো, অঙ্ককার বৃক্ষের
নিচে ফিসফিস করে বলেছিল, পরপুরষে তর শইলে হাত দিলে কবিরা শুনাই
হইবো। এই বেড়ারে শইল ছুইতে দিবি না।

আফনেও ত পরপুরষ, কুসুম বলেছিল, শুনাই যা অওনের ত অইয়াই গেছে।
তাইনের লগে আমারে বিয়া দিতাছেন, তাইনে কেমনে পরপুরষ অয়?

খুব মজা লাগতেছে না? খেকিয়ে উঠেছিল হাফিজ! তুই দশ বেড়ারে শইল
দিবি? আমি আপন হই, পর হই তুই আমার ঘরই আগে করছস, পরে আমার
ঘরই করবি। হেই বেড়ার লগে এক রাইত থাকনের নিয়ম থাকবি, হয়ে তর
গতরে হাত দিবো, এইডা ভাবছো কেমনে?

আমি কি করম?

হাফিজের কম্পিত হাত থেকে বিড়ি খসে পড়েছিল, হেই বুদ্ধিই ত দিতাছি।
তুই শইলের মধ্যে পট্টি লাগায়া কইবি, তর হায়েস অইছে।

হাফিজের বুদ্ধিতে অভিভূত কুসুমের হাত-পা আলগা হয়ে আসছিল, হের
পরেও তাইনে যদি না মানবার চাইন?

মানবো না মাইনে? হাফিজ আসমান থেকে পড়েছিল, তুই কইবি, এই অবস্থায়
থানড়া কবিরা শুনাই। হেই বেড়ার উপরে আল্লাহ নাই? এই বুদ্ধিডাও খরচ
করবার পারবি না?

এতসব কবিরা শুনাহের ধাক্কায় বিক্ষিপ্ত কুসুম মাঝখানের কুপি সরিয়ে তার
রাস্তির জন্য নির্ধারিত স্বামীর সামনে গিয়ে বসল। এই লোকটি একটি লুঙ্গি, দুই
কুচি চাল আর একটি নতুন ডুগডুগির বিনিময়ে তাকে এক রাতের জন্যে বিয়ে
করতে রাজি হয়েছে। কুসুমের বুকের দলা দলা বিষ ওপরে উঠে তার জিভ
তেতো করে তোলে। এর মধ্যেই বিচ্ছি কঠে পাশের বোপে শেয়াল ডেকে
উঠলে কুসুমের গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যায়।

গায়ক মুখ তুলল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বেবাকেই আমারে এমুন
চাপ দিল, আমি কি মানুষ না? আমারে এমুন ব্যবহার করল? বোপের শেয়াল
একলাফে ঝুপড়ির কাছে চলে এসেছে। কি এক মচমচ শব্দ। কুসুম তার চামড়া
দিয়ে অনুভব করে, বেড়ার ফাঁকে দুটি চোখ শত শত চোখে রূপান্তরিত হয়েছে।
এর মধ্যে জলে ডুবে যাওয়া ছেলে দুটোর মাথা এমন ভুস করে ভেসে ওঠে
যে, কুসুমের সব কিছু ওল্টপাল্ট হয়ে যায়।

সে বলল, আফনে আমার স্বামী। আইজ থাইক্যা আমি এইডাই বুঝি, আর

কুনো পরপুরুবের কাছে আমি যাইয়ু না।

গায়কের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কুসুম দাঁতে দাঁত চেপে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, আফনে কি ডরাইলেন?

ভিক্ষুক গায়ক অন্তু দৃষ্টিতে কুসুমকে দেখল। পরক্ষণেই চোখ চলে গেল শত আন্তর পড়া ভাঙা ঘরটির দিকে। তার হতবিহুল মুখ থেকে কোনও শব্দ আসল না।

আফনে গান জানেন, ত ভিক্ষা করেন ক্যান?

আমি গান বেইচ্যা খাই, ভিক্ষুকের কষ্ট দৃঢ় হয়ে উঠল।

এইডা কি ভিক্ষা করা অইলো? কুসুম ফিসফিসান কঠে বলল, আমি নক্ষি খেতার কাম জানি।

ভিক্ষুক গায়কের পাতলা দেহ বাঁশপাতার মত কাঁপতে থাকে।

রাত গভীর হয়। এরপর কী এক প্রচণ্ড জেদে, কী এক উদগ্র কামায় কুসুম নতুন শাড়ির আঁচলের ঝাপটায় দপদপ জ্বলতে থাকা কুপির শিখা নিবিয়ে দিল।



করুণ শঙ্কের মতো

সন্তোষ কুমার ঘোষ

আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই নন্দিতা একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। যেন বাড়ির গাড়ি ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কপাল ভালো। কতটা ভালো, যেন সেইটে পরখ করতেই নন্দিতা ছোট্ট রুমালটায় তার কপালটা মুছে নিল। এত লোক এত চোখ, গা শিরশির করে। চালাও ট্যাকসি, যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে এই মানুষের বন থেকে উদ্ধার করে ছুটে চলো। মানুষের বন, না বনমানুষের, রুমালটায় শুধু ঘাম নয়, ফেঁটা ফেঁটা বৃষ্টিরও ছোপ। যে জল তার চোখে থাকার কথা, তা যেন জায়গা বদলে কপালে লেগেছে। রুমালটা ছোট্ট হলে কী হবে, ভারি দুষ্টও। তুই ঘাম আর বৃষ্টির ফেঁটা মুছে নিবি, এই না কথা ছিল? অথচ দ্যাখো সিঁদুরের দাগটাও মুছে নিল। নকল সিঙ্কের বনাটটা লালে লাল। যে রক্ত নন্দিতার বুকের ভিতরে গোপনে, তাকে বাইরের বাতাসে একেবারে উতাল করে দিল। লোকে ভাববে কী?

ট্যাকসিটা মিটার ডাউন করেছিল। ড্রাইভার উৎসুক মুখে তাকিয়ে। বুকের ভিতরে ছপছপ আওয়াজ, নিজের কানে নিজেই শোনা যায়। যেন কেউ তার শাড়ি শায়া জামা ধপথপ করে কাচছে। নন্দিতার হাদয় (এই নামে কিছু আছে কি? কখনও এই চরাচরে কোথাও ছিল কি?) কলতলা হয়ে গেছে। কোনও রকমে চাঁপা গলায় সে খালি বলতে পারল, যোধপূর পার্ক। আর দেরি নয়, হে ট্যাকসিওয়ালা দয়া করে দাঁড়ালে যদি, আর একটু দয়া করো। পার করে দাও এই পথটুকু, যত তাড়াতাড়ি পারো, তত।

তার কারণ সে ইতিমধ্যে অনেক না-চেনা চোখের মধ্যে এক জোড়া চেনা চোখ দেখতে পেয়েছে। বিরামের। বিরাম এখনও আদালতের বারান্দায়। নামেনি, হয়তো বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে। নামেনি, তবু অপলক তাকিয়ে আছে। সিঁদুর জলে মাঝামাঝি রুমালটার আড়ালে থেকে নন্দিতা সব দেখতে পাচ্ছে। চোখ তো নয় যেন মিটমিটে দুটি আলো। রাস্তারে বেড়ালের চোখ যে রকম জলে, কতকটা সেই রকম। বিরামের চাউনিটা ভীত্র না বিষণ্ণ, ভালো করে পরখ করার সাহস নেই নন্দিতার। সময় ও নেই। ট্যাকসির চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে, ভিত্তের

ମଧ୍ୟେ ତାର ଭେପୁ ସଖନ ଚାରପାଶେର ସବ ଟ୍ୟାଚାମେଚିକେ ଚାପା ଦିତେ ଦିତେ ଏଗିଯେ ଚଲେଛେ, ନନ୍ଦିତା ତଥନ, ଏତକ୍ଷଣେ ଏହି ପ୍ରଥମ, ବୁକେର ଭିତରଟା ଫାଁକା ଆର ଫାଁପା କରେ ଦିଯେ ଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ିତେ ପାରଲ ।

ରୁମାଲଟା ତୋ ରଙ୍ଗେ ଆର କାନ୍ନାୟ ମାନେ ସିଂଦୁରେ ଆର ଜଳେ ଗୋଲାୟ ଗେଛେ, ତାଇ ତୁଲେ ନିଲ ଆଁଚଲେର ଏକଟା କୋଣ । ଆରଓ ଏକବାର ମୁଖଟା ମୃଣନ ଭାବେ ମୁଛେ ଓହି ଆଁଚଲଟାଇ ଗୁଛିୟେ ଗାୟେ ଜଡ଼ିଯେ ଜଡ଼ିମାନ୍ତ ହୟେ ବସଲ ।

ବିରାମେର ଚୋଥେ କଷ୍ଟ ଛିଲ, ନା ଧିକାର ବା ତିରକାର, ମେଟୋ ଯାଚାଇ କରେ ନେଓୟାଇ ହଲ ନା । ପାଲାତେ ହବେ ଯେ, ଏକ୍ଷୁନି, ଏକ୍ଷୁନି । ଏହି ଲୋକଜନେର କାହିଁ ଥେକେ, ବିଶେଷ କରେ ଏକଟି ଲୋକେର ଅସ୍ତ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟିର କାହିଁ ଥେକେ । କିଂବା କେ ଜାନେ, ନନ୍ଦିତା ହୟତେ ନିଜେର କାହିଁ ଥେକେ ପାଲାତେ ଚାଇଛେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ।

ବାଡି ପୌଛୁତେ ପୌଛୁତେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କାଟିଲ । ମିଟାରେ କତ ଉଠେଛେ ନା ଦେଖେଇ ନନ୍ଦିତା ଏକହାତେ ବାଡିଯେ ଦିଲ ଏକଟା ଦଶ ଟାକାର ନୋଟ, ଆର ଏକ ହାତେ ଦରଜା ଖୁଲେ ତଡ଼ବଡ଼ କରେ ନେମେ ଗେଲ ।

ସେଇ ବାଡି, ସେଇ ତରତର ସିରିଡ଼ି । ଚାବିଟା ବ୍ୟାଗେ ଠିକ ଖୋପେଇ ଆଛେ, ଦରଜାର ଫୋକରଟାଓ ଯଥାହାନେ । କିଛୁ ହାରାଯନି, ବା ହୁନ୍ତୁଯୁତ ହ୍ୟାନି । ଆବାର କିଛୁଇ ଯେନ ଯଥାପୂର୍ବ ନେଇ । ତଥନଓ ଶେବେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର କୋଲେ ମୁଖ ଗୁଞ୍ଜେ ମୂର୍ଛା ଯାଯନି, ତଥନଓ ଅନ୍ଧକାର ଦିନେର ରୋଦେର ରେଶ୍ଟୁକୁକେ କରେନି ଆହୁସାଂ । ବାଡିର ବାଇରେର ମହା ନିମଗ୍ନଟା ବିରବିରେ ଜଳ ଆର ହାଓୟା ଝରିଯେ ଦିଛିଲ । ଏକଟୁଥାନି ଆକାଶ ଜାନାଲାର କାଂଚେର ଫାଁକେ, ବାଇରେର ରାନ୍ତାୟ କଟିଏ ଏକଟା ଗାଡିର ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ, କଥନଓ ବା ରିକ୍ସାର ଠୁନଠୁନ ଛନ୍ଦ ।

ମେଘଳା ଦିନ, ତାଇ ବିକେଲଟାକେଓ ସକାଲେର ମତୋ ଲାଗେ । ମୁଖ ଭାରୀ, ତବୁ କରଣ ହଲେଓ ମନୋରମ । ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହାତେଇ ସୁଇଚ ଟିପେ ନନ୍ଦିତା ସରଟାକେ ଆଲୋଯ ଆଲୋ କରେ ଦିଲ । ତଥନ ଆଲନାର ଶାଡ଼ି, ଦେଉୟାଲେର ଫଟୋ ଆର ଆଯନାଟା ଓକେ ଦେଖତେ ପେଲ । ଯା ଯେଖାନେ ଛିଲ ସେଖାନେଇ ଆଛେ । ଅଥଚ ଥେକେଓ ନେଇ । ଯେ ଶୂନ୍ୟତା ବାଇରେର ଆଛମ ଆକାଶେ ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ଛାଯା ନନ୍ଦିତା ତାର ଅଭିରେଓ ଅନୁଭବ କରଛେ । ନେଇ ନେଇ, ମେ ନେଇ, କେଉ ନେଇ କିଛୁ ନେଇ । ନେଇ ଥେକେ କିଛୁ ହବେ ଏହି ଆଶାତେଇ ନନ୍ଦିତା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ସଂଲଗ୍ନ ଚାନେର ସରଟାଯ ଢୁକଲ । ଯେନ ସେଖାନକାର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ସୁଗନ୍ଧି ତେଲେର ଶିଶି ଆର ସାବାନେର ମୃଦୁ ସୁବାସେ ସେ ତାର ପୁରାନୋ ହାରାନୋ ସଞ୍ଚାକେ ଫିରେ ପାବେ । ଚାନେର ସରେର ଆୟତନ ଛେଟ ବେଳେଇ ବୋଧହୟ ଏତ ଆରାମ, ଏତ ଅଭୟ ସ୍ଵଷ୍ଟି । ମାଥାର ଉପରେ ଝରନା । ଛିପି ଖୁଲେ ଦିତେଇ ତାର ଝରବର ଆଦର ନନ୍ଦିତାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଧୂଯେ ଦିତେ ଥାକଲ । କାର ସ୍ପର୍ଶ ? ତାର ମାଯେର ? ମେ କତଦିନ ଆଗେକାର କଥା ? ମାକେ ଛେଡ଼େ ଏହି ବାଡିତେ ଏସେ ଉଠେଛେ ଅଭିତ ବର ଛୟେକ ଆଗେ । ଆର ମା ତାକେ—ସବାଇକେ ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଗେଲେନ କବେ ଯେନ, କବେ ଯେନ ? ସେଓ କମ ନା ବହୁ ତିନେକ ହବେ । ଦିନ ତାରିଖ ସାଲ ଏଥନ ଆର ମନେଓ ପଡ଼େ ନା ।

তোয়ালে দিয়ে যখন গা রগড়াচ্ছে নদিতা, কার ছোঁয়া? তার স্বামীর? সেও তো হারানো। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে এই তো মোটে আধঘণ্টা আগে নদিতা পুরোনো বাড়িটাতেই ফিরে এল। বিছেদ, পূর্ণচেদ। আঃ, এতক্ষণে যেন সব জুড়েল। ছড়ায় বলে, খোকা ঘুমোল। কোনও ছড়ায় কিন্তু খুকী ঘুমোল বলে না। বলবে কেন? আমি তো খুকী নই; আমি অনেকদিন ঘর করা নারী।

বিরামের সঙ্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমার একটা নাম ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে আমি এই কথাটাও কি বোঝা যেত? শুধু যুক্ত ছিলাম এইমাত্র। কে জানে, সব বিবাহিতা মেয়ের আর একটা নাম হয়তো সংযুক্ত। আমি নেই, সে আছে। অথবা তার ছায়া হয়ে আমি আছি। কিন্তু যদি এমন কোনও সাজানো বাগানে আর একটা ছায়া পড়ে? তবে তো এই ছায়া আর একটা ছায়ায় ঢেকে যাবে!

আমি এখন আমি। শেকড় নই। ছায়াও নই, আমি রক্তমাংস মজ্জা মিলিয়ে কায়। স্বাধীন। বেশ তবে তাই হোক, এবার সেই কায়ার বুকের ভাঁজে একটু সেন্টের সুগন্ধ ঢালি না। দরাজ হাতে স্প্রে করলে এই আমি ভুর ভুর হয়ে যাব। কিংবা কস্তুরী মৃগের মতো 'ম'। রক্তের রং তো ঢাকা যায় না! গঙ্গাটা যদি ঢাকা পড়ে।

নদিতার মগজে একটা বিমবিম আবেশ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নায়ুর সংবেদনশীল কেন্দ্র থেকে যত শিরা আর উপশিরা রঙে রঙে চিঁকার করছিল। নদিতা জামাটার নিচের বন্ধনী আরও আঁটসাঁট বোতাম টিপে শক্ত করে দিল। এই নিচেকার জামাটাই তো সবচেয়ে নিচের নয়, তার তলাতেও আছে পরতের পর পরত, আছে মসৃণ ফর্সা চামড়া। সেই চামড়ারও নিচে? কে জানে কোথায় লুকিয়ে থাকে মন। মনেরও স্তন আছে কিনা আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী দার্শনিক সে কথা জানাননি। থাকলে মনকেও ব্রা পরানো যেত। দূর, যাকে লাগাম পরানোই শক্ত তার আবার বক্ষ-বন্ধনী। তবু নদিতা ভাবল, বাইরের বুকে একটা বাঁধন থাকলে ভিতরের বুকটাকেও বুঝি বেঁধে আটকানো যাবে। যেমন শ্ফীত কিছু সুট্টোল মাংসপেশী, তেমনই অনুভূতি। শারীরিক শ্ফীতিকে যদি শিকেয় তুলে তুঙ্গ করা যায় তবে মানসিক উচ্ছ্বাসের জন্যেই বা কোনও দড়াদড়ি, ফিতে হক্টুক নেই কেন?

আসলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল নদিতার। সেটাকে ঢাকতে যত সেন্ট আর পাউডার। আচ্ছা বিরাম আজকেই আদালতের বারান্দায় ওভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তখন যিরিবিরি বৃষ্টি, নদিতার এতক্ষণে মনে পড়ছে, একটা পাকা বটফুল টুপ করে স্যাঁতসেতে যাটিতে পড়েছিল, শিরীষ গাছটার ফুলের রঁঁয়া উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার গলায় আর ঘাড়ে। কার ছোঁয়া, কিসের? সে জানে না। শুধু দৌড়ে এসে ট্যাকসিতে বসেছে। ট্যাকসিটার স্পিড ছিল অস্তত ষাট সেক্টর কিলোমিটার।

কিন্তু বিরামের সেই চোখ আর চেয়ে থাকা? তার স্পিড কত? যেন আরও বেশি। যেন সিঁড়ি-চিড়ির বাধা মানেনি, ধাওয়া করে এসেছে এইখানে, এই ঘরে, এত দূরে। শুধু তাকানোও যে একটা কুকুরের মতো অনুগত অনুসারী হতে পারে নন্দিতা আগে জানতো না তো! ওই দৃষ্টি এখন লকলকে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। তা হাঁপাক না! নন্দিতার সারা শরীর আর সন্তাকে এত করণ লেহন করছে কেন?

কথাটা নন্দিতা ড্রেসিং আয়নাকে জিগেস করল। আবার কপালে বড়ো করে পরল সিঁদুরের টিপ, যেটা বিরিবিরি বৃষ্টিতে খানিক আগে মুছে তাকে অধিবা করে দিয়েছিল। নির্ভুল কাচ তাকে দেখিয়ে দিল হাতের শাঁখা জোড়াও। নন্দিতার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল। সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক না, শাঁখা জোড়া ভেঙ্গে দিলে বেশ হত। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের নোয়া লোকে নাকি খুলে নেয়, শাঁখা ভেঙ্গে ভাসিয়ে দেয় জলে! আর যাদের স্বামী চলে যায়? তাদের শাখার কী গতি হয়, নন্দিতা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারল না।

ইচ্ছে করলে এই তো আমি সিঁদুরের টিপটা ফের মুছতে পারি। সিঁথির লাল দাগটা তো কত কালই নেই? বুকের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সরু কোনও লাল যন্ত্রণার আলপথ চলে গেছে কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা একটা আঙুল ছুইয়ে সেটা পরখ করতে চাইল।

এ কী অস্তুত ব্যাপার সে ভাবছিল। গিয়েও যে যায় না, সব শেষ হলেও পিছু পিছু পা টিপে আসে! কুকুরের মতো যার জিভ শুধু হা হা শ্বাস ছাড়ে। জিভ আছে অথচ লালা নেই, তাকানো আছে, কিন্তু সেটা তাড়া করে না, নন্দিতা এই অসন্তুষ্ট অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিতে পড়ে তোলপাড় হতে থাকল।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে শোনা গেল ঠক ঠক জুতোর শব্দ, আমি জানি তুমি কে, আমি জানি এই পায়ের আওয়াজ কার। তোমার পায়ে পড়ি এক্ষুণি এসো না, অস্তুত মিনিট দুই সময় দাও আমাকে। সামলে নিতে। ভোবে নিতে। যা ছেড়ে এলাম কিংবা যা আমাকে ছেড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে কখনও যাওনি? সেখানে পুণ্যবতীরা সবাই ডুব দেয়। পাপবতী আমি, আমিও একটুখানি সময়ের জন্যে আগেকার জলে একবার শেষবার ডুব দিয়ে দিতে চাই। কয়েকটা মিনিট শুধু। ভিক্ষে করছি। এই শাঁখাটা বড়ো ঢলতলে লাগছে যে। সিঁদুরের এই ফেঁটাটা দরকার হয়, না হয় আবার মুছব আবার আঁকব—এবার যে আসছে সেই তোমার জন্যে।

একটু সময় দেবে? ধরো আমি যদি ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিই? আগেও কত রাত্তিরে দিয়েছি। তখন বাইরে ঘুরঘৃতি অঙ্ককার, অথচ ভিতরে, সারা শরীরে ফটফটে ছটছাট আলো। জুলে জুলে। জুলত জুলত। তোমার বুকের গঞ্জ পাই না কেন? আমি চাপা হাসতাম সেই অঙ্ককারে। আরও চাপা গলায় বলতাম, পাও না! বিরাম বলত, না। বলতাম, কেন এত যে আতর মাখলাম! সে বলত, সে তো কেনা! বলতে বলতে খামচে ধরত, আমার ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে জিভ

চুম্বে শেষ করে দিতে চাইত। অঙ্ককারে গাঢ় গলায় বলত, কেনা জিনিস তো চাই না। বলেছি, তবে? সে বলেছে, শুধু পেতে চেয়েছি, পেতে চাই।

আরও কত কত রাত, যখন আমার বুকের উপরে বলতে কি পায়ের নখ থেকে কপাল, আমার কপাল পর্যন্ত একগাছি সুতোও নেই, আমি মাঠের মতো, আকাশের মতো ব্যাপ্ত, আমি উদ্ধৃত, তখন সে আমার শরীরের অঙ্কিসন্ধিতে কী জানি, কোন্ গন্ধ ঝুঁজতো। খুব নিচু গলায়, খুব উচু হয়ে বলতাম, কী ঝুঁজছো তুমি, কী চাও?

পায়ে পড়ি হে সিঁড়ির ধূপধাপ শব্দ, হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও। সব কথা নিজেকে বলে বলে খালাস হয়ে যাই, যেভাবে এক্ষুনি যদি ফের বাথরুমে যেতাম তবে আয়নটার কাছে মনের সব চাপ আর তাগিদ হালকা করে দিয়ে আসতে পারতাম।

বিরাম সেই গন্ধভরা অঙ্ককারে বলেছে, কোথায় তুমি? আমি বলেছি, এই তো। মায়েরা যেভাবে বাচ্চাকে ঘূম পাড়ায় সেই গলায়। বলেছি, দ্যাখো তো, আমার বুকের একটুও আড়াল নেই! সে মানতো না। সে কি বুকের ভিতরে আরও কোন বুকে আকৃ আছে কিনা সেইটাকে ঝুঁজতো? তাকে ছিন্ন ভিন্ন আর উদভিন্ন করে দিতে চাইত?

জানি না, আমরা তো জানি আমরা যা আছি তাই। আমার ভিতরে আর একটা যে আমি একেবারে খোলামেলা ; বুকের তলায় আরও একটা বুক যে থাকতে পারে কখনও ভাবিনি। তাই নানা সুগন্ধি দিয়ে ওকে ঠেকাতে চাইতাম। কে জানে, হয়তো ঠকাতাম নিজেকেও।

রাস্তার একটা চিমটিয় আলো মাঝে মাঝে ওই অঙ্ককারকে জেরা করে দিত। বিরাম আমার খোলা আর খালি শরীরটাকে পাগলের মতো কাছে টানতো। বলত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে খালি বলত, আমি তোমার ভিতরটাকে জানতে চাই। আমি তো গা এলিয়ে, সমস্তটাকে ঢিলে করে দিয়ে শুয়ে আছি। বলেছি, যা জানবার জেনে নাও তুমি। সে বলত, থবেশ করব। বোকা ছেলে! একটা সিন্দুকের ডালা যদি বা ঘামে চিটাচিটে হয়ে কেউ দু হাতে টেনে তুলল, তার পরেও ভিতরে যদি চকচকে কোনও সোনা দানা মোহর না দেখতে পাওয়া যায়? শরীরের দশাই তো এই। সে শেষে যেতে পারে না, শুধু শেষ হয়ে গিয়ে হাঁপায়। সেই কুকুরের লকলকে জিভ। অশেষের ঠিকানা পায়নি বলেই বিরাম রোজ বলত, রোজ রোজ বলত আর বলত, কী? না লাগছে। কোথায়? আমি বলতাম। তখন আমিও ইঁদুরার মতো টলটলে হয়ে গেছি, বিরামের মুখ আমার উন্মুক্ত বুকে, বলতাম, সব তো খুলে দিয়েছি, তবু পারছো না? এ-যেন দস্যুর হাতে চাবি তুলে দিলাম তার পরেও সে ধন-দৌলতের কোনও ঠিকানা পেল না।

বিরাম তুমি সেই দস্য। কেন ফিরে ফিরে নিচের ঘরে, কেন কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট সাষ্টাঙ্গে লিপ্ত হয়েও বলছ, লাগছে? কি সে বিরাম, কী সে? কোথায় বলতো কোথায়? সারা গায়ে কিছু তো নেই, দেখছ না আমি এখন নির্বাস, আমি শুধু আমার নির্যাস। আছে শুধু শাঁখাজোড়া। তাতেই কষ্ট? সেইটাকেই তুমি বলছ, লাগছে? ওই একটুখানি বেড় কি বেড়া হয়ে যায়?

জানি না, ভাবতে পারছি না, সময় আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। ধপধপ জুতোর শব্দ, এখন একেবারে দোরগোড়ায়। কলিং বেল বাজছে।

* * *

নদিতা জামা কাপড় গুছিয়ে সংবৃত হয়ে গেল। সাড়া দিল মানে দরজাটা খুল। আমি জানতাম অনুপম তুমি আসবে। বাঃ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো। তোমার জন্যেই তো নন্দা, তোমার জন্যেই। আমার মনের কথাটা যদি পড়তে পার তবে পড়ে নাও। আজকে এই সময়টায় লোডশেডিং হলে কী দারুণ হত বল তো? জিজেস করার দরকার কী অনুপম। সব লোড শেড করেছি বলেই তো আমরা দুজন এখানে আজ মুখোমুখি হয়েছি। ষ্ট্রেচলনের ট্রাউজার পরে তুমি তৈরি, আমিও তাই নাইলনের শাড়ি সারা শরীরে জড়িয়ে। এসো সব ছাড়িয়ে যা কিছু আমাদের ছাড়িয়ে আছে সব বাধা এড়িয়ে, এসো। জানি এরপর কী? তুমি যদি তৈরি থাকো তবে আমিও তৈরি। কপালের টিপটাকে ভালো লাগছে না? আমার জন্যেই পরেছ? ভালো না লাগলে মুছে দিও। চমু দিয়ে জিভের ডগা দিয়ে। আজকেও তুমি এই সব কথা বলবে নন্দা? তোমার কথা কেমন যেন কাটা কাটা। দূর আমি সব হাত বুলিয়ে মিলিয়ে দেব।

আমি নদিতা। বিরামের চাকরিটা হঠাতে কেন গেল বলতো? কেন তুমি তোমার অফিসে আমাকে একান্ত সচিব করে নিলে? আমার যে এক, তার যে তখনই অস্ত হয়ে গেল। শারীর কাজ নেই, আমার কাজের উপরে একটা ডবল কাজ মিল। অনুপম, হে সন্তু তুমি মহানুভাব।

নদিতার এই সব মনোগত কথা অনুপম শুনতে পায়নি। সে বানানো কোনও নাটকের চরিত্রে মতো বানানো কোনও সংলাপ শুনছিল। তার কানে ভাসছিল, আমি, এই অনামিকা, এখন সব খুলে দিতেই রাজি। যে ভাবে দরজাটা খুললাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। জানতাম তুমি আসবে। তাই তো একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কেন বলতো? আমার সমস্ত পুরোনোকে ধূইয়ে ঢেলে দিলাম। আর নতুনের জন্যে নিজেকে ছিমছাম তকতকে করে তুললাম। এক ঢিলে দুই পাখি। মেয়েদের মন যদি বা দুয়ুখো সাপ হয় তাদের শরীরটা শান বাঁধানো মেরের মতোই। কোনও একজন পা ফেলবে এই জন্যেই তারা মস্ণ ধৌত তৈরি।

আচ্ছা অনুপম, তুমি খেয়ে এসেছ? রাস্তিরের খাওয়া? খাইনি নন্দা। তোমার নন্দা মানে এই নদিতা বলছি, তোমার চোখ দুটো এরকম ধূসর কেন? চোখকেই

কি তোমার ভয়? না, তাও নয়। যখন তোমার একান্ত সচিব হলাম, তখন ছুটির পরে দুটো চোখ ছুটে ছুটে আমার পিঠের জামা ফুঁড়ত। আজকেও জানো, অন্য দুটো চোখ ধাওয়া করেছিল, যে চোখ দুটোর মালিকের সঙ্গে আমি বিছিন্ন হয়ে গেলাম। আচ্ছা, পুরুষের চোখ কি শুধু ধাওয়া করে? চায় চায় আর যায়? আবার বলি আচ্ছা বিছিন্নতাবাদ কি একেই বলে? একটা মেয়ে কখনও একাকী কি কোনও দ্বীপ হয় বা হতে পারে? কী বললে, কী বললে তুমি? আমি তো আছি। নাটক হলে এখানে নায়িকার সংলাপের আগে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত ‘মৃদু হাস্য’। সে সব থাক আবার বলো, খেয়ে এসেছ, না খাবে? আমরা দুজনেই খাবো নন্দিতা, আমার নন্দা। এসো, আলোটো নিবিয়ে দিই।

কোথায় গেল স্ট্রেচ্লন কোথায় বা নাইলন? কিছু নেই, কিছু নেই। তার সমর্থ উরু কদলী কাণ্ডের মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে, একটি পুরোনো পরিচিত বিছানায় আরও দুটি পা আর হাত হঠাত যেন অঙ্গোপাস, আতুর নিষ্কাস।

ওরা ডিনার খাচ্ছে।

তবু নন্দিতার শরীরে মনে কী যেন? কেউ ছিল এখন নেই। সেই শৃতি। পুরুষ। কেউ তাকে অবধারিত খুলতে চাইছে। পুরুষ।

পুরুষেরা জানে না কেন যে, খোলা মানেই মেলে দিতে পারা নয়। বোবে না কেন প্রথম দিতীয়ের পরেও তৃতীয় কোনও পুরুষ থাকতে পারে, তার নাম নেই, মুখ নেই, সে অতি-অতীত পূর্বতন কোনও ক্ষণ। সেই তৃতীয়টি এই মুহূর্তে নন্দিতাকে উন্মাধিত উম্মোচিত করছিল। অনুপম তাকে বিগলিত গলায় বলল, আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই। দারুণ, তাই না? এই সময়টার জন্যেই আমরা কতদিন ধরে বসেছিলাম বলো তো?

নন্দিতা মনে মনে হাসল। সেই হাসাটাই নির্বাক বলা : বসাটা শোয়া হয়ে গেল, তাই বলছ দারুণ, তাই না?

“ভীষণ ভালো লাগছে” অঙ্গ-বন্ধু শ্বাস ছেড়ে গাঢ় কুয়োর তলা থেকে অনুপমের গলা ভেসে এল। সে বলল, “তুমি কিন্তু কিছুই বলছ না।”

“ভালো লাগছে আমারও,” সারা শরীরে সাড়া দিতে দিতে নন্দিতা আস্তে আর স্থিমিত, বলল।—“ভালো লাগছে, কিন্তু একটু লাগছেও।”

ব্যাথা দিচ্ছি? অনুপম বোকা বোকা গলায় বলল।—কোথায়? উত্তরে শুনল, জানি না। মরিয়া হয়ে বলল, শরীরে? তখন তীব্র চীৎকার করে উঠল নন্দিতা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বলল, তোমার লাগছে না অনুপম? আমার কিন্তু লাগছে। দ্যাখো, এই দুটোতে।

নন্দিতার রোগা ক্ষিতিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা অঙ্ককারে সাঙ্ঘাতিক শাদা হয়ে জুলতে থাকল।



জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল

কিম্বর রায়

রোজ সকালে যেমন হয়, আজও তেমনি একতলার ঘরে কাচের শার্সিতে টক টক টক শুনতে পেয়েছিল সজল। শক্ত, ধারালো ঠোঁট দিয়ে কাচে আওয়াজ করলে প্রতিদিনই তো এমনই হয়, আজও সেভাবেই সজল চক্ৰবৰ্তী ঘুৱে শুল। আর শীতে দু-পায়ের পাতা বড় তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়, তার জন্যে আমি বেশ কষ্ট পাই, কম্বলের তাঁবুর বাইরে সেই পাতাজোড়া ছিটকে গেলে গোটা গায়ে শিরশির শিরশির—উঃ মা, রে! তেতালিশের সজল কঞ্চল-ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া দু-পা ছাউনির ভেতর এনে ওঠার তোড়জোড় করবে কি না ভাবছে, তখনই দেয়ালের ইলেক্ট্রনিক কোয়ার্জ ঘণ্টার শব্দ তুলে জানিয়ে দিল এখন বেলা সাতটা।

কাচের বন্ধ জানলায় আবারও ঠোঁটের টোকা। চারপাশে আলো ফুটলেই একজোড়া গম্ভীর কাক—সজল তাদের নাম দিয়েছে টুলু আর বুলু—বিস্কুট চাইবে, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করে করে।

একতলায় এই বারো বাই পনেরো ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আটকানো শার্স চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রায় ফুরিয়ে আসা ডিসেম্বরের রোদ সোনার চেউ হয়ে বিছানা ভাসাচ্ছে। পড়ার টেবিলে একফালি রোদুর। কালরাতে কটায় ফিরেছি প্রেসক্লাব থেকে বাড়ি! এগারোটার পরে, কিন্তু কত পরে! আমি তো হাতে ঘড়ি বাঁধা ছেড়েছি 'মর্যাদা প্রণ' অফ পাবলিকেশনস' ছাড়ার পর। সেও তো সাত বছর হয়ে গেল।

বিছানায় কুঁকড়ি-মুকড়ি হয়ে শীতের রোদের যে আবছা ভাপ তা কেমন এক আরাম হয়ে জড়িয়ে যাছিল সজলের গায়ে। আর কালরাতে আবারও স্বপ্নে চিনি মাসিকে—সেই উধাও দামোদরের বালি জল জল বালি। হাওড়ার আমতার কাছে রসপুরে আমাদের বাড়ি, সেখানে এই শীতে সর্বে ফুলের হলুদ মাঠ, তখনে শীতে আই আর এইট-এর বীজতলা হয় না সর্বে খেতের গায়ে। পাশের সবুজটুকু তাই অন্যরকম। হয়তো পালংশাকের, নয়তো ধনেপাতা বা মটরলতার, মাটি, নদী, বালি, আকাশে চাঁদ। শীতে রোগা দামোদর শুয়ে থাকে।

চিনিমাসি কাল রাতে স্বপ্নে ছিল, একটু একটু মনে পড়ছে সজলের আর নিমাইকাকা। শীতে বড় বড় বন্ডায় বাঁধা লেপ নামানো হত, ঘরের মাথায় পৌঁতা

হকে লেপের বাস্তিল। বিশাল বিশাল কাঠের তোরঙ্গের ভেতর লেপ-তোশক। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম নিমাইকাকা টেবিলের পিঠে একটা চেয়ার ফেলে তার ওপর উঠে লেপ পাড়ছে। মালকেঁচা মারা আঁট ধূতি। মিলের। সরু, কালো পাড়। গায়ে বাবার একটা বাতিল কোট। কালো রঙের। নিমাইকাকার ফরসা ফরসা পা। তাতে কালো, গভীর কালো কোঁকড়ানো লোম। পায়ের ডিমে ঝলমলে স্বাস্থ্য। দু-পায়ের বুড়ো আঙুল, পাতায় ভর দিয়ে দিয়ে নিমাইকাকা লেপের বস্তা পাড়ছে। নীচে দাঢ়িয়ে চৈতন্যকাকা। বাবাদের সাত ভাইয়ের পাঁচ নম্বর। বাবা তিন। নিমাইকাকা চার।

কাঠের পুরোনো কড়িতে আলকাতরার কালো। বরগাতেও গঙ্গাজল মার্কা আলকাতরার পোঁচ। ইংরেজিতে যার নাম কোলতার, এখনও মনে আছে সজলের। চুন-সূরক্ষির পেটাই ছাদের টালি বালি চুনের পলেঙ্গারা, তার ওপর চুনকামের কারিকুরিতে তেমন আর নজরে পড়ে না। নিমাইকাকা ডিঙি মেরে মেরে কড়িবরগার প্রায় গায়ে লেগে থাকা মোটা লোহার আঁটা থেকে শঁণের পুরুষ্ট দড়ি বাঁধা চটের বস্তা নামাছে। তার ফরসা, লোমওলা পায়ের আভাস, স্বাস্থ্যবান কাফ্ মাসলের খানিকটা—সঙ্গে চৈতন্যকাকার উদ্দেগলাগা গলায়, ন-দা সাবধান। চেয়ার কিন্তু নড়ছে—এসবই স্বপ্নের ভেতর কোনো সিনেমা হয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। আর তখনই ওই স্বপ্নেরই ভেতর একটু দূরে চিনিমাসি। গায়ে সাদা থান। আঁচলেই আঁট পাট করে গা দাকা দ্রুত চলে গেলে নিমাইকাকা লেপ নামাতে নামাতে কেঁপে উঠল কি! আর তখনই চিলের ডাক শোনা গেল। আকাশ চিরে শঙ্খচিলের ডাক। তেমন দুপুর নয় তখন। হাওড়ার বাড়িতে ঘড়িও তো একটাই। লেপ রোদে দেয়া হবে আজ। পৌষ মাস গেল। মাঘ ছাড়া তো গায়ে তোলার নিয়ম নেই।

আবারও ডাকল শঙ্খচিল। আর তখনই ঘুমে, কিংবা ঘুমে নয় এমন একটা আবছা ঘোরে থাকা সজল তার পা বেরিয়ে গেছে কম্বলের বাইরে আরো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এমন একটা এলোপাথাড়ি অবস্থায় নিজেকে গুটোতে চাইল। ঘুমের ভেতর শঙ্খচিল ডাকছিল। আর এখন কাকেদের ঠোট ঠোকাটুকিতে ঘূম ভেঙে বিছানার ওপর কুড়িমুড়ি দিয়ে বসে খানিকটা কম্বল গায়ে পায়ে পিঠে তাঁবু করে এনে সজল শার্সির বাইরে আবছা ছায়ার নীচে দুটো কাক দেখতে পেল। কাকেরা জানলা খুলতে বলছে।

এখন আমি কী করব? সজল নিজের কাছেই নিজে জানতে চায়।

আমি এখন ছিটকিনি খুলে দরজা পেরিয়ে বাথরুমে যাব। তারপর এক কাপ, গরম এক কাপ চা। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। দুটো বিস্কুট টুলু আর বুলুর জন্যে। মা রোজই দেবে।

ও খোকা, খালিপেটে চা খাস না বাবা—তোর দু-বার জিভিস—একটু সাবধানে থাক।

কাল প্রেসক্লাবে সমীর বলছিল ধরে খেতে। আস্তে আস্তে। সমীর এখনও ‘মর্যাদা’-তেই। ও সমীর, টক টক করে তিনটে হইক্ষি নিলে আমি তো কত কিছু মনে

করতে পারি। এই ধরো না, তখন আমি তো তোমাদের ‘মর্যাদা’-তেই, সিনিয়ার
রিপোর্টার। আমায় ফ্রান্সে পাঠাল অফিস। ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড। জার্মানি।

জঁ পল সার্ত্র-র কবরে এখনও জানো তো টাটকা ফুল রেখে যায় কমবয়েসীরা।
ছাত্র-ছাত্রী। গবেষণা করা মানুষ। তেমন দামি ফুল নয় হয়তো। কিন্তু রোজ থাকে
কমবয়েসীদের ফুল।

আচ্ছা এই ধরো শীতে লন্ডন—খুব আস্তে হইস্কি সিপ করতে করতে সমীর
জানতে চাইছিল।

খুব ইন্টারেস্টিং জানো—লন্ডনে তো এমনি অনেক গাছ। নানারকম পাখি। ঘৃঘৃ
জাতের পাখি। কাক—দাঁড়কাকই। তো শীতে জানো খুব বরফ পড়ে। রাস্তা, গাছের
মাথা, বাড়ির সামনে ছাদ—সব সাদা বরফে বরফ। বলতে বলতে আরো একটা নিউ
হইস্কি, মানে এক পেগ—শরীরটা কেমন নাড়াঘাড়া দিয়ে উঠল।

অত জোরে খেও না সজলদা। লাগবে। কিছু ফুড নাও সঙ্গে।

আমি ফুড পারি না সমীর। বড় জোর কমলালেবু দু-চার কোঁয়া এই শীতে।
নয়তো আলুভাজা, মানে পোটাটো চিপস, হয়তো একটু ফিশ ফিঙ্গার—জানো সমীর,
আমার মুখ দেখে এখন অনেকেই ভাবে আমি অ্যালকোহলিক। মদ না হলে নাকি
আমার চলে না। হ্যাঁ, আমি একটু খেতে ভালোবাসি। পেলেই চুক চুক করে চালাই,
কিন্তু এখন যেখানে আছি, সেই ‘ভিশন’ নামের অ্যাড এজেন্সির চিফ কপিরাইটার
প্রিয়নাথদা মাঝে মাঝেই বলেন, সজল, তুমি কিন্তু কেন্দ্র হারাচ্ছ। অ্যাতো খাও কেন!
ঠিক আছে, আহুদ করার জন্যে আমরাও খাই। কিন্তু তার সময় আছে। তাই বলে
যখন-তখন। আয়নায় নিজের মুখখানা কখনও দেখেছ! গোল মতন। ফুলো ফুলো।
মাথাভর্তি পাকা চুল। পাকা গৌঁফ। পাকা জুলাপি। নিজেকে কেমন বুড়োটো বানিয়ে
রেখেছ। বিয়ে অব্দি করলে না—সব জিনিসেরই একটা বয়েস আছে সজল।

আসলে উমবের্তো একোর উপন্যাসে—সজল কোথাও একটা থই পেতে
চাইছিল ষাট-পেরোনো প্রিয়নাথের সামনে।

রাখো তোমার উমবের্তো একো। শরীর ঠিক করো তো আগে। শরীর না ঠিক
থাকলে কিছুই পারবা না। তোমার অনেক আগে আমি ‘মর্যাদায় চাকরি করেছি।
ডেইলিতে ছিলাম। পরে ওদের উইকলিতে। তারপর সব ছেড়েছুড়ে ‘শিল্প’ গ্রুপ অফ
পাবলিকেশনস-এ। সেখান থেকে ‘ভিশন’। ঘূরতে ঘূরতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা
সজল। আর এখন তোমার ঘরে মুখোমুখি বসে থাচ্ছি। তোমার মা একটু আগে
সিলের প্লেটে টাটকা পমফ্রেট ভেজে দিয়ে গেছেন। সঙ্গে শশাকুচি। শাকসুদু নতুন
পেঁয়াজ। কাঁচালঙ্কা।

আপনিই তো আমার প্রেমের গঞ্জ পর পর ছাপেন সাম্প্রাহিক ‘শিল্প’-তে। দৈনিক
'শিল্প'-র সংস্কৃতির পাতায় নবীন প্রতিভা বলে দশজনের সঙ্গে ছবি।

তাদের সাত-আঠজন তো আজ বাংলা বাজারে করে থাচ্ছে সজল। থর সুখেন্দু,

হেমেন, ফস্তু, অনঙ্গ, বিপ্লব—আমারই প্রোডাস্ট। সাম্প্রাহিক ‘শিঙ্গ’-তে তাদের গল্প। ধারাবাহিক উপন্যাস। তোমাদের দশ নবীনের ভেতর কয়েকজন পারেনি। সবাই কি পারে! তখন তুমি একটি প্রেমে আঘাত পেয়েছ। মুকেশের গান গাও।

আপনি খুব মন দিয়ে আমার গাওয়া মুকেশের গান শুনতেন। কিন্তু উমবের্তো একোর উপন্যাসে—

বললাম না পরে শুনব—বলতে বলতে প্রিয়নাথ বড় করে ছাঁচিতে চুমুক দিল। তারপর একটু খেমে সিগারেট ধরিয়ে বলল, বলো, তুমি কি লিখছ?

ওই বিজ্ঞাপনের কপি—মাখন, সাবান, পেস্ট, নারকেল তেল।

ও তো আমরা সবাই লিখি সজল। তুমি কি প্রেমের গল্প, কিংবা অন্য কোনো গল্প লিখছ?

আমি আপনার মতো পারি না প্রিয়নাথদা—আপনি পারেন। আর একটু মাছভাজা নিন।

আমার যা বয়েস তাতে এই ছাঁচিই ফুড।

আমি আর নেব না।

সজলদা, তুমি আর নেবে? প্রেসক্রাবের টেবিলে আর একটু ঝুঁকে খেতে খেতে সমীর সেন জানতে চাইছিল।

না সমীর।

তুমি তো গালপ্ করলে প্রথমটায়। তাতে কিন্তু কিক্—

ও হয় সমীর, কিছু করার নেই।

তুমি কি যেন বলছিলে লস্তন!

কি যেন লস্তন!

শীত, পাথি—

ও হ্যাঁ, শীতে বরফ পড়ে টেমপারেচার নামে। পাথিরা মারা যায়। তখন লস্তন শহরে আমি দেখেছি, এই ধরো মিডল ক্লাস লোকজনের বাড়ির সামনেও একটা মোটা কাঠের ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করানো হাট মতন। ছোট কুঁড়েঘর। ওই কাঠটার মাথায়। বুবাতে পারছ! তার ভেতর রাতে পাথিরা এসে বসে। খড়টড় থাকে। আশ্রয় নেয়। ওই রাতটুকুর মতোই কিন্তু তবু মরে ঠাণ্ডায়।

তবু মরে!

হ্যাঁ, মারা যায়! পাথিরের আর কতটুকুই-বা রেজিস্ট্যান্স! আর মারা যায় বুড়োরা জানো!

কেন, বুড়ো কেন?

শীতে পাথিরের তো খাওয়ার অভাব। ধর একলা থাকা কোনো বুড়ি নয়তো বুড়ো তার ভাঁড়ার থেকে গম, ঝটি বা ওই রকম কিছু এনে বাইরে ঠান্ডায় পাথিরের জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর একসময় নিজেরা—শীতে বলতে বলতে প্লাসে বড় করে

চুমুক দিল সজল। তারপর টেবিলে ছাড়ানো কমলালেবু খোসার ভেতর থেকে একটা কোয়া এনে মুখে দিয়ে বলল, সিগারেট আছে?

ছিটকিনি খুলে বাইরে গিয়ে বাথরুম সেরে ফিরে এসেছি থাটে। সজলের মনে পড়ছিল। মা চা দিয়ে গেছে। হালকা, ফিকে লিকার। কাপের তলা অন্দি দেখা যায়। চিনি নেই। দুটো বিস্কুট প্লেটের পাশে।

টুলু। বুলু। টুলু বুলু। জানলার শার্সি খুলে দুবার ডাকা। সজলের কথা হাওয়া শুধে নিল। আর তার ছুঁড়ে দেয়া বিস্কুট নিয়ে দুই কাক—কিংবা এক কাক আর এক কাকিমী বাতাস থেকে বিস্কুট ধরতে গিয়ে পারল না। সেখানে আজ গোটাতিনেক রোঁয়া ফোলানো শালিক। কিচ কিচ ক্যাচ ক্যাচ। দেখতে দেখতে ভারি মজা। শালিকরা বিস্কুটের ভাগ চায়। খানিকটা পেলও বোধহয়। দূরের রোদ ততক্ষণে আরো কাছে। সজলের গায়ের ওপর।

আজ শনিবার। আমি দেরি করে অফিস যাব। বারোটায় লীনা আসবে। ওর আজ ছুটি। কাল ফোন করেছিল অফিসে। আমার টেবিলে তখন রবি কিছিলু সংগীত ফাউন্ডেশনের যে ক্যাম্পেইন হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার পিরিওডিক্যালস আর ডেইলিতে তার কপি, ছবির ব্রোমাইড।

কাল বারোটায় আসবে, মেট্রোর সামনে!

আসব।

ভুলে যেও না।

না, ভুলব না।

লীনার কাছে যাব, তার মানে দাঢ়ি কামাতে হবে। গেঁক ঠিক করতে হবে। পরিষ্কার জামা। পায়ে শু থাকলে ভালো হয়। আচ্ছা লীনা, আমি তো পঞ্চাশের দিকে ঝুঁটিছি। আর কত বছর এই পৃথিবীতে! তার জন্যে এত ফিটফাট।

যতদিন বাঁচা, ততদিন একটু থাকি না এভাবে। লীনার গজদাঁতে খুশির আলো।

মা, আমায় গরম জল দিও বাথরুমে। বলতে বলতে সজল লস্বা করে চুমুক দিল চায়ে। তাকে জাগাতে চাওয়া কাকেরা ততক্ষণে কোন দূরে উড়ে গেছে।

এই তো লীনা।

সেই পাঁচ মিনিট দেরি। মেট্রোর সামনে একলা মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকা যে কি অসুবিধের—

স্যরি। আমার ঘড়ি নেই তো। এখন ঠিক কটা বাজে বলো তো?

বারোটা সাত।

ওফ হো, সাত মিনিট লেট।

চলো একটু বসি ম্যাঙ্গাস টিফিনে। কফি খাই।

নাহ, হাইকোর্ট পাড়ায় যাব।

হোয়াই?

শুঙ্কেপুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—

কপালে নেমে আসা পাকা চুলের বেড়া ঠেলে পেছনদিকে সরাতে সরাতে সজল লীনাকে দেখল। বক্রিশ প্লাস। বিবাহিত। একটি সন্তান। ছেলে। বর দিল্লিতে। শোভেন ইকনমিস্ট। ছেলেকে নিজের কাছে রেখেছে। মামলা হাইকোর্টে। খুব হালকা মাখন রঙের শালোয়ার কামিজে লীনা এখন বিলো থার্টি। পায়ে আঙুল কাটা স্কিন কালার মোজা। সরু ফিতের কালো ব্যাক বেল্ট। গায়ে কালো শাল। মাথার কাটা চুলে কি এক বাহারি হোয়ার ব্যাস্ত, যার কাঠের হলুদ সবুজ চোখে লাগে। আজ কি চুল ডাই করিয়েছে লীনা? নইলে এত গভীর কালো চুল, কোথাও রূপোলি রেখা নেই। ফরসা গালে মুছে আসা ঝরণ লালিমায় ডিসেম্বরের রোদ। আর সেই রোদই কখন যেন অনেকটা আলো হয়ে জুলে শালের গায়ে সেলাই করা গোল গোল কাচে।

কবে ডেট পড়ল?

জানুয়ারির নয়।

ছেলে কাছে থাকে না। শোভেন দস্তগুপ্ত তাকে আইনের খ্যাপলা জালে বেঁধে তুলে নিয়ে গেছে, সেই রাজধানীতে। তাই নিয়ে মামলা। আইনি পঁচাচ। দিল্লি হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট। জলের মতো টাকা খরচ।

কাকু, তুমি ডিম ভালোবাসো? বুচান আমার কাছে জানতে চায়। কলকাতায় নভেম্বরে শীত পড়ে না। কিন্তু বুচানের ঠাণ্ডা লেগেছে। ১৯৯৬-এর নভেম্বর।

না, বুচান। তুমি?

বাসি তো। ডিম আমি খুব ভালোবাসি। তোমাদের ডিমটা তাহলে? ভালোবাসা না যখন।

বাবার টেবিলে আমি, বুচান, লীনা পাশাপাশি। ঘড়িতে রাত নটা। শোভেন তখনও মামলা করে বুচানকে দিল্লি নিয়ে যেতে পারেনি। গল্ফ গ্রিনে একটা বাড়ির একতলায় লীনার মা-বাচ্চার সংসার।

তুমি আমার ডিমটা খাবে?

আঃ বুচান, কতবার বলেছি তোমায়। অন্যের জিনিস।

কাকু অন্য কেন হবে মা—কাকু তো আমাদের—

বুচানের ফরসা গালে টিউবের হাসি। সামনের চুল ঝাঁপ দিয়েছে কপালে। দু-চোখ চকচকে। নাকটা লীনার মতো শার্প নয়। হয়তো শোভেনের। আমায় আঙ্কল বোলো না বুচান—আমি যেন কবে বলেছিলাম। কোনো এক বিকেলে কি, যয়দানে তখন সঙ্গে নামছে। দূরে দূরে গাছের মাথায় দিন ফুরোনোর আলো—

তাহলে কী বলব তোমায়?

কী বলবে—তাই তো কী বলবে বলো তো—বেশ তো, কাকু বোলো—

লীনার মুখে তখন কি সূর্যাস্তের আলো লেগেছিল ?
ডিমটা আমি খাব কাকু ? গোটাটা দিলে ?
দিলাম তো হাতে করে।

আস্তা ?

ক্লাস ওয়ানের বাংলা মিডিয়াম। এখনও আস্তই বলো—নয়তো গোটা—
হিং বুচান ! সেই ভূমি খেলে। দুটো ডিম। শেষে রাতে পটি পেলে—
খাক না লীনা। আমরা তো ছেটবেলায় রসপুরের বাড়িতে—
আমরা ট্রামে যাব। বলতে বলতে লীনা তার কালো শাল আরও ভালো করে
জড়িয়ে নিল।

কলকাতায় কি আজ বেশি শীত। নিজের হাফ হাতা নেতৃ ব্লু সোয়েটারের দিকে
একবার আলগোছে তাকিয়ে নিয়ে নিজেকেই নিজে জিঞ্জেস করল সজল।

সেপারেশানের এই মামলা সময় নেবে। অর্থও যাবে। হাইকোর্ট পাড়ার মিষ্টির
দোকানে চা-সিঙাড়া খেতে খেতে এসবই মনে হচ্ছিল সজল চক্ৰবৰ্তীৰ। শুধুমূল
সান্যাল তো সেৱকমহি বললেন। সময় লাগবে।

শ্বেতপাথরের টেবিল টিপে কলকাতার পুরোনো ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে বসেছিল। ভারী
ভারী কাঠের চেয়ারে টিউবের সাদাটে আলো।

রসগোল্লা খাবে ? লীনা জানতে চাইছিল।

নাহ, খাক।

কেন, খাকবে কেন ?

ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।

সে তো আমিও। লীনার কথার গায়ে গায়েই ঢং করে বেলা দেড়টার ঘণ্টা পড়ল
মিষ্টির দোকানের ঘড়িতে। সজলের মনে পড়ল এখান থেকে ট্যাক্সিতে অফিস যেতে
তার ঠিক আধগঢ়া লাগবে। যদি রাস্তা ফাঁকা পাওয়া যায়। এটুকু ভেবেই মৌরি মুখে
পুরুল সজল। ক্যাশ কাউন্টারে বসা লোকটি হাতঘণ্টি টিপে টিপে সজলদের চা
সিঙাড়া কত হয়েছে জানতে চাইছিল বেয়ারার থেকে।

সমীর আজও ছিল প্রেসক্লাবে। আর দুটো খাওয়ার পর সমীর টেবিলের ওপর
একটু ঝুঁকে বলল, জানো সজলদ, আমাদের বেহালার সারিকা জয়সোয়াল বড়
চাকরি করে শ ওয়ালেস-এ। হঠাৎ দেখি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ‘গুরুড়’, ‘গুরুড়’,
, ‘গুরুড়’, বলে তিনবার ডাক দিতেই আকাশ থেকে আস্ত একটা চিল। মাইরি, গোটা
চিল একখানা—একদম ডানাফানা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে চক্র কেটে নেমে
এল—একেবারে সারিকা জয়সোয়ালের কাঁধে। বললে বিশ্বাস করবে না। বেহালা
ট্রাম ডিপোর পাশে কি হেকড় মহিলার জানো। অত ফরসা রং। ওই হাইট। বড়
চাকরি করে কাঁধে চিল। পাশে অফিস যাওয়ার লাল মারফতি দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে

বেরিয়েই গাড়ির দরজা খোলার আগে ‘গুরুড়’ গুরুড়’ বলে ডাক। অমনি শূন্য থেকে চিল। আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলা যাও নাকি একটা বলতেই গুরুড় আকাশে।

আর তখনই খানিকটা হইশ্বি বড় তাড়াতাড়ি নিজের ভেতরে নিয়ে সজল দু-কোয়া কমলালেবু জিভে ফেলে, মুখ সামান্য কুঁচকে একটা সিগারেট ধরিয়ে কাল শেষ রাতে হয়তো বা ভোরেই হবে ঘুমের ভেতর থেকে শোনা কোনো গানের আবছা কলি যা আর এখন মনে পড়ে না, তখনও মনে আসেনি—সকালে ঘুম ভাঙার পর, আর তারপরই শঙ্খচিলের ডাক, দামোদরের রোগা স্নোত মনে পড়ে গেল। শীতের হলুদ হলুদ সর্বে খেত। অস্তাগে রসপুরে প্যাশেল বেঁধে বারোয়ারি কালি, সন্তোষী মা। সাদা, ন্যাংটো শিবের বুকে কালি। চার হাত নয় দু-হাত। দুপাশে ডাকিমী যোগিনী। শিব তার পুরুষাঙ্গটি জাগিয়ে রেখেছে। পাশেই কলিকাতা থাম। টুনি বাল্বের চিকিমিকি আলো। দূরে কারা যেন পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের তোয়াক্তা না করে বাজি ফাটাচ্ছে।

ও শিব, তুমি ন্যাংটো কেন? সজলের মনে হচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে চাঁদা তুলছিল ছেলেরা। বিলে গাড়ির নাশ্বার লিখে দিছিল। আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম। তৈত্ন্যকাকার শ্রাদ্ধে। বাবা তো কবেই নেই। ভাইদের মধ্যে একজনই বোধহয় রইল।

সিগারেটে একটা ভীম-টান দিল সজল। তার মনে পড়েছিল সরু রাস্তা। পাশাপাশি দুটো অ্যামবাসাড়ারও যেতে পারে না। রাস্তার ধারে বারোয়ারি। জোড়া ঢাক বাজিয়ে চান করানো কালো পাঁঠা, পুজোর অন্য জিনিস, ফুল, জবার মালা নিয়ে হাঁটছে কোনো মানত করা গৃহস্থ। কলিকাতা থামের অস্তাপি কালিপুজোয় পাঁঠা পড়বে।

সারিকা জয়সোয়ালের চিল সমীরের কথামতো মুছে গেল বেহালার আকাশে। অথচ আমি আজ ভোরে শঙ্খচিলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চিনিমাসিকে দেখলাম। আমাদের পুরোহিতমশাই দীনবন্ধু পঞ্চতীর্থের মেয়ে।

ঠাকুমা গঞ্জ বলত, অনেক অনেকদিন আগে আমাদের রসপুরে একটা ঠোঁটভাঙ্গা শঙ্খচিল, সে বাড়ির ছাদে বসে—

তুমি তো লভনের পাখির কথা বলছিলে সজলদা—দাঁড়কাক, ঘুঘু। শীতে তাদের জন্যে ঘর। দ্যাখো আমাদের ইন্দিয়াতেও কিন্তু—

আমি তো রসপুরে ঠাকুমা মানদাসুন্দরীর কথা শুনতে পাচ্ছি।—ওই ঠোঁট ভাঙ্গা অলঝেয়ে চিল। যে বাড়িতে বসে সে বাড়িতেই একটা কেলেক্ষারী।

মানদাসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে রহস্যের চিল। যেন এখনই ছোঁ মারবে। আর আমি বছর সাত-আটের সজল চক্রবর্তী দেখতে পাই কোনো গরমের দুপুরে চিনিমাসি আকাশে ভেসে থাকা চিলটাকে দেখতে থাকে। সে কি ওই ঠোঁট ভাঙ্গা? চিনতে পারি না।

এই চিনিমাসি, কি দ্যাখো ?

অঁা—কোথায় ?

ওই আকাশে—

কিছু না তো, বলতে বলতে চিনিমাসি আকাশ থেকে চোখ তুলে নেয়। তারপর সাদা কাপড়ে ঢাকে সারা গা। দূরে উধাও মাঠে ধূলোর আবছা বড় ওঠে। চিল ডানা মেলে মাথার ওপর চক্র দিতে আকাশ ফালা করে ডাক দেয়।

পাসে বড় করে চুমুক দিয়ে সজল বলল, ইন্দিয়ানরা পাখি তো ভালোই বাসে, দ্যাখো না। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান, পঞ্চত্বন্ত—সবেতেই পাখির গল্প—কিন্তু চিনিমাসির গজটা অন্যরকম।

কার ? বলতে বলতে সমীর নতুন সিগারেট ধরায়।

চিনিমাসিও একদিন জ্যোৎস্নায় হারিয়ে গেল ওই ঠোঁট-ভাঙা শঙ্খচিলের সঙ্গে ?

কোন ঠোঁট-ভাঙা শঙ্খচিল ?

ওই আমাদের থাম রসপুরে যেটা উড়ে এসেছিল। তখন আমার ঠাকুমা মানদাসুন্দরী বেঁচে। চিলটা হয়তো তারও আগে থেকে আছে।

সেটা কিরকম ?

ওই যে বাড়ির ছাদে এই চিল বসে, সে বাড়িতে একটা কেছা—

চিলটা কি আপনাদের রসপুরের বাড়ির ছাদে বসল ?

বসল তো ?

তারপর ?

তারপর আর কি ? চিনিমাসি হারিয়ে গেল আমাদের বাড়ি থেকে। এর কয়েকদিনের ভেতর তুঁতে খেল নিমাইকাকা। ভোর থেকে মুখে গাঁজলা তুলে তুলে—মারা যাওয়ার আগে কী কষ্ট ?

কিন্তু চিনিমাসি ?

আর আসেনি। কোথাও পাইনি তাকে।

কখনো দ্যাখোনি আর ?

দেখেছি হয়তো কিংবা দেখিনি—বলে হাসল সজল।

কি যে বলো না তুমি—একটু আগে বললে দ্যাখোনি কোনোদিন। আর এখন বলছ, দেখেছ হয়তো—কী করে হয় ?

হয়, হয় সমীর। হওয়াতে পারলে হয়। আমি আরো দুটো খাব। তুমি কি নেবে আর ?

না সজলনা। আমার কেটা কমপ্লিট। তুমিও নিও না আর। অনেকটা খেয়েছ।

শাই না সমীর। খেতে ভালো লাগে। প্রিয়নাথদা বলেছে, আমার নাকি কেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে। প্রিয়নাথদাকে চেনো তো তুমি ? বড় ঔপন্যাসিক গল্পকার। 'মর্যাদা থঞ্চ

অফ পাবলিকেশনস'-এ ছিলেন। তারপর 'শিল্প অফ পাবলিকেশনস'-এ। সেখান থেকে আমাদের 'ভিশন'-এ। সত্যিই কি আমার কেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে? তাহলে কেন আমি চিনিমাসিকে দ্যাখা না দ্যাখাটা স্পষ্ট করে বলতে পারি না। আমায় কি অ্যালকোহলিক মনে হয়? বড় ভুঁড়ি। সরু সরু হাত পা। ফোলা ফোলা থমথমে মুখ। আমি কি বেশিদিন বাঁচব না সমীর! লীনাকে নিয়ে বুচানকে নিয়ে। এসব কিছুই বলা হলো না সজলের। তার টেবিলে নতুন পেগ পৌছে গেছে। দূরে তখনই শব্দটিল ডেকে উঠল কি? সেই রসপুর প্রামের মতো? সজল নতুন ড্রিংকস নিতে নিতে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল।

অনেকটা যদি পেটে পড়লে মাথার ভেতর ক্যারামের লাল ঘুটি বার বার এদিক-ওদিক করে। প্রেসক্রাব থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্না টের পায়নি সজল। বুবতে পারল ট্যাঙ্গি নিয়ে বাড়ি পৌছে। বাড়ির সামনে জ্যোৎস্নার মলাট। লোহার গেট সরিয়ে ভেতরে চুকতে চুকতে অনেকদিন পর আমগাছের কালতে মতো ছায়ায় চিনিমাসিকে দেখতে পেল সজল। তার গায়ে চাঁদের আলো জড়িয়ে আছে।

চিনিমাসি আমি—

চিনিমাসি কোনো কথা বলল না।

তার সাদাটে আঁচল মিশে যেতে চাইছিল চাঁদের রঙে।

তুমি এত ফরসা চিনিমাসি! লীনার থেকেও। সজল সহজ হতে চাইছিল।

আমগাছের ডাল-পাতার আড়াল থেকে ভাঙা ঠোটের আবছা ছায়া ভেঙে যাচ্ছিল সজলদের উঠোনে। চাঁদ-ভেজা আমগাতা, ডালের সেই ছায়াময়তা থেকে ভাঙা ঠোট, ডানা মোড়া কোনো চিলকে আলাদা করতে পারছিল কি সজল?





একান্ত গোপনে

পার্থ দত্ত

শিলিগুড়িতে কালই পৌছনোর খুব দরকার প্রিয়বৃত্তর, ব্যবসা সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে। কিন্তু এসপ্লানেডের দূরপাহার বাসগুমটিতে এসে যখন সে জানতে পারলো শিলিগুড়িগামী শেষ রাফেট বাসে একটা আসনও ফাঁকা নেই, আর শেষ রাফেট বাস ছাড়তে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী ছিল। প্রিয়বৃত্ত মাথায় হাত দিয়ে বসলো, নির্ঘাত নতুন কন্ট্রাক্টে হাতছাড়া হয়ে যাবে। এখন উপায়! ঠিক এই সময়ে যেন পরিদ্রাতার ভূমিকায় এসে হাজির হলো বছর চরিশ-পাঁচশের এক সুন্দরী যুবতী।

টিকিট রিটার্ন কাউন্টারের সামনে এসে মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, ‘দেখুন, আমার নাম মণীষা মজুমদার, আমার স্বামী দীপক বিশেষ একটা জরুরী কাজে এখানে আটকে পড়ায় শিলিগুড়ি যেতে পারছেন না। তাই ওঁর টিকিটটা ফেরত নিতে হবে।’

‘শেষ মুহূর্তে টিকিট ফেরত?’ বুকিং ক্লার্ক রমেন খাস্তগির একটু ইতস্তত করলো, হঠাৎ প্রিয়বৃত্ত কথা মনে পড়তেই সে কাউন্টারের সামনে তাকালো। প্রিয়বৃত্তকে দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘মশাই, এই যে মশাই শুনছেন? একটু আগে আপনি না শিলিগুড়ির একটা টিকিট চাইছিলেন? যোগাড় হয়ে গেছে। ভাড়ার টাকাটা দিয়ে টিকিটটা নিয়ে যান।’

টিকিটের নাম শুনে প্রিয়বৃত্ত হস্তস্ত হয়ে ছুটে এলো বটে কিন্তু টিকিটটা অন্য এক ভদ্রলোকের, ফেরত দেওয়া হচ্ছে, তবে তার স্ত্রী যাচ্ছে। প্রিয়বৃত্ত আপন্তি এখানেই, বাসে মেয়েটি সারারাত তার পাশেই থাকবে। প্রবাদ আছে, ‘পথে নারী বর্জিতা!’ তাই কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

তাকে ইতস্তত করতে দেখে বুকিং ক্লার্ক এবার অস্বস্তি গলায় বলে উঠলো, ‘ঠিক আছে, আপনি না নিলে অন্য ইচ্ছুক যাত্রীকে টিকিটটা দিয়ে দিচ্ছ।’

অন্যাত্রী মানে বছর চলিশ বয়সের ষণ্মার্ক একটা লোককে দেখে মণীষা ঘাবড়ে যায়। সে এবার প্রিয়বৃত্ত দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো, ‘আপনার তো আজই শিলিগুড়ি যাওয়া খবই জরুরী। তাহলে যাচ্ছেন না কেন?’ এখানে একটু থেমে মেয়েটি আবার বললো, ‘ঠিক আছে, টিকিটের দাম বাসে উঠে দিলেও চলবে। এখন আমার সঙ্গে আসুন তো। বাস এখনই ছেড়ে দেবে।’

প্রিয়ব্রত আপনি করার আগেই মণীষা তার হাত ধরে একরকম জোর করেই তাকে টানতে টানতে বাসে নিয়ে গিয়ে তুললো। টু-সিটেড আসন। মেয়েটি জানালার ধারে বসে প্রিয়ব্রতকে আহ্বান জানালো। ‘বসুন !’

‘আপনার টিকিটের দার্শনা ?’

‘আরে পালিয়ে তো যাচ্ছেন না, সামনে সারাটা রাত পড়ে রয়েছে, মণীষা হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রতের হাত ধরে তাকে তার পাশে বসিয়ে দিলো একরকম জোর করেই।

মেয়েটির মধ্যে কি জানু ছিল কে জানে, এবারেও সে কোনো আপনি করতে পারলো না।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন টায় রকেট বাস ছেড়ে দিলো। রাত ন টা শীতের রাত, রাস্তা প্রায় ফাঁকা। রকেট বাস, রকেটের মতো দ্রুত গতিতে ছুটে চললো তার গন্তব্যস্থলের দিকে। ফাঁকা বি টি রোডে আসতেই বাসের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেলো। ডানলপ ব্রীজের সামনে ইঠাং ট্রাফিকের আলোটা লাল হয়ে উঠতেই বাসের চালক দ্রুত ব্রেক করতেই যাত্রীরা হড়মুড়িয়ে এ ওর ঘাড়ে লুটিয়ে পড়লো।

এদিকে প্রিয়ব্রত ও মণীষার অবস্থা তাঁথেবচ। দু'হাত দিয়ে প্রিয়ব্রতের গলা জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে মণীষা। তার বুকের কাঁপন তখন আছড়ে পড়ছে প্রিয়ব্রতের বুকে। ওরা কতক্ষণ যে ওভাবে জড়িয়ে বসেছিল কেউ তা জানে না। পিছনের আসন থেকে এক ছোকরা টিপ্পনী কাটল, কি দাদা, খুব লেগেছে?

এমন একটা নোংরা মন্তব্যের উন্তর দিতে ইচ্ছে হলো না প্রিয়ব্রতের। তার বদলে অস্ফুটে মণীষার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, আরে ছাড়ুন এবার। বাসের যাত্রীরা যে দেখছে...।

দেখুকগে! মণীষা আরও নিবিড় করে প্রিয়ব্রতকে জড়িয়ে ধরে কপট অভিমান করে বললো, বাসের বাঁকুনিতে আমার লাগলো, আর ওরা রঙ-রসিকতা করছে? না, ওদের কথায় কান দেবেন না।

আঘাত পেয়েছে শুনে প্রিয়ব্রতের কেমন যেন একটু মায়া হলো মেয়েটির ওপর। তাই সে মণীষার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় লেগেছে?

এইখানে, এই বলে প্রিয়ব্রতের ডানহাতটা ধরে নিজের বুকজোড়ার মাঝখানে চেপে ধরলো মণীষা, ছাঢ়তে চাইল না।

প্রিয়ব্রত ঘাবড়ে গেলো। বাস তখন রকেটের গতিতে আবার ছুটতে শুরু করেছিল। ওদিকে বাসের যাত্রীরা আবার আগের মতো ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল তখন। প্রিয়ব্রত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ওরা এমন রসালো দৃশ্য দেখলে আর রক্ষে ছিল না। রাতের জার্নি বলে বাসে মাত্র দুটি আলো জ্বলিল, একটা গেটের মুখে, আর একটা ঠিক ওদের আসনের পেছনে। কম পাওয়ারের আলো হলো হলো মেয়েটির মুখটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। অন্য আসনগুলো প্রায় অস্পষ্ট আলোয় ডুবেছিল, তাতে

একটা বাড়তি সুবিধে হলো এই যে দূর থেকে ওদের গতিবিধি অন্য যাত্রীদের চোখেই পড়ছে না। তবু সাবধানের মার নেই, প্রিয়বৃত্ত তার হাতটা মেয়েটির বুকের ওপর থেকে তুলে নিতে গেলে মণীষা এবার আরো জোরে চেপে ধরলো ওর পাখীর মতো নরম বুকের ওপরে। অনুভবে বুবালো প্রিয়বৃত্ত অজাণ্টে তখন যে মণীষার একটি স্নন তার হাতের তালুবন্দী হয়ে গেছে খেয়ালই নেই তার। ব্রাহ্মীন বুক। মেয়েটির স্বাস্থ্য ভীষণ ভালো। তার ওপর বিশাল স্ননের চাপে মনে হচ্ছিল ব্লাউজ না ফেটে যায়। সামনের দিকে বোতাম ব্লাউজের। ওপরের দুটি বোতাম খুলে গেছে, স্নজোড়ার উপরের অনেকখানি উন্মুক্ত, আলোয় উন্মুক্তিত। সংকোচ হচ্ছিল, তাই প্রিয়বৃত্ত বোতাম দুটো লাগাবার চেষ্টা করতেই মণীষা তার হাত চেপে ধরে অস্ফুটে বলে উঠলো, থাক না, আমার ও দুটো দেখতে কি তোমার খুব খারাপ লাগছে? এই দেখো আমি তোমাকে তুমি বলে ফেললাম।'

'ঠিক আছে, ও কিছু নয়।'

'না ঠিক নেই। তুমিও তাহলে আমাকে তুমি করে ডাকবে বলো?'

মণীষা তার মনের কথাটাই বলেছিল। সেও যেন কেমন একটু একটু করে মেয়েটির প্রতি আসন্ত হয়ে উঠেছিল। তাই সে আর আপত্তি করলো না, বললো, 'ঠিক আছে, তাই বলবো।' এই বলে প্রিয়বৃত্ত অবিন্যস্ত শালটা একহাতে তার বুকের ওপর গুছিয়ে বিছিয়ে দিলো। ওপর হাতটা মেয়েটির বুকের ওপরেই তেমনি রাখা ছিল। এর ফলে বাসের অন্য যাত্রীরা জেগে উঠে তাদের দিকে তাকালেও তার হাতের কাজকর্ম তারা আর দেখতে পাবে না, এই ভাবে আশ্চর্ষ হলো সে। তার গতিবিধি দেখে মেয়েটি হাসলো, স্থির চোখে তাকালো প্রিয়বৃত্তের দিকে। তুমি তাহলে এতক্ষণে সাবালক হলে?

'কি করে বুবালে?'

'শালটা দিয়ে আমার বুক ঢেকে দিলে কেন?' মণীষা কপট গভীর মুখে বললো, 'একবার আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করলে না?'

প্রিয়বৃত্ত তার ব্লাউজের অবশিষ্ট বোতামগুলো খুলতে খুলতে তেমনি রহস্য করে বললো, 'এর পরেও কি তোমার অনুমতি নিতে হবে?'

'না গো না', মণীষা ঠোঁট ফেলালো, 'তুমি কি ঠাট্টাও বোবো না?'

এতে প্রিয়বৃত্তের সাহস আরও বেড়ে গেলো। ততক্ষণে ব্লাউজের সব বোতামগুলো তার খোলা হয়ে গেছিলো। স্নজোড়া পুরষ্ট, সুগঠিত এবং সুডোল। প্রিয়বৃত্ত ভালো করে স্নন্দুটি তার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মৃদু চাপ দিতে শুরু করলো। মণীষা হাত সরিয়ে দিলো না। বরং আবেগকম্পিত গলায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'আরও আরও জোরে টিপে দাও, খুব ভাল লাগছে।' এই বলে মণীষা হঠাতে একটা অস্তুত কাজ করে বসলো, প্রিয়বৃত্তের মাথাটা নিচে নামিয়ে এনে তার ঠোঁটজোড়া নিজের ত্রপ্ত ওষ্ঠ দয়ের কাছে নিয়ে এলো। চুম্বনের জন্য মুখ তুললো মণীষা। প্রিয়বৃত্ত তার

মনের কথা জেনে গেছে ততক্ষণে। তাই সে তার শালটা নিজের মাথার ওপর টেনে বাকী অংশটুকু মণীষার শরীরের ওপরের অংশটুকু ঢেকে দিলো। এখন প্রকাশ পাওয়ার মতো ওদের শরীরের কোনো অংশই খোলা পড়ে রইলো না। নিশির ডাকে সম্মোহিত নারীর মতো দেখাছিল মণীষাকে। যদু হাসলো প্রিয়বৃত, হঠাতে আকাঙ্ক্ষিত কিছু পেয়ে যাওয়ার হাসি যেন। এখনে এই চলন্ত বাসের মধ্যে যাত্রীরা সবাই যেখানে গভীর ঘুমে আছেন, ঘটনার এমন উৎসাহব্যঙ্গক পরিবেশে হঠাতে কেমন যেন মণীষাকে ভাল লেগে গেল প্রিয়বৃতের। মণীষাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ওর খোলা প্রশংস্ত বুকে হাত বোলাতে বোলাতে প্রিয়বৃত ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। পেলব হাতের স্পর্শে সংবাহনের আরাম দিতে চাইলো মণীষাকে। অকপট হাসিতে প্রিয়বৃত যেন ওকে অবশ করতে চাইছে। মণীষা চুম্বনের জন্যে মুখ তুলতেই প্রিয়বৃত ওকে ওর সেই ছেট্টি আসনে শুইয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে, পোশাকের ওপর থেকেই জঘনে চাপ দিলো মণীষার তলপেটে, আর সেই অবস্থাতেই আলো আঁধারিব ছায়াঘন অবস্থায় দুটি ছায়ামূর্তি চুম্বিত হয়ে রইল। মণীষার মনে হলো, এই তার স্বামী। ওদিকে প্রিয়বৃত হয়তো কঞ্জনা করলো তার বিবাহিত স্ত্রী অনুসূয়াকে, এই মুহূর্তে যাকে সে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। আর এভাবেই দুটি দেহে দুটি অন্য মন তরঙ্গায়িত হলো। বাসের সেই স্বল্পালোকে প্রিয়বৃত মণীষার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ও এখন ওর তপ্ত ঠোটে চুম্বনের প্রত্যাশী। প্রিয়বৃত বাসের সেই স্বল্প পরিসরে ঠেস দিয়ে নিজের শরীরের নিচে মণীষাকে শোয়ালো, নিজে তার দেহের ওপর নিজের দেহটাকে কোনোরকমে বিছিয়ে দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে, শাড়িতে আবৃত মণীষার জড়ঘায় এবং তলপেটে চাপ দিতে থাকলো, আর সেই অবস্থাতেই সেই আলো আঁধারিতে দুটি ছায়ামূর্তি চুম্বিত হয়ে রইলো, চুম্বন যতক্ষণ না বিস্বাদ ঠেকলো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারোর কাছ থেকে বিছিন্ন হতে চাইলো না। মণীষার মনে হলো, এই তার স্বামী বিজন, যাকে সে শরীরী সম্পর্কে পেতে চায় না, আর প্রিয়বৃত হয়তো কঞ্জনা করলো তার স্ত্রীকে, যাকে সে নিবিড় করে পেতে চায় কিন্তু পায় না কোনো এক কারণে। দুটি দেহে দুটি অন্য মন তরঙ্গায়িত হতে থাকলে তাদের এতদিনের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষা হঠাতে ক্ষণিকের এই প্রাণিযোগ তারা এখন ভারিয়ে নিতে চাইলো কানায় কানায়। কিন্তু তারা এও জানে যে, এই চলন্ত বাসের মধ্যে তাদের সব আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটতে পারে না, সম্ভবও নয়। তবু যেটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট, আর যা না পাবে পথের কামনা বাসনা সব পথেই ফেলে রেখে যেতে হবে।

অনেকক্ষণ পরে মণীষার ঢোকে-মুখে একটা সুখ-ত্ত্বির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এবং প্রিয়বৃতও। প্রিয়বৃত প্রথমে মণীষার কমলালেবুর কোয়ার মতো রসসিক্ত ওষ্ঠ দ্বয় থেকে নিজের ঠোটজোড়া বিছিন্ন করে শান্ত স্মিন্ফ গলায় মিষ্টি সুরে বললো, এবার ছাড়ো।

আর একটু প্রিজ, মণীষা এবাব নিজের থেকে সক্রিয় হয়ে দুহাতে প্রিয়ব্রতৰ গলা
জড়িয়ে ধৰে তার ঠোঁটজোড়া নিজের ওষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে পুৱে চোষণে ব্ৰত হলো।
চোষণ অতি দ্রুত হলো এবাব, যেন চুম্বনে রসনাৰ শেষ ফেঁটা সে চুম্বে নিতে চাইছে
প্রিয়ব্রতৰ ওষ্ঠ দ্বয় থেকে। তাৰপৰ তখনকাৰ মতো একেবাৰে নিঃশেষ হয়ে যেতেই
সে বিছিন্ন হলো প্রিয়ব্রতৰ থেকে।

কেমন লাগলো? প্রিয়ব্রতৰ দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে মণীষা
জিঞ্জেস কৰো।

তোমাৰ রসালো ঠোঁট নাকি চুম্বন!

দুটোই! এই বলে হাসলো প্রিয়ব্রত। কপট অনুযোগ কৰে আবাৰ বললো, তবে
মন ভৱলেও দেহ কিষ্ট অপূৰ্ণই রয়ে গেলো।'

এখন এ পৰ্যন্তই থাক, পথ চলা এখনও শেষ হয়নি, দীৰ্ঘ পথ এখনও বাকী
ৱায়েছে। মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলে টুকটাক প্রাপ্তিযোগ ঘটলেও ঘটতে পাৱে তাৰ
বেশি কিছু নয়। যেমন এই মুহূৰ্তে আমি তোমাকে তোমাদেৱ অতি প্ৰিয় জিনিষটা
খাওয়াতে পাৱি।'

সেটা কি, থামলে কেন? প্রিয়ব্রত অধীৰ হয়ে বললো, বলো কি সেটা? আমি
কে সেটা চোখে দেখতে পাৱি?

না অনুভবে বুবো নিতে হবে, মণীষা রহস্য কৰে বলে তাৰ শালেৱ নিচে প্রিয়ব্রতৰ
মাথাটা আড়াল কৰে চেপে ধৰলো নিজেৰ বুকেৰ ওপৰ। ব্ৰাউজেৱ বোতাম খোলা
মণীষাৰ বুক। শালেৱ আড়াল হলোও মণীষাৰ লক্ষ্য কিষ্ট স্থিৰ ছিল, প্রিয়ব্রতৰ মুখ্টা
সে তাৰ আকাঙ্ক্ষিক একটা স্নন্বৃন্তেৰ ওপৰ চেপে ধৰলো। হাঁ, মণীষা খুবই প্ৰিয়।
চোষণে দারণ মজা। এই অভ্যাসটা পুৱৰুষৰা তাৰে জন্মলগ্ন থেকে শেখে তাৰে
মায়েদেৱ কাছ থেকে। মণীষাৰ বুকে দুধ নেই, তাতে কি হয়েছে? বাড়িতে তাৰ র-
চা খাওয়াৰ অভ্যাস আছে, র-চায়ে চায়েৱ ফ্ৰেঞ্চৰটা ভাল পাওয়া যায়। সেই রকম
ৱ-স্তনেও স্তনেৱ বেশ মাদী মাদী গৰ্জ থাকে, হাত দিতে ভাল লাগে, শুঁকতে ভালো
লাগে আৱ চুষতে সে তো স্বৰ্গসুখ লাভৰ মতো। প্রিয়ব্রত আৱ অপেক্ষা কৰতে
পাৱছিল না, পালা কৰে মণীষাৰ দৃষ্টিস্তন বেশ আয়েস কৰে চুষতে শুৰু কৰলো।
স্ফুরিতক চুম্বনে ও চোষণে রক্তবৰ্ণ হলো ওষ্ঠদ্বয়, মণীষা স্তন আৱও চেপে ধৰলো
প্রিয়ব্রতৰ মুখে, চোষণে বৃষ্টি পড়া কদম্বেৱ মতো কণ্টকিহ হলো স্তনযুগল।

আঃ কি চমৎকাৰ তোমাৰ স্তনজোড়া? একবাৰ বিছিন্ন হয়ে প্রিয়ব্রত বলে
উঠলো।

ভাললাগছে? মণীষা জিঞ্জেস কৱলো।

দারুণ!

কলেজে ইকোনোমিক্সে পড়েছিলাম 'ল অব ডিমিনিশিং-এৰ' কথা। ভালো জিনিয়
বেশি খেলেই তাড়াতাড়ি ফুৱিয়ে যায়। আৱ নয়, ওঠো এখন। উঃ তোমাৰ শৱীৱটা

কি তারি !

এই সময় পিছনের আসনের এক যাত্রীর ঘুম ভেঙে গেলো। তার আড়মোড়া ভাঙ্গার শব্দ হতেই মণীষা প্রিয়ব্রতকে ঠেলা দিলো, এই ওঠো, কেউ বোধহয় জেগে উঠেছে।

প্রিয়ব্রত দ্রুত মণীষার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে উঠে বসলো।

স্যারি ! মণীষা মুখ টিপে হাসলো। দুঃখ করো না শ্রিয়, পরে আমি তোমাকে সুন্দে আসলে পুরিয়ে দেবো।

প্রমিস ?

প্রিয়ব্রতের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মণীষা বললো, হ্যাঁ, শপথ নিলাম !

মাঝারাতে বাস এসে থামলো মালদায়। অনেকক্ষণ থামবে এখানে।

কিছু খাবে ? প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো।

যা খাইয়েছ, এরপর অন্য আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই, রহস্যময় হাসি হেসে মণীষা বললো। এত সব খাওয়ার পরেও তোমার খিদে পেয়েছে!

তেমন করে খেতে দিলে কই ? প্রিয়ব্রতও কপট অনুযোগ করতে ছাড়লো না।

সে তোমার দুর্ভাগ্য, পিছনের আসনের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো মণীষা। মণীষা কি বলতে চাইছে তা বুবতে অসুবিধে হলো না প্রিয়ব্রতের।

বেশ, অন্তত এক কাপ কফি ?

তা মন্দ হয় না, যা শীত পড়েছে, শরীরটা একটু গরম না করে নিলে নয় !

সে কি তুমি গরম হওনি ? মণীষার একটু আগের রসিকতার বদলা হিসেবে বললো, এত গরম খাওয়ার পরেও —

এ গরম সে গরম নয়। মণীষাও রসিকতা করতে ছাড়লো না। তাছাড়া কি এমন গরম করতে পারলে তুমি ?

সুযোগ পেলে দেবো তোমার মধ্যে কেমন আমি আগুন জ্বালিয়ে দিই। হাসতে হাসতে বললো প্রিয়ব্রত।

তার আগে আমিই তোমার মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দেবো।

না তুমি তা পারবে না, প্রিয়ব্রত। এবার একটা মোক্ষম রসিকতা করলো, দেশলাইকাঠিটা কেবল আমার কাছেই আছে, তোমার কাছে নয় !

দুষ্ট কোথাকার, মণীষা কপট ধূমক দিয়ে প্রিয়ব্রতের প্যান্টের বোতামের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললো, এই দেশলাইকাঠির জন্য এতো দেমাক তোমার ?

হ্যাঁ অবশ্যই ! আর একটা কাঠিই যথেষ্ট, তোমার সারা অঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে আমার এই দেশলাইকাঠিটা। তা জ্বালবো নাকি ?

না, না, দোহাই তোমার, মণীষা তাকে থামিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলো, লক্ষ্মীটি, এখানে লক্ষাকাণ্ড বাধিয়ে বসো না, শিলিগুড়িতে চলো, সেখানে তুমি যত খুশি আগুন জ্বালাও, আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দাও না কেন আমি কোনো ভাবেই আপত্তি

করবো না।

কথা দিছ?

কেন, একটু আগেই তো আমি তোমাকে কথা দিয়েছি। মণীষা বললো।

ঠিক আছে, আমি তাহলে কফি আনতে চললাম। হ্যাঁ, তাই যাও।

* * *

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রিয়বৃত এই প্রথম মণীষার পারিবারিক প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

স্থামী আর দস্তক নেওয়া একটি ছেলে।

দস্তক নেওয়া ছেলে? প্রিয়বৃত একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, কেন, তোমাদের বিবাহিত জীবনের কোনো ফসল তুলতে পারোনি?

অনেক দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার স্থামী ইমপোটেন্ট, বাবা হওয়ার অযোগ্য।

তাই বুঝি? প্রিয়বৃত দুঃখ প্রকাশ করলো, আমি দুঃখিত।

না, না, এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে? বিষণ্ণ গলায় মণীষা বললো, এ আমার দুর্ভাগ্য। আর তাই তো তোমার মতো একজন ভাল বন্ধু পেয়ে আমি লোভ সামলাতে পারিনি। আমার কথা থাক, এখন তোমার কথা বলো। তোমার বিবাহিত জীবন কি রকম বলো।

স্ত্রী ও একটি বছর তিনেকের ছেলে নিয়ে আমার সংসার বেশ সুখেই কাটছিল, কিন্তু ভগবান বোধহয় সব সুখ একসঙ্গে দেন না। তা না হলে আমার স্ত্রী হঠাতে পক্ষাঘাতে পঙ্কু হয়ে পড়বে কেন বলো? প্রায় এক বছর হলো, স্ত্রীর সঙ্গে আমার শারীরিক কোনো সংযোগ নেই। আর তাই বোধহয় আজ হঠাতে তোমার এমন মধ্যে সঙ্গ পেয়ে আমি একটু বেহিসেবীপনা করে ফেলেছি।'

না, না, এটাইতো প্রকৃতির ধর্ম, নারী পুরুষ একত্রিত হলে এমনি হয়। তুমি এমন কিছু বেহিসেবীপনা করোনি। আমার বিশ্বাস, শিলিঙ্গড়িতে গিয়ে আমি অতৃপ্ত জীবনে আরও বেশি করে তৃষ্ণি আনতে পারবো। স্থামী নেই, ওখানে গিয়ে তুমি আমার বাড়িতেই উঠবে। আমার ছেলে বেলা এগারোটায় ফিরে আসে, আশাকরি তার আগেই তোমাকে পরিপূর্ণ তৃষ্ণি দিয়ে ফেরাতে পারবো।

সকাল হতেই রকেট বাস এসে পৌঁছলো শিলিঙ্গড়িতে। কালবিলম্ব না করে বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রিয়বৃতকে সঙ্গে নিয়ে মণীষা সোজা তাদের হিলকার্ট রোডের বাড়িতে ফিরে এলো। তখন বেলা প্রায় নটা। বাড়ি ফাঁকা। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গেছে কাজের মেয়ে শান্তি, তাকে একেবারে নিয়েই ফিরবে এগারোটার পর। এই দুঘণ্টা, নটা থেকে এগারোটা তাদের মিলনের স্বর্গরাজ্য বলে মনে করলো মণীষা। এত বড় বাড়িতে তারা দুজন এখন। টয়লেট থেকে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিলো তারা।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে মন্দু হাসলো প্রিয়বৃত, বিজয়ীর হাসি। আর এখানে এই নির্জন বাড়ির মধ্যে হঠাতে কেমন যেন ভালো লেগে গেলো মণীষার প্রিয়বৃতকে।

ওর কাছে গিয়ে ওর খোলা প্রশংস্ত বুকে হাত রাখলো, কাঁধের পেশীতে হাত বোলালো, তারপর গলা জড়িয়ে ধরলো। পেলব হাতের স্পর্শে সংবাহনের আরাম দিতে চাইলো প্রিয়ব্রতকে। প্রিয়ব্রত হাসছে। কপট হস্তিতে প্রিয়ব্রত যেন ওকে অবশ করে দিতে চাইছে। মণীষা ভাবছে, এই সময় হঠাত যদি ওর স্বামী এসে হাজির হয় ওদের এভাবে মিলিত হতে দেখে দেখুক। একটা ঝীবকে ও আর ভয় পাবে না, ও এখন ওর মনের মানুষের সঙ্গান পেয়ে গেছে। প্রিয়ব্রতকে কথা দিয়েছে ও। কথা রাখতে উদ্যোগী হলো মণীষা। যেন ওর পুরুষ কৌমার্য হরণ করছে এমনভাবে প্রিয়ব্রতকে সজোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো মণীষা, ওকে ঘর্ষণ করলো নিজের নখ দেহে, তারপর প্রিয়ব্রত পরনের পোশাক টেনে খুললো, হাত দিয়ে অনুভব করলো ওর উদ্যত রিংসার ফলা, ছাড়লো না, মুঠোয় ধরে রইলো।

প্রিয়ব্রত অস্ফুটে বলে উঠলো, কি সুন্দর বুক তোমার মণীষা!

আর তোমার এই সোনারকাঠিটাও কম সুন্দর নয় প্রিয়ব্রত, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে আমার স্বামীরটার থেকে দ্বিগুণ, যেকোনো মেয়ের কাছে এটা লোভনীয়।

প্রিয়ব্রতের সারা শরীর টান-টান হয়ে উঠেছে। সত্যিকার পুরুষমানুষ। উপযুক্ত শৃঙ্খার আবিষ্কার করতে চায় প্রিয়ব্রত। টের পেয়েছে, মণীষার তৃপ্তি-সাধন খুব সহজ নয়। তাই শৃঙ্খ ওকে অবশ না করলে শুধু সোনারকাঠির স্পর্শে ওর রাগমোচন হবে না। ওর দেহ বেয়ে খানিকটা নামলো প্রিয়ব্রত, মণীষার সন্মের অগভাগে মণ্ডলীকার কালো দাগযুক্ত জায়গায় মুখ রাখলো, লেহন করলো স্তনটা উৎকুল্পন সন্মের খানিকটা মাংস দুই পাটির সবগুলো দাঁত দিয়ে বৃত্তাকারে গ্রহণ করে মৃদু চাপ দিলো। এক স্তন থেকে প্রিয়ব্রতের মাথাটা তুলে আর এক স্তনে আনলো মণীষা এবং বললো, এটাকেও একটু দেখো! মণীষার নিঃশ্বাসে হঞ্চা, নাকের পাটা ফুলছে, কথা জড়িয়ে আসছে, কোমল গোপনাঙ্গ আর্দ্র হচ্ছে। মণীষার নাভিমূলে হাত বুলালো প্রিয়ব্রত। একটু একটু করে আরও নিচে উরসন্ধিতে উভাপ অনুভব করলো, হাতের স্পর্শে দুই উরু প্রসারিত করলো মণীষা। আবেগকম্পিত গলায় বললো, আর পারছিনে। নিতম্ব ওপরের দিকে বার বার ঠেলে তুলতে মণীষা ওর ত্রিভুজে বিন্দু করাতে চাইছে প্রিয়ব্রতের সোনার কাঠি, দুহাতে ওর পুরুষকঠিন পশ্চাদভাগ টেনে আনছে নিজের কাঁকালের দিকে। প্রিয়ব্রত বেশ বুঝতে পারছে মণীষার চোখ মুখ উগ্র সঙ্গমেছায় বিস্তারিত, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত। উত্তৃঙ্গ উত্তেজনার মুহূর্তে দুহাতে মণীষার কোমর জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে ওকে ওপরের দিকে টানলো প্রিয়ব্রত, যুক্ত হলো দেহে দেহে প্রবিষ্ট হলো মণীষার মধ্যে। মণীষা অধীর আনন্দে বলে উঠলো, আঃ!

কি সুন্দর তোমার ত্রিভুজ মণীষা।

ভালুকাগছে? আরও জোরে...।

কিন্তু প্রিয়ব্রত তাড়াছড়ো করছে না দেহে দেহে দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে নিষ্ক্রিয় প্রিয়ব্রত আবেশে চোখ বুজে উপভোগ করছে। ওদিকে মণীষা আর স্থির থাকতে

পারছে না। কেমন নির্লজ্জের মতো বললো, ও, আর একটু, আর একটু...

এবার সক্রিয় হলো প্রিয়বৃত এবং অস্ত্রক্ষণের মধ্যেই ওর উভাপে ঘৌবনের যারকরস বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝারে পড়তে থাকলো মণীষার দেহের অভ্যন্তরে। দুজনেরই এক সঙ্গে রাগমোচন হলো। আর অবসম্ভ দুটি দেহ ওই অবস্থায় পড়ে রাইলো আরও কিছুক্ষণ।

মণীষার কাছ থেকে বিছিম হয়ে টয়লেটে গিয়ে চুকলো প্রিয়বৃত, মণীষাও অনুসরণ করলো ও কে। এ ওর মিলনজনিত সমস্ত ক্লেদ, ময়লা ধূয়ে মুছে সাফ করে দিলো। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে প্রিয়বৃত ঘড়ির দিকে তাকালো, সাড়ে দশটা। বললো, তোমার ছেলের ফেরার সময় হয়ে এলো, এবার যাই।

আবার কবে দেখা হবে? মণীষার চোখে আকুতির ছায়া পড়ে।

আবার দেখা কেন, এই তো ভালো, মন্দু হেসে প্রিয়বৃত বললো, পথের দেখা পথেই তো শেষ হলে ভালো হয়, তাই না।

মণীষা ফ্যালফ্যাল করে প্রিয়বৃতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রাইলো। কি উত্তর দেবে ও? এই মুহূর্তে ওর সারা দেহ-মনে প্রিয়বৃতের সুখ-স্মৃতি জড়িয়ে আছে, অন্য কথা ভেবে সেটা ও মুছে দিতে চাইলো না।



ଅବୈଧ

ସୌରେନ ଦତ୍ତ

ଉଠି ନିଃଶ୍ଵାସ ନିତେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହଜେ ଆବାର, ବେଶ ବୁଝିତେ ପାରଛି, ଯେ କୋନୋ ମୁହଁର୍ତ୍ତେ ଆମାର ଦମ ବନ୍ଧ ହୁୟେ ଥେତେ ପାରେ, ତଥାନ ଆମି ଖବରେର କାଗଜେର ଶିରୋନାମ ହୁୟେ ଯାବୋ ? ବେଚାରା ! ଜୀବନେର ରଙ୍ଗ କି ଜୀବନୋ ନା, ପାଗଳ କରା ମେଯେଦେର ଶରୀରେର ପ୍ରାଣ, ପ୍ରଥମ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ା ମାଟିର ସେଂଦୋ ସେଂଦୋ ଗନ୍ଧ ତାର ଆର ନେଓଯା ହଲୋ ନା, ତାର ଆଗେଟି...ନା, ନା, ଆମି ବାଁଚତେ ଚାଇ, ଆମିଓ ଆମାର ଅବୈଧ ବାବା-ମାୟେର ମତ ଏକଟା ବେଜମ୍ବା ସଞ୍ଚାନେର ଜୟ ଦିଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିତେ ଚାଇ, ଦେଖିତେ ଚାଇ ଶେବ କି, ଆମାର ଏତୋ ବନ୍ଦିଦିଶା ଯାପନ କରତେ କରତେ ଦୁପୂର ଗ୍ରହଣ ଶୁଣଛେ ? ଏଥନ ରାତ କି ଦିନ ଠିକ ବୋବା ଯାଇଛେ ନା । ଆମାର ଚୋଖେ ଟୁଲି ପରାନୋର କତୋ କି ଏକଟା ଜିନିଯ ଚେପେ ଦେଓଯା ହେବେ, ତାଇ ଦେଖିତେ ଅସୁଖିଥେ ହଜେ । ଆମି ଏଥନ କୋଥାଯଇ ବା, ଏହି ସବ କଥା ଭାବତେ ଭାବତେ କଥନ ଯେ ସୁମିଯେ ପଡ଼େଛି ଖେଳାଲ ନେଇ । ଆମି ଯେନ ଏଥନ ସ୍ଵପ୍ନେର ଦେଶେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଛି ।

ଆମାର ଏଥନ ଭୀଷଣ ହଜେ ହଜେ ଦେବଦାସ ହିଁ । ପାରକେ ନା ପାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକେ ତୋ ପାବୋ । ଏଥନ ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମେଯେଇ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ପାରକ ମତୋ କଜନ ସତୀ ମେଯେ ଆଛେ ? ତାଇ ନିଦିନ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକେ ପେଲେଓ ଚଲବେ । ଆମି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀର ଖୌଜେ ବେରିଯେ ପଡ଼େଛି ଆପନାର ସ୍ଵପ୍ନେର ରାଜ୍ୟେ ।

ଆମାର ଅବହା ଅନେକଟା ଅଭିମୁନ୍ୟର ମତୋ, ମାୟେର ପେଟେ ଥାକାର ସମୟ ଥେକେଇ ଶୁଣେ ଏସେଛି, ଆଦିବାସୀ ମେଯେଦେର ରଙ୍ଗ କାଳୋ ବଲେ କି ହବେ ଓଦେର ମନ ଖୁବ ଭାଲୋ । ଆର ଶରୀରେର ଯେନ ତୁଳନାଇ ହୁୟ ନା, ଯେମନ ନରମ ତେମନ ଗରମ । ଓଦେର ହାତଛାନି ଆମାର ବାବା ଏଡ଼ାତେ ପାରେନି । ବାବା ଝାଡ଼ଗ୍ରାମେର ଏକ ଜଙ୍ଗଲେର ଫରେସ୍ଟ ଅଫିସାର, ଆର ସେଇ ସୂତ୍ରେ ସାଂଗ୍ରାତାଳ ଆଦିବାସୀଦେର ସଙ୍ଗେ ଖୁବ ମେଲାମେଶା ଏର । ଫଳେଇ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ମେଯେର ପ୍ରେମେ ପଡ଼େ ଯାନ । ବଲାବାହଳ୍ୟ, ସେ ପ୍ରେମ ଦେହଗତ । ଆମାର ବାବା ଏକଜନ ଲେଡି କିଲାର, ତାଁର ନଜରେ ଏକବାର ଯେ ପଡ଼େ ତାର ରେହାଇ ନେଇ, ତାକେ ତିନି ତାଁର ଶଯ୍ୟାସଙ୍କିନୀ ନା କରେ ଛାଡ଼େନ ନା । ଏ ନିଯେ ଆମାର ମାର ସଙ୍ଗେ ବାବାର କମ ବଗଡ଼ାଯାଇଟି ହତୋ ନା, ଆମି ଆମାର ମାୟେର ଜଠରେ ଥେକେ ଓଦେର ସବ କଥା ଶୁଣେଛି । ମା ବାବାକେ ବଲେଛିଲେନ, ‘‘ତୁମି ଏକେର ପର ଏକ

নতুন যেয়ের মুখ দেখে বেড়াচ্ছে এদিকে তোমার পুরনো সঙ্গীনীর খবর কি
রাখো?..." কি খবর আবার?..." "এসব ব্যাপারে খবর তো একটাই! আবার
তোমার তা হতে চলেছি?"..." এ আর এমন নতুন কি কথা আগুনের ওপর
যি পড়লে সে জ্বলবেই। আর সেই আগুন নেভানোরও ব্যবহা আছে। যেমন
এর আগে তিনবার করেছিলে।"..."না, এবার আমি তা আর করবো না। এবার
আমি তোমার সঙ্গনের মা হতে চাই। যতো তাড়াতাড়ি সঙ্গব আমাদের বিয়ের
ব্যবহা করো রজত।"..." বিয়ে করবো বললেই তো যখন তখন করা যায় না।
আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।"...

"বেশ, সেই দিনটার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকবো..." তারপর থেকেই
আমার মধ্যুভৌ ভ্রমের বাবাটি উধাও। তখন আমার কুমারী মায়ের গর্ভপাত
করার সময় আর ছিল না, খুবই অ্যাডভাস স্টেজ তখন, প্রায় আটমাস। তাই
অগত্যা আমার মাকে দশমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। তারপর...তারপর
আমার দৃঢ়বিনী মায়ের কথা, আর আমার পরিণতির কথা এখনি বলতে চাই
না। তার আগে আমার বাবার চরিত্রের প্রভাব কিরকম আমার মধ্যে পড়েছিল
সেকথাই বলি শুনুন :

নারীলোভী বাবার রক্ত আমার রক্তে প্রবাহিত। বাবার সব গুণ না পেলেও
একটা গুণ আমি ঠিক পেয়েছি। আদিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠ হওয়ার
স্বপ্ন দেখছি এখন থেকেই।

রূপবর্তী চিংকার করে উঠলো, উঃ লাগছে, আর পারছিনে। যা করার করো
আমাকে হত্যা করে করো, তখন আমি তোমাকে বাধা দিতে আসবো না।"..."সুন্দরী
রূপবর্তী, তোমার নার্সের চাকরী স্থায়ী করতে হলে তোমার রূপ থেকে আমার
মধ্যে একটু তো খরচ করতে হবে। আর রূপের সঙ্গে তোমার দেহও তো খরচ
করতে হবে। না, আর বাধা দিও না খুকুমনি এবার আমার খোকনসোনাকে তোমার
ঘরে ভালোভাবে প্রবেশ করতে দাও। আমার খোকন একটু লম্বা আর বলিষ্ঠ,
তাই তাকে হয়তো তোমার ঘরের দরজায় আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তুমি যন্ত্রণা অনুভব
করছো, দরজার কপাট দুটো পুরোপুরি খুলে দাও, তাহলে দেখবে তখন তোমার
আর লাগবে না। লক্ষ্মী সোনা, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, বাধা দিও না।

আমি এখন আদিবাসী পুরুষদের সঙ্গে নাচছি। আমার পরনে পশুর ছাল আর
মাথায় পাখির পালকের মুকুট। আমার সঙ্গে আগুন রঙের স্ত্রীলোকটি উন্মত্তের
মতো নাচছে। তার অনাবৃত বুকে উল্লিঙ্ক আঁকা একটা ছুটন্ত হরিণের পিছনে ধাবমান
নিষাদ। শালবনের তেতোরে সেই হেলিকপ্টার নামার হেলিপ্যাডের চাপন বৈশাখী
পূর্ণিমার কাঙ্কন মেলায় যাবার পথ। দূরে দীর্ঘির জলে জ্যোৎস্না পড়ে চক্চক
করছে উৎসব মুখর রাত্রি, বাতাসে দিলী মদের গন্ধ, মহয়ার মাতাল করা ছ্রাণ।

দেবলীনা, শুভরত, আমার সমবয়সী। আমার সঙ্গে থাকলেও এরা কিন্তু নাচছে না আমাদের সঙ্গে। ওরা আদিবাসীদের ভাষা বুঝেনা বলেই বোধ হয় ওদের সঙ্গ এড়িয়ে দূরে দূরে থাকতে চাইছে। কিংবা এমনও হতে পারে জন্মলগ্ন থেকেই ওরা এ ওইকে নিজেদের জীবনসাধী করে ফেলেছে। আমার চোখের আড়ালে থেকে শালবনের নৈশলোকে তরুবীথির নিচে মিলন-বাসর রচনা করতে উদ্যত। দেবলীনার চোখে সেই তীব্র চাহনি যা আমার অতল পর্যন্ত দেখতে চায়। ডুম-ডুম-ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং।

ফরেস্ট বাংলোর ড্রেসিং মিররের সামনে শ্যাম্পু করা অবিন্যস্ত চুল নিয়ে দীঘিতে সাঁতার কটা সেই মেয়েটি মুখ দেখছে ; সায়ার গিট আলাগা হয়ে গেছলো ঠিক করছে। সায়ার লেসে নবাবী আমলের জাফরী। পীন পয়োধের স্থূলিত প্রায় অর্জুবাস। বাংলোর লনের অঙ্ককারে মাদীগঞ্জে বিভোর এক যুবক পদচারণ করছে, হাতে তার একটা জুলন্ত সিগারেট শয়তানের চোখের মতো জুলজুল করছে। অ্যাপার্টমেন্ট সংলগ্ন টয়লেটের ফোয়ারা থেকে জল পড়ার ছর-ছর শব্দ। অ্যাপার্টমেন্টে আশ্লেষকাতর কঠস্বর, ‘মাহরী আমি কি তোমার পরপুরুষ, বুকের জামাটা খোলো না, তোমার বুকটা কি সুন্দর, ঠিক যেন পাকা আম টস্টস্ করছে...’

জন্মস্থানের একটা বিশেষ আকর্ষণ যে আছে, তা অশীকার করা যায় না, আর তারই টানে আমি ফিরে যাই নার্সিংহোমের সেই বিষম কেবিনে আমি শুয়ে আছি। নীলাভ একটা আলোর বৃন্ত তার তলা দিয়ে সাদা পোশাকের নার্স হাতে ওযুধ নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। দূরে, ঠিক কতো দূরে, শালবনের জঙ্গল, আদিবাসী, আদিবাসীদের নাচ-গানের দৃশ্য তা বোঝাবার মতো জ্ঞান আমার এখনও হয়নি। সেই সবুজ অরণ্যজনীর শব্দ যেন ভেসে আসে আমার কানে। আবার সেই শব্দ হারিয়ে যায় নার্সদের পায়ের জুতোর খট খট শব্দে। আমার বেডের সামনে দিয়ে একজন নার্সকে চলে যেতে দেখলাম।

ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং...

নক্ষত্রের নীল আলো জুলে শালবনের মাথায় সারি সারি তরুবীথির কথাগুলো যেন লালে লাল, আগুন-লাল। আমি এখন আবার শালবনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার সদ্য বন্ধুর দল আদিবাসী সাঁওতালদের খোঁজে। কিন্তু কই কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, এমন কি কারোর কোনো কথাও শুনতে পাচ্ছি না। শুধু বাতাসে শন-শন-আওয়াজ, সেই হাওয়ায় আদিবাসীরা সবাই হারিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো তাদের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, এখন আর শুনতে পাচ্ছি না সেই শব্দ ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং...

আমাকে এখন একটা কালো পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। চারদিকে কালো পিচের মতো অঙ্ককার থিক থিক করছিল। একজন পুলিশ ইঙ্গিপেষ্টেরের নির্দেশে

আমাকে এই কালো ভ্যানে করে নিয়ে চলেছে, দু'পাশে সারি সারি ঘনো তরুবীথি। পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথায় বুঝতে পারলাম ওরা আমাকে একটা সরকারী হাসপাতালে নিয়ে চলেছে। হাসপাতাল? চমকে উঠলাম, আমার আবার কি হলো, আমি তো বেশ ভালোই আছি। তাছাড়া আমার শরীর খারাপ, অথচ আমি জানবো না? তবে কি ওরা আমাকে চিকিৎসার নাম করে আসলে হত্যাই করতে চাইছে, যেমন করে আমার অবৈধ বাবা আমার মায়ের গর্ভপাত করতে চেয়েছিল? তার মানে ওরা আমাকে মর্গে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর সেখানে হবে আমার নরক যন্ত্রণা, কাটা-ছেঁড়া, ছুরি চালিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে ফালা ফালা করে কাটবে এ কাজ হবে আমার ওই বেজন্মা বাপের! না, তার আগেই আমাকে পালাতে হবে। একটা পাঁচমাথার মোড়ে পুলিশের ভ্যানটা থামতেই আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে লাফ দিলাম সেখান থেকে। আবার আমার একা একা পথ চলা। আমার চলার পথে যদি কেউ না আসে তবে একাই আমি পথ চলবো, পথ চলাতেই আমার আনন্দ।

আমার চোখের সামনে একটু আগেই আমার ন্যূনত্ব-সঙ্গীনীর নগদেহ হিস্তেল ন্যূন করতে করতে তার জরায়ুর মুখটা যেন নীল জুলন্ত নক্ষত্র হয়ে গেলো। তার মাথায় এখন এক বন্যপাখির পালক।

রাত শেষে ভোর হলো, তারপর সময়ের হাঁটা পথে পায়ে পায়ে সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো। চারদিকে এখন শুধু উচ্চল রোদে দিঙাস্ত প্রসারী ফসলের মাঠ। মেরেটার নগ শরীরের নাচন মাঠের আল দিয়ে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ক্রমশ এগিয়ে আসে। চারদিকে এখন নীল থমথমে আকাশ। আমি একা কোথাও কেউ নেই, শুধু আমার চিংকার প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ে,—রূপবতী, রূ-প-ব-তী, রূ-প-ব-তী, হাওয়ার ভেতর শব্দগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। ফসলের মাথায় এখন নীল নক্ষত্রের মতো যোনি। আমি নিঃসঙ্গ, ভীষণ একা। শুভরত আমাকে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। আমি এখন হাওয়ার ভেতর, আলোর ভেতর, ফসলের ভেতর একটা নীল যোনি দেখতে পাচ্ছি।

ফরেস্ট বাংলোয় আবার ফিরে এলাম। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে এখন শুধু নরনারীর কঠস্বর। ড্রেসিং মিররে শ্যাম্পুকরা চন্দ্রমুখীর চুল, তার বুকের খয়েরী বেঁটাতে মানুষের মুখের লালার দাগ। চন্দ্রমুখী ট্যাবলেট খেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে, হিংস্র শ্বাপদের ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণে তছনছ করছে সঙ্গে থেকে প্রসাধিত চন্দ্রমুখীর দেহকে। মাঝে মাঝে দু'টি দেহের উত্তাল রক্তের মাদলের তালে তালে। খাটের শব্দ উঠছে খট, খট, খট। একটা হিংস্র শ্বাপদ চন্দ্রমুখীর জরায়ুর মুখে এখন উন্মত্ত। চন্দ্রমুখী মেঘলা জ্যোৎস্নায় উন্মুক্ত বারান্দা পেরিয়ে কলঘরে গিয়ে চুকেছে। ফোয়ারা বেয়ে জলের ধারা, নামছে ছুরছুর শব্দে।

আমি এখন সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করি। আমি এখন আর বন্যনাচে

অন্যদের সঙ্গে সামিল হই না। আমাকে এখন আর উভব্রতৰ সঙ্গে ফরেস্ট বাংলোৱ
ঘৰে ঘৰে চুকে দেহক্ষুধাৰ খাই থীজতে হয় না। আমি এখন একা হলেও ক্লান্ত
নই। কাৰণ আমি এখন আমাৰ জন্মস্থান সেই নাসিং হোমেৰ বিল্ডিং-এৱে লনে
কৃপবতীকে দেখতে পাই, তাৰ স্পৰ্শ অনুভব কৰি, আৱে দেহেৰ মিষ্টি দ্বাণ পাই
নাকে, তাৰ নৰম শৰীৱেৰ স্বাদ গ্ৰহণ কৰতে পাৰি। আমি এখন আমাৰ নিশ্চিন্ত
আৱামেৰ বিছানা ছেড়ে বেৰিয়ে পড়েছি, হাঁটতে দীৰ্ঘিৰ সামনে এসে
পড়েছি। দীৰ্ঘিৰ ধাৰে একজন বিষণ্ণ মুখেৰ মেয়েকে এক বন্ধুশাপদেৰ দ্বাৱা
আক্ৰমণ হতে দেখি, আৱে তাৰপৰ সেই শ্বাপদ মেয়েটিকে ধৰণ কৰে গভীৰ
অৱগতিৰ ভেতৰ লাফ দেয়। ঠিক তখন শুকু হয় সেই ধৰ্মিতা মেয়েটিকে ঘিৱে
বন্য হৈ হংসোড় এক জায়গায় জড়ো হয়ে কামুক যুবক যুবতী তখন যে দুৰ্বোধ্য
ভাষায় গান গায়, যাৱ ভাষা অন্য কেউ আৱে না বুৰাতে পাৱলেও আমি কিন্তু
স্পষ্ট বুৰাতে পাৰি। কাৰণ আমি যে জানি তাদেৱ কাম-লালসাৱ ফসল তো আমিই,
তাদেৱ শ্বাপদ কাম-প্ৰবৃত্তিৰ ফসল তো আমিই, মাঠে মাঠে যেসব ফসলেৰ চূড়ায়
আমি নাৰী যোনি দেখে এসেছি, তা আমাৰই এক কামুক মাঝেৱ, যেখানে যে
মূৰ্খ চাষী ফসল ফলিয়েছে, সে তাৰ ফসল তুলতে চায় না, সে পলাতক, আমি
এখন আমাৰ অবৈধ পিতা-মাতাৰ অপেক্ষায় রয়েছি, কে আমাৰ ভাৱে নেবে শেষ
পৰ্যন্ত কিছুই স্পষ্ট নয় এখন। জানি না শেষ পৰ্যন্ত আমাৰ আশ্রয় হয়তো কোনো
অনাথ আশ্রম হতে যাচ্ছে। আমি যুবক-যুবতীদেৱ কাউকে চিনি না সেসব।

আমি দীৰ্ঘিৰ ধাৰ থেকে সৱে গিয়ে আৰাৰ শালবনে চুকে পৱেছি এখন।
দূৰ থেকে আৰাৰ ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিডিং...

আমি আৰাৰ জন্মস্থান নাসিংহোমে চলে এসেছি, সেখানকাৰ আউটডোৱেৰ
প্ৰক্ৰিয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আউটডোৱ ফাঁকা, ৱোগী দেখাৰ সময় নয়,
তাই এখানে একমাত্ৰ আলো ছাড়া সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনেৰ
সেই লাল ত্ৰিকোণ দেখলাম ধীৱে ধীৱে একটা মুখোশ হয়ে গেলো। তাৰপৰ আৱে
একটা জৱায়ুৰ মুখ হয়ে গেলো। দূৰ থেকে দেখলাম আমাৰ একদা সদিনী
কৃপবতীকে সঙ্গে নিয়ে একটি মন্তন গিগিয়ে আসছে, সে এই নাসিংহোমেৰ শ্ৰমিক
কৰ্মচাৰী ইউনিয়নেৰ প্ৰেসিডেন্ট, আৱে ভৱমা এখানকাৰ ক্লাস ফোৱ স্টাফ। আমি
সঙ্গে সঙ্গে আউটডোৱেৰ রিসেপসনিস্ট কাউন্টাৱেৰ অনুকাৰ জায়গায় ছুটে গিয়ে
আশ্রয় নিলাম তাদেৱ পৰবতী কাৰ্য্যকলাপ দেখাৰ জন্য। একটু পৱেই মন্তন যুবক
আদিবাসী যুবতী কৃপবতীকে গভীৰ আলিঙ্গনে আবদ্ধ কৰে আমাৰ সামনে দিয়ে
নিয়ে গেলো একেবাৱে এক কোণায়, যেখানে আলো আঁখারিৰ বেলা চলছে।
তাৰা গিয়ে বসলো একটা সোফায়। তাৰপৰ সেই সোফায় তাকে চিৎ কৰে ফেলে
দিলো আৱ ধীৱে ধীৱে মেয়েটিৰ অৰ্তবাস খুলে ফেলে ওকে গভীৰ ভাবে আদৰ
কৰতে লাগলো। তাকে আদৰ কৰে আস্তে আস্তে উক্ষ্টা দিক কৰে

যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাকে প্রয়োচিত করতে লাগলো মাস্তান যুবকটি। অবশ্য রূপবতী ঠিক এর জন্যে দেহমনের দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবেছিল একটু-আধটু সেক্স খরচ করে যুবকটিকে খুশি করতে পারলে নাস্বিংহোমে তার নার্সের চাকরীটা স্থায়ী করে নেওয়ার সুযোগ আদায় করে নেবে তার কাছ থেকে, কারণ সে তাদের ইউনিয়নের নেতা, আর নেতারাই তো আজকের দিনে দ্বিতীয় নিয়োগকর্তা। কিন্তু পরে যে এভাবে যুবকটি কাম-লালসার কাছে পরাভূত হতে হবে, সেটা তার জানা ছিল না। সে এখন বেশ বুঝতে পারছে ধর্ষিতা হতে চলেছে সে, কিন্তু তার করার কিছু নেই। তার গলা শুনে কেউ এখন আর আসবে না, কাছেও কেউ নেই। আউটডোরে এখন কেবল তারা দু'জন। এখানে মাস্তান যুবকটি যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া দৈহিক বলেও মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে। আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে পুরুষবাই নারীদের ওপরে থাকে। এমন কি নর-নারী আদিম প্রবৃত্তি দৈহিক যিলনের ক্ষেত্রেও নারীকে সব সময়েই পুরুষের নিচে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের চিরাচরিত আকাঙ্ক্ষা এবং দৈহিক শক্তির নিরীথে মাস্তান যুবকটি গায়ের জোরে রূপবতীকে সম্পূর্ণভাবে নগ করে (নিজে আগেই নগ হয়েছিল) তার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে উদ্যত হলো। একটু একটু করে রূপবতীর শরীরের নিচে, কোমরের আরো নিচে উরুসন্ধিতে ভয়কর যন্ত্রণা অনুভব করলো, মাস্তান যুবকটি ঠিক মতো প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য তার হাতের স্পর্শে মেয়েটির পুষ্ট উরু প্রসারিত করলো। রূপবতী চিৎকার করে উঠলো, ‘উঃ লাগছে, আর পারছিনে। যা করার করো আমাকে হত্যা করে করো, তখন আমি তোমাকে বাধা দিতে আসবো না।’... ‘সুন্দরী রূপবতী, তোমার নার্সের চাকরী স্থায়ী করতে হলে তোমার রূপ থেকে আমার মধ্যে একটু তো খরচ করতে হবে। আর রাপের সঙ্গে তোমার দেহও তো খরচ করতে হবে। না, আর বাধা দিও না খুক্মনি এবার আমাকে খোকনসোনাকে তোমার ঘরে ভালোভাবে প্রবেশ করতে দাও। আমার খোকন একটু লম্বা আর বলিষ্ঠ, তাই তাকে হয়তো তোমার ঘরের দরজায় আঘাতপ্রাণী হচ্ছে, তুমি যন্ত্রণা অনুভব করছো, দরজার কপাট দুটো পুরোপুরি খুলে দাও, তাহলে দেখবে তখন তোমার আর লাগবে না। লক্ষ্মী সোনা, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, বাধা দিও না, অঙ্ককারে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি মাস্তান যুবকের চোখ মুখ উদগ্রস্ত সঙ্গমেছায় বিস্ফারিত, স্নায়ুমণ্ডলী উদ্বেজিত। উত্তুঙ্গ উদ্ভেজনার মুহূর্তে দুহাতে রূপবতীর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরের দিকে টানলো, মেয়েটির বিরোধিতা সঙ্গেও দেহে দেহে যুক্ত হতে বাধ্য হলো, মাস্তান যুবকটি তার কহ প্রতিক্ষিত আকাঙ্ক্ষা চিরিতার্থ করতে প্রবিষ্ট হলো রূপবতীর মধ্যে। রূপবতী আর্ত চিৎকার করে উঠলো, হায় ভগবান, আমি ধর্ষিতা হতে চাইনি, উঃ! মাস্তান যুবকটি একতরফা রূপবতীর দেহ উপভোগ

করে উঠে দাঁড়ালো। আসার সময় রূপবতীর কোমর জড়িয়ে চুকলেও সে তাকে ধর্ষণ করে একাই বেরিয়ে গেলো আউটডোর থেকে। আর আমি এখন রূপবতীর বুকে উকি আঁকা ছুট্ট হরিণের পিছনে ধাবমান নিষাদকে দেখতে পাইছি। আগে আমাকে শালবনে তার সঙ্গে নাচ করার জন্য রূপবতী যেভাবে আহান করেছিল, এই অন্ধকারের পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেইভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকলো। আমি এখন এক নীল নক্ষত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী ধর্বিতা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার ত্রিভুজ এখন মাস্তান যুবকের যৌবনের জারকরসে সিঁকিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি আর শুনেছি, রূপবতী ষেছায় ওই মাস্তানের সঙ্গে ষেছায় দেহ মিলতে প্রবৃত্ত হয়নি, জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ হেন অবস্থায় আমার কি করা উচিত? আমি কি ওর হাতছানিতে সাড়া দেবো?

পরের দিন। একটানা অবসাদের মধ্যে আমকে আবার আরেকটা দিন বাঁচতে হবে। স্বপ্নের সেই ঘনজঙ্গলের শহরে আমি এখন আর ফিরে যেতে পারবো না। সেই নার্সিংহোমের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নার্সের পোশাকে রূপবতীকে হেঁটে যেতে দেখবো না। আমার মনের দেওয়ালে সেই নির্বর নিসর্গের ছবিটাকে এখন আমার আবার মনে হচ্ছে এক জটিল জরায়ুর মুখ রাত্রির রহস্যে আচম্ভ, যার ভেতর নিহিত আছে আমার বিগত রাত্রির স্বপ্ন। গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা আর স্বপ্ন এখন আমাকে ভীষণ আচম্ভ করে আছে। আমি আর শুভব্রত সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাই একটা অমোঘ ইচ্ছার তাড়নায়। বন্ধ ঘরের মধ্যে আবধ্য না থেকে শালবনের একটা নিষিদ্ধ এলাকায় ঘরে বেড়াই। অস্পষ্ট অন্ধকার, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। শুকনো পাতায় নর-নারীর দুটি শরীরের মিথুনাবদ্ধতার শব্দ হয়। নারী সঙ্গেমলোভী ইতস্তত তৃঝর্ণাকাতর যুবক যুবতীরা ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন আমরা কি ভয়ঙ্কর ভয়াবহভাবেই না বেঁচে আছি হয়তো বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছি। জীবনের স্বাদ আমাদের বিশায়তে ভরা। যেন কোথায় আমরা ভীষণভাবে দায়বদ্ধ। আমার চোখের সামনে আমার মনের দেওয়ালের ছবির জটিল জরায়ুর মুখ। আমি এখন শুভব্রতকে ছেড়ে চলে যেতে চাই। ও ওর সঙ্গিনী দেবলীনাকে নিয়ে পড়ে থাকুক। আর আমি ফিরে যেতে চাই আমার প্রিয়সঙ্গিনীর কাছে যার চোখের ভালোবাসার দৃষ্টিতে স্নান করেছি। সেই স্নানে আমার শরীরের সব ক্রেতে আর ময়লা মুছে গেছে। এই ময়লা আর ক্রেতে হলো আমার মায়ের জীবিত থাকার সময় আমার অবৈধ কাম্যক পিতার, তার কামনার জারকরস, যা সভ্য সমাজের কাছে ঘৃণিত, নিন্দিত এবং ধিকৃত। শুভব্রত হয়তো বলবে, চুপ কর গর্দভ, মেয়ের চোখের ভালোবাসার কথা বলছিস? তুই কি দেখেছিস মেয়েদের তলপেটের নিচের সেই জঙ্গলী চোখকে, আরো ভয়ঙ্কর কৃৎসিত ভাষায় সে আমাকে খিণ্টি করলো, যা ভাষায় থকাশ করা যায় না। হয়তো সে আবার বলবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে

দুদিন রাতে খাট কাঁপিয়ে ভালোবাসা, তারপর তো সারা জীবন ছুঁচোর কেন্দ্র। শুভব্রত আমায় সঙ্গ ছাড়বে না, হয়তো আমায় আজ রাতে নিয়ে যাবে সেই শালবনের নিষিদ্ধ এলাকায় সেখানকার আনাচে কানাচে আমাকে গুনতে হবে আশ্রেষকাতর কষ্টস্বর, জীবনের রিৎসারমুক্ত পুরুষের কামা আকৃতি। মেয়েদের চপল হাসি। রূপবতীর মতো যুবতী এবং গৃহবধু জাঞ্জবতাবে ধর্ষিতা হবে। আমার দ্বিতীয় রাতের স্বপ্নে আমি আগুন রঙের মিনিস্কটের ইন্দ্রজানিক নৃত্য দেখতে পাচ্ছি, আমার ঢোকৰ সামনে নক্ষত্রোজুল যোনি ফসলের মধ্যে আস্তে আস্তে মধ্যাহ্নের মতো নার্সি হেমের বিস্তি, স্বপ্নের মধ্যে ড্রেসিং মিররে শ্যাম্পু করা চুল, শায়ার গিট আলগা হওয়া কোনো ঘরের রতিগঞ্জান্ত দেহাপজীবিনীর বুকের খয়েরী চাকতিতে শুভব্রতের লালাসিঙ্গ ওষ্ঠের দাগ।

দেবলীনা, আমি চলে গেলে শুধু তোমাকেই আমার ঠিকানা দিয়ে যাবো, আমার ঘরে দেওয়ালের জটিল জরায়ুর মতো নির্বার নিসর্গের ছবিতে তখন দূর আকাশের নীল নক্ষত্রের আলো এসে পড়বে।

আমার সব আছে, অথচ কি আশ্রয় সব কিছু থেকেও আমি নেই। একটা ডেলা পাকানো রূপাঞ্জরিত শরীর আমার। দুদিন আগে অতি শুদ্ধ শুক্রকীট থেকে বৃণ হয়ে যে আমি জন্ম নিয়েছিলাম, কুমারী মায়ের জঠরের অন্ধকারে থাকার সময়েই শুনেছিলাম, আমাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর অনাস্তীয় আকাশের নিচে ওরা কেলে যাবে আমাকে কোনো নার্সিংহামে কিংবা রাস্তার ডাস্টবিনে, ছুরি আর কাঁচির যৌথ আক্রমণে। কুমারী মায়ের যোনিপথ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়েছিল, হে সৈক্ষণ্য তুমি কোথায়? আমার ভীষণ ইচ্ছে এখন বয়স্ক পুরুষের মতো বীর্যপাত করি কোনো অবাঙালী রমণীর যোনির ভিতর, কারণ শুনেছি, অবাঙালী রমণীও আজকাল বারোয়ারি। নরম মাংসের ভিতরে ফোলানো বেলুনে যদি কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারে আমার সৃষ্টি দশমাস, দশদিন তাহলে তো আর কথাই নেই। ব্যাটা নিষ্ঠয়ই জন্মাবে চেটপারিয়ামল হয়ে তারপর? তারপর আমি তখন অবাঙালী বাবার অবৈধ পিতা, ব্যাটা আমার ভেজান পথে টাকার কুমির হয়ে এবং আমার মতে পৃথিবীর যাবতীয় পূর্ণ্যকে নির্বিচারে হত্তা করতো, যাতে করে তারা শয়তানের আর জন্ম দিতে না পারে। আর সেই অবসরে আমি রাজধানীতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতাম আমার অবৈধ অবাঙালী বাবার কালো টাকায় কতগুলো এম. পি. কিংবা এম. এল. এ. কেনা যায়? তারপর? প্রধানমন্ত্রী, না হয় অঙ্গত কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আসন আমার পাকা তখন। আমি তখন এক অবৈধ সরকারের নেতা, এবং সেই সঙ্গে সব জংলী কানুনের প্রশঠে। তারপর সকাল হতেই সেই অবৈধ সরকারের রক্ষিতা। দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখতাম, বড় বড় ব্যানারে ছাপা, ভূণ হত্যা পাপ নয়। এই নিষ্ঠুর অইন্টা পাশ হয়ে গেছে ভোটাধিক্ষে। আর তারপরেই দেখলাম,

এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ একা, আমার অবৈধ পিতা-মাতা ফেলে গেছে
ডাঁষবিনে।

আমরা কথা বলতে পারি না, তাই জানা নেই ভাষা প্রতিবাদের এবং তার
প্রতিকারের। আমাদের ভূগ-গোষ্ঠীর হয়ে কে যেন প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু
পাত্তা পায়নি, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। ফেরার পথে দেখেছিল কুমারী জননীর,
উরু চিতিয়ে রোদ পোয়ানোর দৃশ্য। এবং সেই শয়তানটা আবার পচা শামুকের
গম্ভুরা যৌনিদ্বারে তার নাক ঢেকিয়ে দ্রাঘ নিছে জনোয়ারের মতোন। আর
ওদিকে তার লিঙ্গাগ্রে মাথা রেখে দুঁদণ্ড বিশ্রাম নিছে কুমারী জননী। কিংবা
এও হতে পারে তাতিয়ে নিছে তার রতিক্রিয়ার যন্ত্রটা, যেমন করে তাতিয়ে
নেয় হাতলটা ভাঙ্গা থালা-বাসন জোড়া লাগানোওয়ালারা ঝাল দেওয়ার আগে।
তারপর রাত্রি নামলে পর চলবে সারারাত ধরে দুই বিপরীত দুই মুখ, দুই বুক,
এবং দুজোড়া উরুর সঙ্গে সঙ্গে স্থলের যোগাযোগ। অর্থাৎ সঙ্গম!

এভাবে আরো কতো ভূগ হত্যা সংঘটিত হবে কে জানে!

আমার অবৈধ পিতা রাতের অন্ধকারে আমাকে শহরের এক নিরালা রাস্তার
ডাঁষবিনে একটা র্যাশনব্যাগে পুরে ফেলে রেখে গেছলো। পরের দিন সকালে
একজন কাজের মেয়ে আমাকে ডাঁষবিনে দ্রুদ্ধনরত অবস্থায় দেখে প্রথমে পাড়ার
ছেলেদের খবর দেয়, তারা এসে প্রথমে আমাকে র্যাশন ব্যাগ থেকে মুক্ত করে
পুলিশে খবর দেয়। কালো পুলিশভ্যানে করে আমাকে একটা সরকারী
হাসপাতালের সেমটারনিটি সেকশনে ভর্তি করে দেয়। আপাতত একজন মেট্রনের
ওপর আমার দেখভালের ভার দেওয়া হয়েছে। নার্সদের কথাবার্তা থেকে আমি
জেনেছি, আমাকে দস্তক নেবার জন্য ইতিমধ্যেই অনেকেই আবেদন করেছে। জানি
না আমার ভবিষ্যৎ কোথায় নির্ধারিত হবে!



পরকীয়া প্রেম উজ্জ্বলকুমার দাস

অনেক অভিধান ঘৈঁটে আমার স্তুর নাম রখেছিল আমার শ্বশুরমশাই 'মধুমতী'। তখন অবশ্যই সবই জড়গিণ। অয়েল ক্লথের উপর এক টুকরো ছেট কাঁথা আর তার উপর আমার প্রাপ্তের বউ। কিন্তু তিনি যেই ধেড়ে হলেন, ব্যস!

যখন আমি বিয়ে করবার জন্য আমার স্ত্রীকে প্রথম দেখতে গেলাম, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম আপনার? তখন লাজুক লাজুক মুখে বেশ মিহি সুরে টেনে বলল 'মধুমতী সাহা'।

আমার কানে তখন এমন সূর বেজে উঠল, যে মনে মনে বললাম আহা আহা...। কিন্তু বিয়ের তেরাত্তির পেরোতে না পেরোতেই মধুমতী, মধুমতীর খোলস ছেড়ে সংসারের সার্কাসে ভানুমতীর খেলা দেখাতে শুরু করে দিল। তখন মধুমতীর কোথায় সেই মধু' আর কোথায় সেই মতি। সব গুবলেট।

তারপর তো কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার স্ত্রীর শরীরে যাবতীয় রোগের আড়া বাসা বাঁধতে শুরু করল। দিনে দিনে গায়ে গতরে ফুলতে শুরু করল যেন ঠিক বশের টুন্টুনের দ্বিতীয় সংস্করণ। তারপর এসে উপস্থিত হলো বাত, দস্তশূল, অস্ত্রল ইত্যাদি। সব যেন হাত ধরাধরি করে লাইন ধরে আসছে আর যাচ্ছে। এ যেন এক নিরসন্তর গতি। জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভাবি বিয়ে করে কিই না ভুল করেছি। কিন্তু এ ভুল সংশোধন করবার কোন উপায় নেই। ভুল সংশোধন কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় চলে, কিন্তু জীবন খাতায় একদম চলে না।

কিছুদিন হলো আমাদের পাশের দোতালায় হরিহরবাবুর একখানা ঘরে একজন আটাশ-তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মহিলা ভাড়া এসেছে, একলাই থাকেন। ঘরটা আবার আমার শোবার ঘর থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দেখতে খুব একটা মন্দ নয়। ছুটির দিনে প্রায়ই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। একদিন আমার শ্যামলী ও ঘরের মধ্যে হালকা সুরে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা গেয়ে চলেছে। আর আমি ওর দিকে মুঢ় হয়ে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি আমার পিছনে আমার স্ত্রী মধুমতী কর্কশ সুরে টেঁচিয়ে বলল, 'কি গো, কখন থেকে যে ডাকছি বাজাবে কখন যাবে, তা কানে কোন কথাই চুকছে না, এ দিকে কি অতো মন দিয়ে দেখছ দেখি, বলে জানালার সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে শ্যামলী নেচে সেই গানটা গাইছে, ব্যস—

‘হঁয়া, তাইতো’, বলে চোখগুলো বড় বড় করে বলল, ‘আমার কথা শুনবে কি করে’, আমি গোবেচারির মতো বললাম ‘কেন কেন কি হয়েছে?’

—কি আর হবে, ভাগিয়ে আমি দেখলাম। আরো পরে দেখলে কি সর্বনাশই না হয়ে যেত।

—কেন, কি সর্বনাশ?

—দেখো অত ন্যাকামো কোর না তো। সকালবেলা এই জানলা দিয়ে এই ছুঁড়িটার নাচ দেখছিলে না? ভাবো আমি কিছু বুঝি না? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, না?

সব বৌদ্ধেরই এই একই রোগ, নিজের শাড়ীর মতো নিজের স্বামীটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে, অন্য কেউ তা গায়ে জড়াক, তা তারা মোটেই পছন্দ করে না।

থাক, স্ত্রীর ধাতানী খেয়ে লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবীটা গলিয়ে বাজারের থলিটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা দিছি, ঠিক এমন সময় রাঙ্গা ঘর থেকে সাতবাড়ি শুনিয়ে মধুমতী বলল, ‘রই মাছের মাথা এনো কিষ্ট।’

মাসের শেষ, রই মাছের মাথা? মনে মনে গালাগাল দিয়ে বললাম, ‘রই মাছের মাথা না এনে তোমার মাথা আনবো।’ বলে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় নেমেই আবার চোখটা চলে গেল সেই হরিহরবাবুর দোতলার বারান্দায়। তাকিয়ে দেখি শ্যামলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে ছুঁড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল। যেন কোন তেল কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মডেল। আমার দিকে চোখ পড়তেই শ্যামলীর ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল। হঠাৎ আবার মধুমতীর কথা মনে পড়তেই, পেছনের দিকে আমার বাড়ির বারান্দায় তাকিয়ে দেখলাম মধুমতী দাঁড়িয়ে আছে কি না। না নেই। তাই আমিও শ্যামলীর দিকে একটু মুচকি হেসে বাজারের দিকে রওনা হলাম।

প্রতি রিবিবারই বাজার সেরে আসবার সময় শভুর দোকানে কাঁচাপাকা দাঁড়িগুলো একটু কামিয়ে আসি। সেদিনও শভুর দোকানে গিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে কিরকম বুঢ়ো বুঢ়ো বলে মনে হলো। সারা মাথায় কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি। গালে এক গাল দাড়ি। পাকা চুল নিয়ে আর যা কিছু করা যায় কোন সুন্দরী যুবতীর হৃদয় কখনই জয় করা যায় না। স্বামীর চুল পেকে গেল, বৌরাই ঘ্যানঘ্যান করে, আর প্রেমিকা! ওরা তো পাতাই দেবে না। যাইহোক, শভুরকে বাকীতে চুলটা ভালো করে কলপ করিয়ে নিয়ে, মুখের দাড়ি কেটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। বয়স যেন অনেক কমে গেছে। যাইহোক খোশ মেজাজ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা এগারোটা। আমার পায়ের শব্দ শুনেই মধুমতী মধু বর্জন করে চীৎকার করে বলল, ‘কি হলো, বাজারে গিয়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?’

—তোমার মাথা আনতে গিয়ে সরি, কই মাছের মাথা আনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

মধুমতী কথা বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একবারে ‘থ’। তারপর বলল “একি পাকা চুল কালো, হলো কি করে? কলপ করেছ নাকি?”

আমি তাড়াতাড়ি খুশ হয়ে বললাম, “আমায় বেশ যুবক যুবক মনে হচ্ছে না?”

—যুবক! তোমায় ঠিক দাঁড়কাকের মতো দেখাচ্ছে। ময়ুরের পুছ লাগালে যেমন দাঁড়কাক ময়ুর হয় না, তেমন আধবুড়ো পাকা চুলে কলপ দিলে যুবক হয় না।

শুনলেন তো, আমার স্ত্রীর কথা। সব সময়ই বাঁকা বাঁকা কথা। কোথায় একটু আমায় যুবক বলে প্রশংসা করবে, তা না, শুধু সব সময় খোঁচা মেরে কথা।

আজকাল একটু স্মার্ট হয়ে চলতে চেষ্টা করি। মেয়েরা আবার একেবারে ল্যালাক্যাবলা ছেলে একেবারেই পছন্দ করে না। তাই ধূতির বদলে একটু প্যান্ট সার্ট সঙ্গে বুট পরে অফিসে বেরই। এই দেখেও স্তী-এর মনে জ্বালা। হঠাতে একদিন বলল “কি হয়েছে বলতো। তোমায় আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য করি বুড়ো বয়সে ছেঁড়া সাজবার স্থ হয়েছে। প্রেমে টেমে পড়লে নাকি?”

আমি একগাল হেসে বললাম, “ঘরে এমন সুন্দরী থাকতে, অন্যদিকে কি করে তাকাই। আর তাছাড়া এখন কি আর প্রেমের বয়স আছে!” অমনি গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, ‘ছাঁা, প্রেমের আবার বয়স। তোমাদের পুরুষ জাতটাকে একদম বিশ্বাস করি না। যত বুড়ো হয় তত বেশী বজ্জাত হয়।

ওমনি আমার মাথাটা টগবগিয়ে ফুটে উঠল। ‘দেখ জাতটাত তুলে কথা বলবে না। আর তাছাড়া তোমার মতো এরকম খিটির-মিটির করা বড় ঘরে থাকলে, স্বামীরা তো বিগড়ে যাবেই।’

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমার মধুমতী গর্জে উঠে এমন বলল, ‘কি আমি তোমার সাথে খিটির মিটির করি।’ এই আওয়াজে পাড়ার যেন একটা ছেটখাটো ভূমিকম্প হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে বেরোচ্ছ, ঠিক এই সময় আমার গিন্নী গ্যাসের চোতাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাওয়ার সময় একটু বুক করে যেয়ো। ব্যাস! অফিসের বারোটা, ভাগ্যস সরকারী অফিসের কেরানী।

তারপর নাচতে নাচতে গিয়ে হাজির হলাম গ্যাস দাদার কাছে। পাড়ার কাছে একটা বাড়ির গ্যারেজ ঘরে গ্যাস ঘর। ঐ ঘরে একটা টেবিল ঢেয়ার নিয়ে বসে আছেন আমাদের গ্যাসদাদা, আর তার সামনে এক বিশাল লাইন। গ্যাসের লাইনে সবাই প্রশংকর্তা, আর সব প্রশংকরই উত্তর দিয়ে চলেছেন গ্যাসদাদা। সব প্রশংকর্তারই একই প্রশ্ন, দাদা কবে পাঠাচ্ছেন? বাচ্চারা কাঁদলে যেমন বড়ো উফি নিয়ে বলে ‘আর কেঁদো না সোনা! আর কেঁদো না—’ ঠিক তেমনি গ্যাসদাদা সবাইকে বলে চলেছেন, ‘এই দু-চার দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।’ ছেলেদের লাইনের সাথে ফুরফুরে সব

সুন্দরী মহিলাদের লাইন। সব নতুন সংসার করছে। স্বামীরা সব অফিসে বেরিয়েছে। আর গির্জারা সুন্দর পারফিউম মেঝে গ্যাসের দোকানে লাইনে সেই আমার পাশের বাড়ির শ্যামলী।

শ্যামলীকে দেখেই মনটা কি রকম পাক দিতে শুরু করল। কি করে শুরু করি কথা, যদি কথা বলতে গিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি, তাহলে তো আর রক্ষা নেই। এই বয়সে পাবলিকের হাতে মার খেয়ে আমাকে এই ধরাধাম ত্যাগ করতে হবে। ভাবতে ভাবতে হঠাতে দেখি আমার পায়ের সামনে একটা সুন্দর কুমাল পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি তুলে শ্যামলীর দিকে হাসি হাসি মুখ করে বললাম, ‘এটা কি আপনার?’

শ্যামলীও হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার। তারপর আমার হাত থেকে কুমালটা নিল। কুমালটা নেওয়ার সময় শ্যামলীর নরম নরম হাতের ছেঁয়ায় আমার শরীরের রক্তে এক শিহরণ খেলে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে শ্যামলীর সাথে আলাপ জমাতে শুরু করলাম। আর মনে মনে আমার মধুমতীকে ধন্যবাদ দিলাম। মধুমতী যদি আমায় আজ এই গ্যাসদাদার কাছে না পাঠাত তাহলে শ্যামলীর সাথে আলাপ করার সুযোগ পেতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনেরই গ্যাসদাদার সাথে কথা চুকে গেল। তারপর ঐ গ্যারেজ ঘর থেকে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে এবং দিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালাম।

শ্যামলী আমায় জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কোথায় যাবেন?’

—আমি ডালহৌসী।

—ভালই হলো। আমিও ঐ পথেই যাব। চলুন একসাথে যাওয়া যাক।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম বাস স্ট্যান্ডে। লোকে লোকারণ্য। সবাই বাসে উঠবে। বাস আসছে, কিন্তু তাতে খুব কম লোকই উঠতে পারছে। বেশীর ভাগ বাসই বাদুড়োলা।

তারপর অনেক কষ্টে একটা বাসের মধ্যে আমি আর শ্যামলী দেহের কসরৎ দেখিয়ে উঠলাম। বাসে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। শ্যামলীর শরীরটা আমার শরীরের উপর লেপটে আছে। আমার বুকের উপর পড়ে আছে ওর সুগন্ধী একরাশ কালো চুল। তার গাঙ্গে আমি মোহিত হয়ে উঠেছি। জীবনটা যেন মনে হচ্ছে কবিতা। হঠাতে মনে হয় একি করছি আমি। এ পাপ। ঘরে আমার স্ত্রী আছে। শ্যামলীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। কিন্তু নিরূপায়। বাসের ভীড়ে এগাশ থেকে ওগাশ হবার উপায় নেই। কি সুন্দর নরম তুলতুলে শরীর। মনে হয় যেন ভগবান মোম আর মাখন মিশিয়ে শ্যামলীর শরীর তৈরী করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলাম ডালহৌসী। সময় যেন হস্তস্ম করে চলে

গেল। রোজ বাসে যেতে যেতে জ্যামে পড়তে হয়। কিন্তু আজ একদম জ্যাম নেই। বাস থেকে আগে নেমে রাস্তায় পা রেখেছি। শ্যামলী নামতে গিয়ে হঠাতে দেখি পড়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতটা এগিয়ে দিলাম। আমার হাতের উপর ভর দিয়ে টালটা সামলে নিল। এদিকে আমার হাতটাও ধন্য হলো।

তারপর দুজনে নেমে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। আমি আমার অফিসে চুকে গেলাম, আর আমার অফিসের পাশের পালিং-এ একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে শ্যামলী। সত্যি, একথা ভাবা যায় না। যাক, আসবার সময় আবার আমরা দুজনে ফিরি। শ্যামলীর অফিসে রোজ নটায় হাজির। কিন্তু আমার সরকারী অফিস। যখন হোক গেলেই হয়। বডিটাকে একসময় অফিসের মধ্যে শো করতে পারলেই ব্যাস। মাঝে মাঝে অবশ্য অফিসের হেডকন্ট্রাক থাকে, আমরা সম্মান দিয়ে বড়বাবু বলি। তিনি আমায় অনেকদিন বলেছে যে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। কিন্তু আমি ওসব কথায় কোনদিনই কর্ণপাত করিনি। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেল সব কথা কানে তুলতে নেই। যদিও তা ঢেকাই তা অপর কান দিয়ে আবার বাতাসে ছেড়ে দি। আমার দেরীতে আসার সুবাদে অনেকেই আমায় মাঝে মাঝে রঙ্গরসিকতা করে (অর্থাৎ যার অপর কথা টিপ্পনী কাটে)। আমার নাম দিয়েছিল ‘লেটুবাবু’। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যেমন চলছি তেমন চলব। চাকরী তো যাওয়ার কোন ভয় নেই। এতো আর প্রাইভেট ফার্ম না। যে একটু দেরী হলেই মাইনে কাটা। তারপরেও যদি বেয়াদপি করি, চাকরী ন্ট। এ হচ্ছে সরকারী অফিস। একদিনের কাজ দশদিনে করবো, মাঝে মাঝে ‘ওভারটাইম’ করবো। আর মাঝে মাঝে অফিস থেকে মাইনে বাড়ানোর দাবীতে বিরাট ঘিছিল করে সারা কলকাতার বুকে ট্রাফিক জ্যাম করে অবশ্যে এসপ্লানেড ইষ্টে বিরাট জনসমাবেশে যোগ। বড় বড় নেতাদের বড় বড় বুলি। আমি অবশ্য বড় বড় নেতা না হলেও ন্যাতা তো বটে। অফিসে রাজনীতি করি। তাই রাজনীতির নেতাদের আজকাল খুব একটা কেউ ঘাঁটাতে চায় না। একটা প্রচলিত কথা আছে যে “বাষে ছুঁলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর আজকালকার রাজনীতির দাদারা ছুঁলে একশ ঘা।”

যাক, আপনাদের সামনে আমার উপর বৈপ্লাবিক চরিত্রের পরিচয়টা দিতে চাই না।

এবার আমার ফুলটুসি, আমার প্রাণকুমারী শ্যামলীর কথা বলি। এখন রোজই সকাল আটটাৰ মধ্যে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই। ঐসময় শ্যামলীও বাসে ওঠে। একই সাথে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কখনো বা ভাগ্যে কুলোলে পাশাপাশি বসে দুজনে সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে অফিসে যাই। এ যে কি থিলিং তা ঠিক মুখে বলা যায় না।

আমাকে এত সকাল সকাল দেখে অফিসের লোকেরা তো একেবারে ‘থ’। কি হলো! আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো এর রহস্য। কিন্তু সত্যি কথাটা

বলতে পারলাম না।

অফিসে ফেরার সময়ও প্রায়ই আমরা একটুখানি হেঁটে আউটট্রাম ঘাটে গিয়ে পাশাপাশি বসতাম। নানারকম কথা বলতাম। সিনেমা হলের অঙ্ককারে বসে ওর দিকে হাত বাড়াতাম। শ্যামলী অবশ্য এসব কিছু আপন্তি করত না। মনে হত শ্যামলীও বোধহয় আমাকে ভালবাসতে চাইছে কেউ কি কোনদিন একা বাঁচতে পারে। সবাই সঙ্গ চায়, সঙ্গী সঙ্গীনী চায়। প্রায় লক্ষ্য করতাম, শ্যামলীর মধ্যে একটা পাপের প্রবল আকর্ষণ আছে।

মধুমতী দু-চারদিনের জন্য তার পিত্রালয়ে গেছে। আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা। একদিন রবিবার শ্যামলী আমায় সকালে চা জলখাবার নিমজ্ঞন করেছে। সকাল সকালই চলে গেছি, গিয়ে দেখি চারদিক নিষ্ঠক। কাউকে না ডেকেই ঘরে চুকে দেখলাম, শ্যামলী বড় লোভনীয় ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে আছে। বুকের ওপর থেকে শাড়ির আঁচলখানা সামান্য সরানো। পরনে লাল রঙের ব্রাউজ। শরীরটা যেন সেই ব্রাউজ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কিরকম উঠানামা করছে। কি করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমার পায়ের আওয়াজে শ্যামলী চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই আমায় জিজ্ঞেস করল, কি কতক্ষণ এসেছেন?

—এই এইমাত্র। আপনি ঘুমোছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। এই একটাই তো ছুটির দিন।

তারপর শ্যামলী এক মারাঞ্চক ভঙ্গীতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। আমি সেই সুযোগে শ্যামলীর গোপন জায়গাগুলো দেখবার অবসর পেলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে শ্যামলী কলাঘরে গেল। তারপর বেশ ফ্রেশ হয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল ‘কি, চা না কফি?’ আমি উত্তর দিলাম ‘কফি’। আমার উত্তর নিয়ে আবার জোরালো গতিতে কিছেনে চলে গেল। ইতিমধ্যে খবরের কাগজওয়ালা ছুঁড়ে কাগজখানা ঘরে দিয়ে গেল। একটু হলেই আমার নাকে এসে লাগত। ভাগ্য ভালো লাগেনি। খবরের কাগজখানা তুলে পড়তে লাগলাম। ইতিমধ্যে শ্যামলী কফি আর অন্য খাবার নিয়ে এসে হাজির।

শ্যামলী একগাল হেসে বলল, নিন, খেয়ে নিন।

আমি তো খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক। আমি ভদ্রতার খাতিরে হেসে বললাম, ‘আমার জন্য আবার কষ্ট করে এতসব করতে গেলেন কেন?’

—‘না কষ্ট কিসের, আমার আবার নিত্যনতুন খাবারদাবার তৈরী করতে খুব ভালো লাগে। তখন আমার মধুমতীর কথা মনে পড়ল। মধুমতীর কাছে সকালে সামান্য একটু চা চাই। তার বদলে পাই এক কাপ ঘৃণা।

আমার চোখ দুটো ঐ খাবারের প্লেটের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে খাবারগুলোকে আমার নরম আঙুল দুটো মুখের ভিতরে চালান করে দিতে লাগল। তারপর এল রসবড়া। আমি মুখে পূরে দিয়ে বললাম—দারুণ হয়েছে। এ

যেন ঠিক মনে হচ্ছে প্রেমের রসবড়া।

আমার কথা শুনে শ্যামলী তো হেসে কুটিপাটি।

—‘কেন ভুল কথা বললাম’।

—‘না তা কেন! আপনি বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন বটে।

তারপর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ। এবার আমি আর শ্যামলী গঞ্জের পর্বে। শ্যামলী বিছানায় আর আমি হাত কয়েক দূরে সোফাতে গাঁটাকে এলিয়ে বসেছি। গঞ্জের মাঝে মাঝে শ্যামলী বিছানায় গড়াতে গড়াতে এমন এক একটা ভঙ্গী করছে, যেটা অনেক সময় বাজারের কোন চালু বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। আর উন্ডেজনায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভরাট হয়ে উঠছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে উন্ডেজনা কাটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না।

আবার কথা। একথা থেকে সেকথা, আর সে কথা থেকে একথা। শ্যামলীর বুকের নীচে একটা নরম বালিশ। দু’ ক্ষনই বিছানার উপর গেঁথে রাখা। হাতের চেটোয় মুখখানাকে ধরে রাখা। ঘাড়ের পাশ দিয়ে কালো চুলের ঢল নেমে এসে গড়িয়ে পড়েছে বালিশের উপর। পা দুটোকে ভাঁজ করে একটু একটু করে দোলাতে শুরু করেছে শ্যামলী। শাড়িটা কুঁচিয়ে ইঁটু অবধি এগিয়ে আসায় শুভ নরম পা দুটোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ও দুটোকে জড়িয়ে ধরে খেলা করতে ইচ্ছে করছিল। অথচ নড়বার ক্ষমতা তখন হারিয়ে ফেলেছিল। বুকের ভেতরটা টেনশনে দপ্দপ। কেমন যেন একটা উন্ডেজক শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী শরীর দেখাতে জানে। অপরের শরীরে আগুন ধরাতেও জানে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। আর ঠিক সেই সময় শ্যামলী আবার অন্য পোজ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাঁকা হয়ে একপাশে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়ে দুষ্ট-মিষ্টি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছেন?’

আমি যে শ্যামলীর কাছে ধরা পড়ে গেছি তা আর বুঝতে দেরি হলো না। আমি তাই আমার... ঢাকবার জন্য আমতা আমতা করে বললাম, ‘কই কিছু না তো।’

—কিছু না তো মানে, এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলেন। আপনার না বয়স হয়েছে। আপনার ঘরে স্ত্রী আছে।

একথা শুনে না আমার মাথা দিয়ে আগুন বেরোতে শুরু করল। ঘরে স্ত্রী আছে ঠিক কথা। কিন্তু আমার বয়স তুলে কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। আমার কি এমন বয়স হয়েছে। দু’-একটা চুল পেকেছে। কিন্তু সে তো আমি কলপ করে চুল কালো করে দিয়েছি। তুমই বা কি এমন কচি খুকি? তোমার বয়সও তো পেকেছে। চামড়ার চেকনাইকে কসমেটিক্স দিয়ে বাড়াতে হয়। যেসব জায়গায় যৌবন, সে সব জায়গাগুলোও সামান্য ঝুলে পড়েছে। তুমি কি ভাব তোমার আর সে বাজার আছে যে তোমাকে দেখে দুনিয়ার মুব সমাজ হামরে পড়বে? আমার বউটা নেহাত আমায় গাল-মন্দ দেয়। একটু সোহাগ টোহাগ করে না। তার উপর অনেকদিনের পুরনো

মাল। তাই একটু নতুনের স্বাদ পাবার জন্য তোমার কাছে আসা। না হলে, তোমার কাছে আমার আসতে বয়েই গেছে।

আমার উপরিউক্ত কথাগুলো অবশ্য সবই মনে মনে। ভাষায় প্রকাশ করলেই এক্সুপি এমন এক ক্যাত করে লাথি কষাবে না। পাক খেতে খেতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে সেই নর্দমায়। তার থেকে চুপ মেরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাছাড়া মেয়েছেলের কথায় বেশী কান দিতে নেই। কান দিলেই অশান্তি।

আমি আবার খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই আমি যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। যাক, শ্যামলীর সাথে কথা না বাড়িয়ে একটু চা খাবার প্রস্তাৱ রাখলাম।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি চা তৈরী কৰতে গেল। হঠাৎ একটা উঃ উঃ করে শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি বাঁ হাত দিয়ে ডানহাত খানা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। চোখ ছলছল।

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কৰলাম, কি হয়েছে? কোথাও পুড়ে গেল নাকি?

শ্যামলী ডান হাতের মাঝখানটা দেখিয়ে বলল, ‘এই যে এইখানটা পুড়ে গেছে। জ্বালা করছে।

পুড়ে যাবার বিশেষ লক্ষণ আমার অবশ্য চোখে পড়ল না। হাতের মাঝখানে সামান্য একটু ফোসকা।

তবুও দরদী কঠে বললাম, ‘ইস, খুব জ্বালা করছে তাই না? কি করে পুড়ল?’

—এই একটু পাঁপড় ভাজতে গিয়েছিলাম, আর তেল ছিটকে এসে পড়েছে।

—কি দৰকাৰ ছিল। একটু আগেই তো এত সব খেলাম। এখন শুধু চা হলেই হতো।

—থাক, চলুন বান্দ জাতীয় মলম আছে?

—হ্যাঁ আছে, কিন্তু ও তো লাগালে খুব জ্বলবে।

—আরে, না না, আমি লাগিয়ে দিছি।

তারপৰ আমি শ্যামলীকে রান্নাঘৰ থেকে এনে ধীৱে ধীৱে নৱম বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সামনের দিকে প্ৰসাৱিত হয়ে আছে শ্যামলীৰ নগ্ন হাত। আমি বান্দলেৰ টিউব থেকে মলম নিয়ে হাতে বাৰ কয়েক ঘমতেই হাতের জ্বালাটা কমে গেল। শ্যামলী মিষ্টি হেসে বলল, আপনি বেশ যাদু জানেন দেখছি। আমার জ্বালাটা অনেকটা কমে গেছে।

—আপনাৰ জ্বালা জুড়োবাৰ জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা। যেদিন থেকে শুনেছি আপনাৰ প্ৰেমিক আপনাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে, আৰ সেই দুঃখে আপনি এখনো বিয়ে কৱেন নি, সেদিন থেকেই বুবেছি আপনাৰ কত দুঃখ, কত জ্বালা।

শ্যামলী বলল, “নিন, এবাৰ হাতটা ছাড়ুন, অনেকক্ষণ ধৰে আছেন।”

—হাতটা ছাড়তে প্ৰাণ চায় না, মনে হয় চিৱকাল ধৰে রাখি। কি সুন্দৰ আপনাৰ হাতখানা, কি নৱম। ঠিক মাখনেৰ মতো।

শ্যামলী মুচকি হেসে বলল, “তাই নাকি! আপনাৰ স্ত্ৰী-এৱে হাতও তো ঠিক

এইরকম তাই না।”

—কি যে বলেন। সে হাত তো শিলনোড়ার মতো শক্ত পাথর। আদর করে ধরলে হাতের মালিক খাঁক করে ওঠে। আমার কথা শুনে শ্যামলী বলল, আপনারও খুব দুঃখ তাইনা।

—হ্যাঁ, কে আর বুঝলো বলুন।

এদিকে শ্যামলী আমার পাশে এসে, গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে। আর তখনই আমার একমাত্র স্ত্রী মধুমতীর কথা মনে পড়ছে। গায়ে গায়ে শ্যামলী। তাকে তাকে শ্যামলী, দেহের উন্নাপ, চুলের সুগন্ধ, শরীরের পাহাড়-পর্বত উপত্যকায়।

ধ্যাত তেরিকা, মধুমতী মোটা, অস্বল, বাতের ঝঁঁগী। ধীরে ধীরে আমার একটা হাত শ্যামলীর কাঁধ আর খোপার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আঙুলগুলো ওপাশের বুকের ওপর খেলা করছে। এদিকে শাড়ির একটা দিক খুলে পড়েছে। শ্যামলীর বিশাল খোপাসহ মাথা আমার কাঁধে। উন্ডেজিত গরম নিঃশ্বাসে আমার বুক ওঠা নামা করছে। খোপা খুলে গেছে, তখন আমি ভাবছি, শ্যামলী কি সুন্দরী।

শ্যামলীর লাল টুকরুকে ঠোটের ওপর আমার ত্রুষ্ণর্ত ঠোট। আমার জিভ ক্ষুধার্তভাবে চলে এলো শ্যামলীর সুগন্ধী মুখের ভেতরে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো সুন্দর সারিবদ্ধ দাঁত, জিব, ঠোটের ভেতরের নরম জমি। এতো শুধু সুখ নয়, স্বর্গসুখ। ঘরের বউকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সাথে...বেশ ভালই লাগে।

আমি শ্যামলীর কানের কাছে মুখ রেখে বলি—শ্যামলী তুমি কি দারুণ। আমার কথা শুনে শ্যামলী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আর তখনই আমার চুলের পেছনের দিকে একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করি। ঐ টানেই আমার দেহখনি শ্যামলীর দেহ থেকে আলাদা হয়ে সোজা মাটিতে। দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। তারপর পিছনে ফিরে দেখি আমার বিয়ে করা একমাত্র স্ত্রী মধুমতী।

মধুমতী আমায় শ্যামলীর সাথে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ব্যাস! শুরু করে দিলে—

‘ও শ্যামলীর সাথে এত দূর। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি। আজই আমি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবো। তখন বুরবে ঠেলা। কত ধানে কত চাল, স্তৰী হত্যার দায়ে জেলের ঘানি টানতে হবে বারো বছর।

তা অবশ্য ঠিক কথা। স্তৰী এখন জনগণের সম্পত্তি। গায়ে একটু আঁচড় লাগলেই প্রথমে জনগণের প্যাদানি। তারপর আদালতের কাঠগড়। কিন্তু ওনারা আমার মাকে কাশীবাসী করাবেন। আমাকে সারা জীবন হামনদিস্তে ফেলে পিষবেন। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। সারাজীবন শুধু বলির পাঁঠার মতো ব্যা ব্যা করে চল।

অতঃপর কি আর করা যাবে। সুবোধ বালকের মত আমি আবার হতাশ মনে আমার স্তৰীর হাত ধরে বাড়ির মুখে চললাম।



ডেকামেরন গিলভানি বোকাসিও

“গিলভানি বোকাসিও যদি কখনো ডেকামেরন না লিখতেন তবুও ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সবার উপরে থাকতে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ‘এগিয়া ডি ম্যাগনো ফিয়াস্ট’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি প্রথম আধুনিক মনোবিদ্যাগত উপন্যাস হিসাবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। নারী পুরুষের প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় লেখার সঙ্গে কোনো মতেই আপোস করতে চাননি তিনি। বরং বলা যেতে পারে, অতি আধুনিকতার ছাপ তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন। বোকাসিওর গল্পের নায়িকারা যে রক্ত-মাংসের মানুষ। এই কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে রেখে তিনি কথায় কথায় নায়কের শ্যাপার্শে তাঁদের শুইয়েছেন, কামনায় অধীর করে তুলেছেন, নায়ক-নায়িকার দৈহিক ত্বক্ষি না মেটা পর্যস্ত বোকাসিওর কলম থামে নি। এটা তাঁর পক্ষে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিতীয় রঞ্জনীর এটি সম্মুকাহিনী। বোকাসিওর প্রতিটি গল্পই পড়তে কিংবা শুনতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের কখনোই মনে হয়নি যে, এসব গল্প কাঙ্গালিক। মনে হয় এ যেন তাদেরই জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। তাঁর গল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যেন ফুরোতে চায় না, প্রতিটি গল্পের রেশ থেকে যায় পাঠক-পাঠিকাদের মনে। ডেকামেরন গল্পগুলির স্বার্থকর্তা এখানেই। তাঁর প্রতিটি গল্প যেন নতুন ও চিরস্মৃত। এই গল্পটিও তার ব্যক্তিগত নয়!

ব্যাবিলনে সালামের মেয়ের ভাগ্য বড় নিষ্ঠুর, নির্মম। বিয়ের জন্য চার বছরে সে বিভিন্ন দেশের ন'জন লোকের সংস্পর্শে আসে, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য প্রতিবারেই ব্যর্থ মন নিয়ে তাকে তার বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। তবে তার একমাত্র সান্ত্বনা হল, এখনো সে তার সতীত্ব অঙ্কুশ রাখতে পেরেছে, আজও সে কুমারী। এবার সালাম তাকে অ্যালগারতের রাজার ঘরণী হওয়ার জন্য পাঠালেন।

এমিলিয়ার মুখ থেকে ম্যাডোনা বেরিটোলার দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে যুবতীরা তাদের চোখের জল আর সামলাতে পারেনি। তাদের বুকটা বারবার

হাহাকার করে উঠেছিল, এত দুঃখ-কষ্ট কেউ সহ্য করতে পারে? এমিলিয়া যেন দৱদ দিয়ে দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাহিনী শেষ হতেই রাণীর ইচ্ছে হল এবার প্যানকিলো তার কাহিনী বলতে শুরু করুক। রাণীর কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র বাধ্য ছেলের মতন সে তখন বলতে শুরু করল।

এখানে উপস্থিতি আমরা সবাই জানি, আমাদের কেন্টার ভালো, আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থিতা কি আমাদের প্রয়োজন, সেটা ঠিক করা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা অনেকেই মনে করে থাকি, আমরা বড় অভাবে আছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রচুর অর্থ সম্পত্তি পাইয়ে দেন আর যখন ঈশ্বর আমাদের কারোর ওপর সদয় হন, তারা যখন প্রচুর অর্থের পাহাড়ের শীর্ষে উঠে যান তখন হয়ত দেখা যাবে তাঁদের সেই সুখ-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি তৈরি হয়ে গেছে। একদিন তারা হয়ত সুখী হয়ে যায়। তখন সেই সুখের সর্বোচ্চ শিখর থেকে চরম দুঃখের অতল গভীরে তাদের তলিয়ে যেতে হয়। ধনী হওয়ার আগে তাদের এই চরম সর্বনাশের স্মপ্তি কখনো দেখেনি তারা। কোনো রাজা যেমন অপরের রাজ্য জয় করতে গিয়ে তাঁর কাছের এবং প্রিয়জনদের নির্বিচারে হত্যা করার সময় একবারও খেয়াল করেন না, যে রাজ্য জয়ের সুখের মোহে তিনি সেই কাজ করতে যাচ্ছেন, সেই সুখ কখনই তাঁর যে হাতছাড়া হতে পারে একদিন, সেই ভয়টা যে চিরদিনই থেকে যেতে পারে তাঁর জীবনে সেটা তিনি একবারও ভাববার প্রয়োজন মনে করেন না। আসলে তাদের বৌঝার ক্ষমতা থাকে না, পাওনার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের মৃত্যু এবং চরম দুর্দশার কারণ হয়ে উঠতে পারে একদিন।

‘মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধু বলব পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে জোর গলায় বলতে পারে, ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে সে কখনোই রেহাই পেতে পারে। তাই বলছি, ঈশ্বরের দান হিসাবে আমরা যেটুকু পেয়েছি তাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়কে অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারি। তবু মানুষ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চেয়ে কিংবা কামনা করে তাদের অজাতে যে পাপ করে বসে তাঁর ফল তাদের ভুগতে তো হবেই এই ধরে আমি উপস্থিতি মহিলাদের উল্লেখ করেই বলছি তোমাদের মধ্যে হয়ত এমন কেউ আছে, যে কিনা প্রকৃতির দান হিসাবে যে রূপ সৌন্দর্য পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো সুন্দরী আরো রূপসী হওয়ার চেষ্টা করবে যাতে করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু কোনো জ্ঞানী-গুণী লোক একে সমর্থন করবেন না। তার কারণ তার পরিণাম ভালো হতে পারে না। এই কাহিনীতে আমি এমন একজন পরমাসুন্দরী সিরিয় মেরে কথা শোনাবো, যে তার রূপের দেমাকে চার চারটে বছর ন'জন পুরুষের

সংস্পর্শে এলেও কারোর স্তৰী হয়ে ঘর বাঁধতে পারেনি।

অনেক, অনেক দিন আগে ব্যাবিলনে সুলতান বেকিনদারের রাজত্বকালে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু ঘটা অসম্ভব ঘ্যাপার ছিল। তাঁর অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়ে আলাটিয়েল, তখনকার সময়ে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী ছিল বললে বোধহয় এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। এক সময়ে আরবের যায়াবররা হঠাতে তাঁর রাজ্যে হানা দেয়। তখন আল্যারভের রাজা সময়মত এগিয়ে এসে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ দাঁড়ান। এবং তাঁর পুরস্কার-স্বরূপ তিনি তখন সুলতানের কাছ থেকে তাঁর সেই সুন্দরী কন্যাকে তাঁর স্তৰী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন তিনি তাঁর সুন্দরী কন্যাকে জাহাজে তুলে দিলেন মহাআনন্দে আল্যারভ-এর উদ্দেশ্যে। আলাটিয়েলের সঙ্গে দিলেন থচুর ঘোতুক এবং লোকলক্ষণ ও চাকর-চাকরানি।

বেশ কয়েকদিন পরে জাহাজটা আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছেড়ে যাওয়ার পর একদিন তারা যখন সারাদিনিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যাত্রাপথ যখন তাদের প্রায় শেষ হয়ে আসছিল হঠাতে সমুদ্রে প্রচণ্ড বাঢ় এবং তুফান উঠতে দেখা গেল। এত তীব্র এবং ভয়ঙ্কর সেই বাঢ় যে, জাহাজের নাবিকেরা এক রকম ধরেই নিল, তাদের বাঁচার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তারা গভীর সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে একদিন। তবে তাদের সাহস এবং ধৈর্য ধরার ক্ষমতা ছিল অনেক। দুদিন ধরে সমুদ্রের নিচে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে কোনোরকমে বেঁচে রইল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। যাই হোক, তৃতীয় দিন আবার সমুদ্রে প্রচণ্ড বাঢ় এবং তুফান উঠতেই তাদের জাহাজ এবার প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা হল। সেখান থেকে ম্যাজোরকা খুব দূরে না হলেও আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা থাকার দরক্ষ তারা বুঝতে পারছিল না তারা তখন ঠিক কোথায় ছিল।

সবাই তখন ডুবত্ব জাহাজ থেকে নেমে একটা বড় নৌকা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জাহাজের সব যাত্রী সেই নৌকায় জায়গা পেল না। কিছু লোক রয়ে গেল জাহাজে।

ইতিমধ্যে সমুদ্রের প্রচণ্ড বাঢ় সেই জাহাজটাকে ম্যাজোরকা দ্বিপের কাছে টেনে নিয়ে এল। জাহাজটা তখন প্রায় জলে ভর্তি হয়ে গেছে। সেই সময় জাহাজের যাত্রী বলতে সেই মহিলা এবং তাঁর পরিচারিকা। তাদের অবস্থা তখন মৃত জানোয়ারের মতন, তাদের চোখে-মুখে গভীর আভক্ষের ছাপ। প্রচণ্ড বাড়ের দাপটে জাহাজটা সমুদ্র তীরের বালিতে গেঁথে গিয়েছিল, নড়বার ক্ষমতা ছিল না তার। সারাটা রাত যাত্রীদের জাহাজেই কাটল।

পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ের দাপট কয়ে গেল। ভদ্রমহিলা প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক পরিচারিকাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। কিন্তু তখন তাদের সাড়া দেওয়ার কেউ ছিল না।

তাদের কাছ থেকে কোনো উভ্র না পেয়ে এবং ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে দারুণ ভয় পেল। কোনো অঘটন ঘটল না তো? তখন সে জাহাজের চারিদিক ঘুরে দেখতে গিয়ে দেখল, সবাই প্রায় মৃতের মত। খুব কম মানুষের দেহে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ করা গেল। ভদ্রমহিলা এবার সত্যি সত্যি দারুণ ভয় পেলেন। জাহাজের চারিদিকে জল থৈ থৈ, তিনি যে কোথায় এসে পড়েছেন, কোনো ধারণা নেই সে ব্যাপারে। যে ক'জন তখনে জীবিত ছিল তাদের তিনি জাগিয়ে তুললেন। তারাও জানে না জাহাজের মানুষগুলোর কি হাল হয়েছে, তারা কোথায় তা তারা জানে না। তিনি দিন ধরে পেটে একটুও খাবার পড়েনি। একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সন্ধাবনা অনুমান করে নিয়ে তারা সবাই তখন যেন ডয়ে চিন্কার করে উঠল।

দুপুর পর্যন্ত ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ল আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে। তারপর দুপুর প্রায় শেষ হয়ে আসছিল সেই সময় পেরিকোন দ্য ডিসালগে নামে এক ভালোমানুষ এথেস থেকে ফেরার সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে ছিল অনেক লোক লক্ষ্য। সমুদ্রতীরে সেই জাহাজটা দেখে তিনি ধরে নিলেন, কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে থাকবে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত পরিচারককে বললেন সেই জাহাজের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার জন্যে। চাকরটি তখন জাহাজে উঠে সেই যুবতী মহিলা এবং তার পরিচারিকাদের দেখতে পেয়ে অবাক হল, তারা তখনো কি করে বেঁচে আছে আশ্চর্য! কিন্তু চাকরটা ওদের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তখন তারা আকারে ইঙ্গিতে চাকরটাকে পথের দূরাবস্থার কথা বোঝাতে চাইল।

চাকর ফিরে এসে মেয়েটির সম্পর্কে খবর দিলে পেরিকোন সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই দুব্বল জাহাজ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাঁর প্রাসাদে, সেই সঙ্গে জাহাজের সমস্ত মূল্যবান সম্পদও সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। মেয়েটির সৌন্দর্য এবং মূল্যবান পোষাক দেখে পেরিকোন বুবাতে পারলেন সন্তুষ্ট বংশের মেয়ে সে। তার রূপে মুক্ষ হয়ে তিনি তখন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তাকে বিয়ে করবেন। আর বিয়ে যদি একান্তই সন্তুষ না হয়, তাহলে তিনি তাকে তাঁর মিস্ট্রেস হিসেবে রেখে দেবেন।

ইতিমধ্যে জাহাজ ভ্রমণের ক্রান্তি কাটিয়ে উঠতেই মেয়েটি আরো বেশী রূপবতী এবং সুন্দরী হয়ে উঠল। পেরিকোনও কম সুপ্রুৰ্ব নন। তিনি তখন মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মেয়েটি তার হাবভাবে বুবায়ে দিল তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে অপারাগ সে। ওদিকে পেরিকোনের কামনা ক্রমশ বেড়েই যেতে থাকল।

মেয়েটি তখনো জানে না, যে কোথায় এসে উঠেছে, কাদের সঙ্গে বসবাস করছে। তবে সে বুবাতে পারল, লোকগুলোর আচার ব্যবহার দেখে মনে হয়

তারা খ্রিস্টান। পেরিকোনের মনের ভাব তখন তার পুরোপুরি জানা হয়ে গেছে। যে রকম ব্যবহার তিনি করছেন তাতে মনে হয় সে পচন্দ করুক বা না করুক, একদিন না একদিন তাকে তাঁর ইচ্ছের শিকার হতেই হবে। তবুও, যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি এমনি ভাব দেখিয়ে অঙ্গের মত চোখ ফিরিয়ে থাকার চেষ্টা করল পেরিকোনের দিক থেকে। মেয়েটি তার তিন জীবিত পরিচারিকাকে নির্দেশ দিয়ে বলল, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে তাদের মুক্তির আশ্বাস পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যেন তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে পেরিকোনের কাছে। তাছাড়া তারা যেন সেখানকার কোনো পুরুষের প্রলোভনে নিজেদের দেহ বিকিয়ে না দেয়।

যত দিন যায় পেরিকোন যেন ততই অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটির সঙ্গ লাভের জন্যে। কিন্তু প্রতিবারেই মেয়েটি তাকে দৃঢ়ত্বার সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। ক্রমে তার কামনার আগুন বেড়েই চলে। বার বার মেয়েটি তাঁকে ফিরিয়ে দিলে পেরিকোন তখন ভাবলেন, ভালো কথায় কাজ হবে না, হয়ত এবার তাঁকে বলপ্রয়োগ করতে হবে। তবে তিনি খৌজ নিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, মেয়েটির মদে আসক্তি আছে, অথচ মদ খাওয়া মেয়েটির ধর্মবিরুদ্ধ। পেরিকোন ভাবলেন মদের লোভ দেখিয়ে হয়ত তাকে জয় করা যেতে পারে। তাই তিনি একদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন, সেই সভায় মেয়েটি উপস্থিত ছিল। পেরিকোন তাঁর চাকরকে বলে রেখেছিলেন মেয়েটিকে দামি মদ পরিবেশন করার জন্যে। চাকর তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। মদের নেশায় বিভোর হয়ে মেয়েটি অতিরিক্ত মদ গিলল। মেয়েটি তখন তার সব বিপর্যয়, সব দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে মেতে উঠল তাদের সঙ্গে। মেয়েটি দেখল, বেশ কিছু মেয়ে ম্যাজোরকার ঢঙে নাচছে, তখন সে নিজেও আলেকজান্দ্রার ফ্যাসানে নাচতে শুরু করে দিল।

সেই দৃশ্য দেখে পেরিকোনের মনে আশা জাগল, খুব শিগগীরই তাঁর ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। মেয়েটি প্লাসের পর প্লাস মদ গিলে যায়। তখন তার নিজস্ব সত্ত্বা বলতে কিছু ছিল না, তখন যেন সে একটা কলের পুতুল, দয় দিলেই চলবে। সব শেষে অতিথিরা যে ধার বাড়ি চলে গেলে পেরিকোন মেয়েটিকে যন্ত্রচালিতের মতন দুঃহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটির তখন ছাঁশ বলতে কিছু ছিল না। পেরিকোনকে সে তার ব্যক্তিগত পরিচারক ভেবে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে তার সামনেই সে তার পোষাক এক এক করে খুলে ফেলল, এবং বিছানায় শুয়ে পড়ল। পেরিকোন সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে সেও মেয়েটিকে অনুসরণ করলেন নিজেকে নির্বন্ধ করে। তার ঘরের আলো নিভিয়ে মেয়েটির নগ্ন দেহের পাশে শুয়ে পড়লেন তিনি এবং দুঃহাত দিয়ে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, মেয়েটি কোনো বাধা দিল না, কলের পুতুলের মত নিজেকে সে সঁপে দিল

পেরিকোনের হাতে। পেরিকোন তার নগ্ন দেহ যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। পুরুষ স্পর্শ যে নারীর কাছে এত প্রিয় হতে পারে আগে কোনও ধারণা ছিল না মেয়েটির। একটু একটু করে তখন তার মদের নেশটা কেটে গিয়ে হ্শ ফিরে আসছিল। পেরিকোনের হাতের মুঠোয় তখন তার স্তনযুগল, ঠোটে ঠোট। পেরিকোন তার দেহের ওপর নিজের শরীর বিছিয়ে দিতেই মেয়েটি আবেগে ঢাঁক বুজল। পেরিকোন তার ঠোটে ঘন ঘন চুমু খেতে খেতে মেয়েটির দেহে প্রবেশ করল এক সময়। পেরিকোন আচমকা তার দেহে প্রবেশ করার দরুন প্রথমে একটু ব্যথা পেলেও এক অস্তুত আনন্দানন্দৃতি তার সারা দেহে রন রন করে অনুরাগিত হয়ে উঠতে থাকল। থর থর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ। সেই রোমাঞ্চকর সুবে গা ভাসিয়ে দিতে গিয়ে মেয়েটির তখন দারুণ অনুশোচনা হল, আগে কেন সে পেরিকোনের আহানে সাড়া দেয়নি, কেন সে এই অপূর্ব সুব থেকে নিজেকে বাস্তিত করে রাখত এতদিন। মেয়েটির তৃপ্তি তখন এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, এবার সে নিজেই সেই সুবের জানান দিতে পেরিকোনের প্রেম-প্রেম খেলার সাথী হয়ে উঠল। একবার সুব পেয়ে দেহের ক্ষুধা আরো বেড়ে গেল। তারপর সে নিজের থেকেই আহান করল পেরিকোনকে। সেই রাতে দেহে ঝাঁপ্তি না আসা পর্যন্ত বার বার পেরিকোনের সঙ্গে দৈহিক মিলনে অব্যুত্ত হল বিভিন্ন কায়দায়। পেরিকোনও তাকে তৃপ্তি দিতে বিদ্যুত্ত্ব কার্য্য করলেন না।

তারপর থেকে পেরিকোনের আর কোনও ক্ষোভ রইল না। মেয়েটিকে তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে না পেলেও বুশি মত যখন যেভাবে পারছেন তিনি তার দেহ উপভোগ করতে থাকলেন স্থায়ী-স্থায়ী মতন। কিন্তু তাঁর সেই সুবের দিন বেশী সময় স্থায়ী হল না। পেরিকোনের এক পাঁচিশ বছরের যুবক ভাই ছিল, তরতরে তাজা এবং সুপুরুষ, যেন সদ্য অস্ফুটিত একটি গোলাপ—তার নাম ছিল মারাটো। মেয়েটিকে দেখা মাত্র তার যৌনচেতনা প্রচণ্ড ভাবে জেগে উঠল। মনে মনে মেয়েটিকে সে ভীষণ ভাবে কামনা করল। মেয়েটিও তাকে দেখে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল সেও তাকে কামনা করে। তখন তারা দেখল, তাদের সামনে একমাত্র বাধা পেরিকোন, যাঁর কড়া নজর পড়ে আছে তার ওপর। মারাটো বুঝতে পারল, যে ভাবেই হোক পেরিকোনের হাত থেকে মেয়েটিকে মুক্ত করতে না পারলে তারা তাদের সুবের লক্ষে পৌঁছতে পারবে না। সে তখন এক মারাঞ্চক খেলায় মেঠে উঠল।

সেই বন্দরে দুটি জোনোসী যুবক একটা জাহাজ নোঙ্গর করল। পেলেগোনিজে ব্যবসায়ীদের জন্যে মালপত্র বোরাই করে নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজটা। অনুকূল বাতাস আবার বইতে শুরু করলেই জাহাজটা সমুদ্রে ভাসবে। মারাটো সেই জাহাজের ক্যাষ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নিজের এবং মেয়েটির জন্যে দুটি আসনের

ব্যবস্থা করে রাখল। পরদিন রাত্রে তারা সেই জাহাজে উঠবে, সেখান থেকে পালাবার সব ব্যবস্থাই তো পাকা হল। কিন্তু যে মেয়েটিকে নিয়ে সে পালাতে চায় সেই মেয়েটিকে তার বড় ভাই-এর খপ্পর থেকে কি করে উদ্ধার করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে মারাটোর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ঠিক করল পেরিকোনের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে আসবে।

মারাটো তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে রাখল এ ব্যাপারে, তারা তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিল। রাত গভীর হলে পেরিকোন এবং মেয়েটি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লে তারা তাঁর ঘরে চুকে পেরিকোনকে হত্যা করে মেয়েটিকে ধিরে ফেলল। মেয়েটি ঘুম থেকে জেগে উঠে সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখে চিংকার করে উঠতেই তারা তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। মেয়েটি থাগের ভয়ে চুপ করে গেল। তখন তারা পেরিকোনের মূল্যবান সম্পদ ও নগদ অর্থ যা পারল সংগ্রহ করে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতারের দিকে রওনা হয়ে গেল। রাত তখন গভীর নিশ্চিতি, কাক পক্ষীও কেউ টের পেল না তাদের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। সমুদ্রতারে অপেক্ষা করছিল মারাটো। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে তখন সেই জাহাজে উঠে পড়ল এবং তার সঙ্গীরা যে যার পথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল সেখান থেকে।

একটু পরেই অনুকূল বাতাস বইতে দেখে জাহাজের নাবিকরা বন্দর থেকে নোঙর তুলে দিয়ে জাহাজটা জলে ভাসিয়ে দিল।

মেয়েটি দ্বিতীয়বার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নিজের অদ্দের কথা ভাবছিল তখন। তবে মারাটোর মিষ্টি মিষ্টি কথায় মেয়েটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে গেল পেরিকোনের কথা। তার মন থেকে পেরিকোনের স্মৃতি মুছে ফেলে মারাটোর কাছে নিজেকে সঁপে দিল। রাতের অন্ধকারে জাহাজ তখন ভেসে চলেছে সমুদ্রে। আর ওদিকে একটা কেবিনে মারাটো এবং মেয়েটি সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে দিল। বাকী রাতটুকু তারা প্রেম প্রেম খেলল, কম করেও তিনবার তারা চরম সুখের স্বাদ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করল, তাদের জীবন সার্থক বলে ধরে নিল। কিন্তু এবারেও বৌধায় ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মারাটোর সঙ্গে তার একটা নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই এক বিপর্যয়ের মহড়া দিছিল জাহাজের যুবক মালিক দু'জন। মেয়েটিকে রাতের অন্ধকারে দেখা মাত্র তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। মনে মনে তারা ঠিক করে ফেলেছিল যে ভাবেই হোক মেয়েটিকে তাদের শয্যা সঙ্গনী করতে হবে।

“বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করে বলতে চাই,” প্যানফিলো এখানে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, ‘আমরা জেনেছি মেয়েটির সারা অঙ্গে রূপ আর যৌবন যেন উপচে পড়ছিল। তাকে স্বর্গের অঙ্গরা বললে এতটুকু

বুঝি বাড়িয়ে বলা হয় না। তার সেই চোখ ধীধানো রূপ দেখে যুবক দুটি প্রচণ্ড উত্তেজনায় তখন ভাবছিল কি করে মেয়েটির মন জয় করা যায়, তাকে তাদের কাম-লালসার চরিতার্থ করাতে রাজি করানো যায়। সেই সঙ্গে তারা এও ঠিক করল, তাদের মনের কথা মারাটোকে জানতে দেবে না।

যুবক দুটি পরম্পরের মনের কথা জানতে পেরে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ রফা করে নিল আগে ভাগে। প্রথমে মেয়েটিকে জয় করতে হবে, তারপর ঠিক করা হবে কে প্রথম তাকে উপভোগ করবে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা করতে হল। কারণ মারাটো তখন মেয়েটির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। কিন্তু একদিন তাদের সামনে সেই সুবর্ণ সুযোগটা এসে গেল। মারাটো দাঁড়িয়েছিল ডেকের ওপর, সামনেই রেলিং। তারা তখন নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, তাদের উদ্দেশ্যের কথা সে জানতেও পারল না। তারপর অতর্কিতে পিছন থেকে তারা তাকে সজোরে ধাক্কা দিতেই মারাটোর ভারী দেহটা জলের ওপর আছড়ে পড়ল এবং গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দেখা গেল তার দেহটা। দুর্ঘটনাহল থেকে এক মাইল পাড়ি দেওয়ার পর মেয়েটি জানতে পারল মারাটো আর বেঁচে নেই। জাহাজের দু'জন মালিকের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় সে আর দেখতে পেল না।

জাহাজের মালিক দুই ভাই তখন মেয়েটির দূরাবস্থা দেখে তাকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। তাঁর সঙ্গে ভালো ভালো কথা বলে তার মন গলানোর চেষ্টা করল। মেয়েটি তখন মারাটোকে হারিয়ে যত না দুঃখ পেয়েছিল তার বেশী দুঃখ পেল দুই ভাইকে একই সঙ্গে তার দেহের ওপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে দেখে। একটি নারী, দুটি পুরুষ, একটা অশুভ চিঞ্চা তখন তাকে গ্রাস করছিল। সেই আশঙ্কা যে মিথ্যে নয় একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দুই ভাই তখন আলোচনায় বসল, কে প্রথম মেয়েটিকে তার শ্যাসঙ্গিনী করবে। প্রথমে ভালো কথায় তারা এ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ যখন কারোর কথায় রাজি হতে পারল না, তখন তারা উত্তেজিত হয়ে এ ওকে গালিগালাজ করতে করতে শেষে ছুরি হাতে দ্বন্দ্যকে নেমে পড়ল। ছুরির আঘাতে দু'জনের দেহই তখন দারণ ক্ষত-বিক্ষত। একজনের আঘাত এতই গুরুতর ছিল যে, ঘটনাহলেই সে মারা গেল। অন্য ভাইটা মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকের উপর।

মেয়েটি তখন অত্যন্ত বিপন্না। জাহাজে তখন এমন কোনও ভালো লোক তার চোখে পড়ল না যে কিনা তার বিপদে তাকে সাহায্য করতে পারে। তার আরো আশঙ্কা, এবার বুঝি জাহাজের অন্য লোকগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার রূপসী দেহটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কারণ, দুই ভাই যখন কে আগে তাকে দেহ উপভোগ করবে, সামান্য এই সমস্যাটার কোনো সমাধান

করার আগেই একজনকে খুন হতে হল, আর একজন মারাঞ্চকভাবে আহত হল, তখন অতঙ্গলো লোক কি সমরোতায় যে আসতে পারে, সেটা এখন আর তার অজানা থাকার কথা নয়! আর সেই ভয়েই মেয়েটি তখন আরো বেশী কুকড়ে গেল। যাইহোক আহত যুবকটির প্রতি তার কেমন যেন মায়া হল এবং ওদিকে ক্লারেঞ্জ নোঙর করাতে তখনকার মত তার বিপদ বুঝি কেটে গেল। তখন সে আহত যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। পরে সেই হোটেল থেকেই মেয়েটির দেহ-সৌন্দর্যের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। সেই সময়ে ক্লারেঞ্জ মোরিয়ার রাজকুমার উপস্থিত ছিল। তার কানেও খবরটা পৌঁছতে সে তখন মেয়েটির ভুবন ভোলানো রূপ দেখা মাত্র সে তার প্রেমে পড়ে গেল, তার মনে হল ওর মত সুন্দরী মেয়ে সে বুঝি-এর আগে কখনো দেখেনি। মেয়েদের রূপ না তো অভিশাপ!

মেয়েটার পূর্ব পরিচয় পেয়ে রাজকুমারের মনে হল, কেনই বা সে তাকে পাবে না। রাপে-গুণে অর্থ-যশে সেই বা কি এমন ক্ষমতি আছে? আহত যুবকের আঘায় বস্তুরাও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কসুর করল না। রাজকুমারের মনের কথা বুঝতে পেরে তারা তখন মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারের হাতে তুলে দিল। মেয়েটিকে পেয়ে রাজকুমার উৎফুল্ল, এবং মেয়েটিও কম খুশি হল না। তার নতুন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে। মেয়েটি তখন ভাবল, এবার বোধহয় তার বিপদ কাটল। ওদিকে রাজকুমার তার রাপে মুঝ হয়ে ভাবল, মেয়েটির চালচলন দেখে মনে হয় সম্ভাস্ত পরিবারের মেয়ে সে। তখন মেয়েটির প্রতি তার ভালোবাসা দিশুণ বেড়ে গেল। রক্ষিতা হিসাবে নয়, তাকে সে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কসুর করল না।

মেয়েটি তার বর্তমান রূপ এবং ঐশ্বর্যের বহর দেখে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবত্তী বলে মনে করল। আগের জীবনে সে যে দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছিল সে সবের তুলনায় রাজকুমারের জীবনে এসে সে অনেক বেশী সুখী, নিজেকে অনেক নিরাপদে বলে মনে করল। একটা সুখের মুখ দেখতে পেয়ে তারপর থেকে তার রূপ যেন আরো বেশী খুলে গেল। তার সেই নতুন রাপের কথা সারা আচ্য সাম্রাজ্যে আগন্তের দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। সবার মুখেই সেই একই কথা ; আহা কি রূপ মেয়েটির। এথেন্স-এর ডিউক ছিল রাজকুমারের আঘায় এবং বস্তু। তার একদিন ইচ্ছে হল মেয়েটিকে নিজের চোখে একবার দেখে। ডিউকও ছিল দেখতে-শুনতে সুপ্রকৃষ্য, বয়স অল্প। বলিষ্ঠ যুবক রাজকুমারের সঙ্গে প্রথামত দেখা করার অঙ্গিলা করে একদিন সে ক্লারেঞ্জ এল।

কথায় কথায় ডিউক জিজ্ঞেস করল, রাজকুমার শুনেছি তোমার প্রাসাদের নতুন অতিথিটি নাকি খুব সুন্দরী।

‘সুন্দরী কি বলছ হে? পরমাসুন্দরী সে। অতুলনীয়া।’ রাজকুমার মেয়েটির

ରାପେର ପ୍ରଶଂସାୟ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହୟେ ଉଠେ ବଲଲ, ‘ବିଶ୍ୱାସ ନା ହୟ, ନିଜେର ଚୋଥେଇ ପରଥ କରେ ଦେଖତେ ପାରୋ।’

ଏରପର ରାଜକୁମାର ତାକେ ମେଯୋଟିର ଘରେ ନିଯେ ଗେଲ । ମେଯୋଟି ତାଦେର ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରେ ତାର ଶୟନକଙ୍କେ ବସାଲ । ମେଯୋଟି ବସେଛିଲ ଦୁଇ ବଞ୍ଚୁର ଠିକ ମାଝାଥାନେ । ତବେ ତାଦେର ଭାଷା ଠିକ ମତ ବୁଝାତେ ନା ପାରାଯ ତାଦେର ଆଲୋଚନାୟ ରସ ସେ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରାଛିଲ ନା । ଡିଉକ ଘନ ଘନ ମେଯୋଟିର ଦିକେ ତାକାଛିଲ । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରଛିଲ ନା, ମେଯୋଟି ଏହି ପୃଥିବୀର ମାନବୀ ନା କି ସ୍ଵର୍ଗେର କୋନୋ ଦେବୀ । ଏକଇ ଅଙ୍ଗେ ଏତ ରାପ ? ନିଜେର ଚୋଥେ ନା ଦେଖିଲେ ବୋଧହୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରତ ନା । ତାର ରାପେ ଆଶ୍ରମରେ ବଲକ ଛିଲ, ଏତ ତୀର ସେଇ ବଲକ ଯେ, କୋନୋ ପୁରୁଷ ସେଇ ଆଶ୍ରମେ ଜୁଲେ ପୁଡ଼େ ମରତେ ପାରେ । ତବୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ପର୍ଶ ପେତେ ଚାଯ ପୁରୁଷ । ବିଚିତ୍ର ନାରୀ, ତାର ଚେଯେଓ ବିଚିତ୍ର ବୋଧହୟ ତାଦେର ରାପ ଆର ଯୌବନ । ମେଯୋଟିର ପ୍ରତି ଏକଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରଲ ଡିଉକ । ତାର ମନେ ହଲ, ପୃଥିବୀତେ ରାଜକୁମାରେର ମତ ଖୁଣ୍ଣି ବୋଧହୟ ଆର କେଉ ନେଇ ଏମନ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଯେ ଯାର ଶୟା ସଙ୍ଗିନୀ, ତାର ଥେକେ ବେଶୀ ସୁଖୀ ଆର କେଇ ବା ହତେ ପାରେ ? ଡିଉକରେ ମଧ୍ୟେ ତଥନ ଅନେକ ଚିନ୍ତା । କି କରେ ରାଜକୁମାରେର ସେଇ ସୁଖେର ସାନ୍ତ୍ଵାଜ୍ୟ ହାନା ଦେଓଯା ଯାଯ, କି କରେ ମେଯୋଟିକେ ତାର କାହ ଥେକେ ଛିନିଯେ ନେଓଯା ଯାଯ । ତବେ ସେ ଏ କଥାଓ ଭାବଲ, ଯେ କୋନୋ ମୂଲ୍ୟ ମେଯୋଟିକେ ପେତେଇ ହବେ, ତାର ପରିଣାମ ଯତ ଡାରାବହି ହୋକ ନା କେନ ।

ଅତଃପର ଡିଉକ ଏକଦିନ ତାର ବଦ ମତଲବେର ଏକଟା ବାସ୍ତବ ରାପ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟେ ରାଜକୁମାରେର ବିଶ୍ଵାସ ଚାକରକେ ଟାକା ଦିଯେ ହାତ କରଲ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଚୁକ୍ତି ହଲ, ଗଭୀର ରାତେ ରାଜକୁମାରେର ପ୍ରାସାଦେ ଦରଜା ଖୁଲେ ଦେବେ । ତଥନ ଡିଉକ ଏବଂ ତାର ଏକ ସଙ୍ଗୀକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ରାଜକୁମାରେର ଶୟନ କଙ୍କେ ଥ୍ରେଶ କରେ ମେଯୋଟିକେ ଅପହରଣ କରେ ନିଯେ ଯାବେ ।

ସେଦିନ ରାତେ ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢେ ଡିଉକ ତାର ସଙ୍ଗୀକେ ନିଯେ ରାଜକୁମାରେର ପ୍ରାସାଦେର ସାମନେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ତାରା ଦୁଇଜନେଇ ଅନ୍ତେ ସୁମର୍ଜିତ । ଯଥାରୀତି ଚାକର ସିଉରିଯାସି ତାଦେର ପଥ ଦେଖିଯେ ନିଃଶବ୍ଦେ ରାଜକୁମାରେର ଶୟନକଙ୍କେ ନିଯେ ଏଲ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ସେଦିନ । ଚାରିଦିକେ ଅନ୍ଧକାର ଥିକ୍ଥିକ କରାଛିଲ । ମାଝେ ମାଝେ ସମୁଦ୍ରେ ଗର୍ଜନ ଭେଦେ ଆସାଇଲ । ମେଯୋଟି ତଥନ ବିଛାନାୟ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାୟ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଧନଞ୍ଚ ଅବଶ୍ୟ ସୁମୋହିଲ । ଏବଂ ରାଜକୁମାର ସମୁଦ୍ର ହାଓଯା ଖାଓଯାର ଜନ୍ୟେ ଜାନାଲାର ସାମନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଞ୍ଚ ଅବଶ୍ୟ ଦାଢ଼ିଯେଛିଲ । ଦେଖେ ମନେ ହୟ ଖାନିକ ଆଗେ ମେଯୋଟିର ସଙ୍ଗେ ଯୌନ ଖେଲାୟ ମେତେ ଉଠେ ଥାକବେ ସେ । ଡିଉକ ତାର ସଙ୍ଗୀକେ ଇଶାରାୟ ଇଞ୍ଜିନ କରଲ, ଆଗେଇ ସେ ବଲେ ରେଖେଛିଲ କି ତାକେ କରତେ ହବେ । ରାଜକୁମାର ତାଦେର ଉପହିତି ଏକେବାରେଇ ଟେର ପାଯନି । ସେଇ ସୁଯୋଗେ ଡିଉକରେ ଅନୁଚର ପା ଟିପେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ପିଛନ ଥେକେ ରାଜକୁମାରେର ପିଠେର ଓପର ତାର ହାତେର ଧାରାଲୋ ତଲୋଯାରଟା ଆମ୍ବୁଲ ବିଧିଯେ ଦିଲ ।

মাত্র একবারই অস্ফুটে চিন্কার করে উঠেছিল রাজকুমার, পরক্ষণেই তার রক্তাক্ত
শরীরটা মেঝের ওপর পড়ে যেতেই ডিউক তার মৃতদেহটা দুঃহাত দিয়ে তুলে
নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দা সংলগ্ন রাজকুমারের প্রাসাদের প্রাচীর।
ডিউক তার দেহটা প্রাচীর টপকে বাইরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল। কেউ
জানতেও পারল না।

ওদিকে ডিউকের শেখানো মত তার সঙ্গী তখন রাজকুমারের ভূত্য সিউরিসির
গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে শ্বাসকুন্দ করে খুন করে ফেলেছিল। তার মৃতদেহটাও
প্রাসাদের বাইরে ফেলে এল তারা। তারপর ডিউক তার সঙ্গীকে বাইরে অপেক্ষা
করতে বলে রাজকুমারের শয়নকক্ষে চুকল তার শেষ কাজটা সারার জন্যে।
মেয়েটি তখন অঝোরে সুমোচিল। পোষাকে ঢাকা যে মেয়ের এত সৌন্দর্য না
জানি নিরাবরণ দেহে তাকে আরো কত না সুন্দরী দেখাতে পারে। সেটা দেখার
জন্যে ডিউক নিঃশব্দে বিছানায় তার পাশে বসে এক এক করে তার দেহ থেকে
সমস্ত পোষাক খুলে ফেলল। তার চোখের সামনে মেয়েটির নগ দেহ ভেসে
উঠল। ফোটা পদ্মের মতো স্তনযুগল। সূর্ত স্তন জোড়ার মাঝে মসৃণ উপত্যকা
অনেক নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে, নাভি পোরিয়ে সেই তল গিয়ে মিশেছে দুটি
উরুর সঞ্চিকণে যেখানে মেয়েটির দেহের সমস্ত উভাপে ঘনীভূত। সেই উভাপের
স্পর্শ পাওয়ার জন্যে ডিউক দারুণ উন্নেজিত হয়ে উঠল। প্রথমে মেয়েটির ঠোটে
চুমু খেল। তার ঠোট জোড়া মেয়েটির বুক হয়ে পরিহ্রমা শেষ করল নাভির
নিচে। তার ভেতরের পশ্চিম তখন গর্জে উঠেছিল পোষাকের আড়াল থেকে।
তাকে শাস্ত করতে ডিউক তখন পোষাক মুক্ত হয়ে নিজের দেহটা আলতো করে
বিছিয়ে দিল মেয়েটির নগ দেহের ওপর। মেয়েটি তখন আধা ঘূম চোখে একবার
তাকিয়েই আবার চোখ বুঁজল। ঘরের আলোগুলো ডিউক আগেই নিভিয়ে
দিয়েছিল। মেয়েটির ঠোটে কামনার হাসি ফুটে উঠল। সে তখন ডিউককে তার
মনের মানুষ রাজকুমার ভেবে তার দৃঢ় আলিঙ্গনে সাড়া দিতে বিদ্যুত্ত্ব আপন্তি
করল না। আর ডিউক সেই সুযোগে মনের আনন্দে মেয়েটির দেহ উপভোগ
করে চলল। এক সময় তাদের দুঁজনের দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক
সেই মৃহূর্তে দুঁজনের দেহে একটা অচল বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মেয়েটি দুঃহাত
দিয়ে ডিউকের মাথা নামিয়ে নিজের সিঙ্গ ঠোটের ওপর তার ঠোট জোড়া চেপে
ধরল। ডিউক তার মুখের ভেতরে জিভটা চুষতে শুরু করে দিল। এক সময়
চুম্বন বিশ্বাদ ঠেকতেই তারা এ ওর কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ল। ডিউক
উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালাতেই মেয়েটি রাজকুমারের বদলে ডিউককে দেখেই
চমকে উঠল। ‘তুমি? তুমিই তাহলে এতক্ষণ আমার সঙ্গে—’, কথাটা অসমাপ্ত
রেখে ডিউকের দিকে তাকাল মেয়েটি। কোনো রাগ নয়, বিদ্রে নয়, বরং মনে
মনে মেয়েটি তার অশংসাই করল, কারণ রাজকুমারের থেকেও আজ বেশী সুখ

পেয়েছে সে ডিউকের কাছ থেকে। ডিউক তার দেহ মন দুই ভরিয়ে দিয়েছিল কানায় কানায়। রাজকুমারের মৃত্যুর খবর না জানলেও এখন তাকে ছেড়ে দিয়ে ডিউকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে তার মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ করল না। মেয়েদের স্বভাব জাত ধর্ম বুক ফাটল তবু তার মুখ ফুটল না। ডিউক ভাবল মেয়েটি বোধহয় নারাজ তার সঙ্গে যেতে। তাই সে তাকে ভয় দেখাল হত্যা করার হমকি দিয়ে। তার নির্দেশে তার সঙ্গী তখন মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে রাজকুমারের প্রাসাদের বাইরে চলে এল। ডিউক তার নিজের ঘোড়ায় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এবার ছুটে চলল। তাকে অনুসরণ করল তার সঙ্গী আর একটা ঘোড়ায় চড়ে। অদূরে ডিউকের অনুচররা অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। ডিউকের নির্দেশে তখন তারা এসেসের দিকে রওনা হল। ডিউক ছিল বিবাহিত তবে তাই বলে বেচারী এই মেয়েটিকে সে অবহেলা করবে তা নয়। শহরের এক প্রাণ্তে এক নির্জন জায়গায় তার বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল সে মেয়েটিকে। সেখানে সে মেয়েটিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম ব্যবস্থা করে দিতে একটুও কার্পণ্য করল না।

পরদিন সকালে রাজকুমারের ঘুম ভাঙতে না দেখে তার অনুচররা ভাবল, মেয়েটির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকার দরুণ তার ঘুম ভাঙতে দেরী হচ্ছে হয়ত। কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত যখন তার ঘুম ভাঙল না তখন তারা তাঁর শয়ন কক্ষের সামনে গিয়ে হাজির হল। ঘরের দরজা খোলা ছিল। সেই খোলা দরজা পথ দিয়ে তারা দেখল ঘর ফাঁকা। তখন তারা ভাবল, রাজকুমার হয়ত মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেছে। তখন তারা রাজকুমারের খোঁজে সমুদ্রতীরের দিকে যেতে গিয়ে এক এক করে তারা রাজকুমার এবং তার ভৃত্য সিউরিয়াসির মৃতদেহ আবিষ্কার করল। একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এল রাজপ্রাসাদে।

কে, কে হত্যাকারী হতে পারে? রাজকুমার সমাধিষ্ঠ দেওয়ার পর চলল অব্বেষণ। দেখা গেল এখেসের ডিউক নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। তখন তাদের সব সদেহ গিয়ে পড়ল তার ওপর। এখেসে লোক পাঠিয়ে তারা খোঁজ পেল হ্যাঁ, ডিউক সেই মেয়েটিকে তার রাজ্যে নিয়ে গেছে। তারা তখন রাজকুমারের ছোট ভাইকে রাজকুমারের আসনে বসিয়ে তাকে অনুরোধ করল, ভাত্তহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। নবাগত রাজকুমার তখন তার প্রতিবেশী রাজ্যের মিত্র এবং আঞ্চলিক বস্তুদের কাছে খবর পাঠাল, কে কি ভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে জানানোর জন্যে। তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে রাজকুমার তখন এখেসের ডিউকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ওদিকে ডিউক যুদ্ধের খবর পেয়ে সেও তখন নবাগতা রাজকুমারের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হতে থাকল। বহু প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের শক্তিশালী

সন্তাট এবং রাজারা তাদের সৈন্যসামগ্র সঙ্গে নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে কনস্ট্যান্টিনেপলের সন্তাটের ছেলে কনস্ট্যান্ট এবং ভাই ম্যানুয়েলও এলো তাদের বিরাট এক সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে। কনস্ট্যান্ট এবং ম্যানুয়েলকে দারুণ খাতির যত্ন করল। তাদের সব থেকে বেশী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ডিউক পঞ্জি ড্যাচিস, কারণ কনস্ট্যান্টির বোন ছিল সে।

যুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসছিল, ড্যাচিস একদিন তার ভাই কনস্ট্যান্ট এবং ম্যানুয়েলকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। সবাই জানাল, সেটা ভাইবোনের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। কিন্তু ড্যাচিসের আসল উদ্দেশ্য তায়েদের কাছে তার দৃঢ়থের গোপন, কাহিনী খুলে বলা। কানায় ভেঙে পড়ে সে তখন তাদের বলল, এই যুদ্ধের মূলে একজন সুন্দরী মহিলা যাকে ডিউক চুরি করে এনেছে। এই মহিলা শুধু এথেন্স-এর অশাস্ত্রির কারণ নয় ড্যাচিসের জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তার জন্যেই ডিউক আজকাল তাকে অবহেলা করতে শুরু করেছে। তার প্রতি আগের মতন তেমন নজর আর দেয় না সে। সারাক্ষণ সে সেই মেয়েটির কাছে পড়ে থাকে। ড্যাচিস তার দৃঢ়থের কাহিনী বলে ভায়েদের অনুরোধ করল তাদের জীবন থেকে এই মেয়েটিকে অপসরণ করার জন্যে।

দুই ভাই তখন তাদের বোনকে আশ্বাস দিয়ে বলল, তারা তাদের সাধ্যমত ব্যবস্থা করবে। বোনের কাছ থেকে তারা জেনে নিয়েছিল সেই সুন্দরী রমণী কোথায় থাকে। তারপর একদিন তারা কথায় কথায় ডিউকের কাছে সেই মেয়েটির প্রসঙ্গ তুলে অনুরোধ করল তার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিতে দেওয়ার জন্যে। ডিউক তাদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

ড্যাচিসের দুই ভাই-এর সামনে ডিউক একদিন এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করল বাগান বাড়িতে। সেখানে সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কনস্ট্যান্টের আলাপ হল। প্রথম দর্শনেই প্রেম এতই তীব্র মনে হল তার কাছে যে সেই মুহূর্তে সে তার মন থেকে আসন্ন যুদ্ধের কথা মুছে ফেলে মনে মনে ডিউকের বিরক্তে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলল। যে ভাবেই হোক ডিউকের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে। তার সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে, বোনের স্বার্থ নয় তার নিজের স্বার্থে নিজের দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্যে। অবশ্য মেয়েটির প্রতি তার সেই তীব্র আকর্ষণ বোধের কথা সে কারোর কাছেই প্রকাশ করল না।

কনস্ট্যান্টের সারা দেহ মন তখন আচ্ছম মেয়েটির কামনায়। এই সময় রাজকুমার এথেন্সের সীমান্তে থায় পৌঁছে গিয়েছিল তার সৈন্য-সামগ্রদের সঙ্গে নিয়ে। খবর পেয়ে ডিউক তার সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে গেল। যুদ্ধে তার মন কিছুতেই বসতে চাইছিল না। কয়েকদিন পরেই অসুখের ভান করে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল এথেন্স শহরে। ডিউক তখন অনুপস্থিত সেখানে। এই সুযোগ! মেয়েটিকে ইলোপ করার সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চাইল না। ম্যানুয়েলকে

তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসে সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আসার আগে।

এথেন্স-এ ফিরে সে প্রথমে তার বোন ড্যাচিসের সঙ্গে দেখা করল। তাকে সে বোঝাল, তার ভালোর জন্যেই সে তার স্বামী ডিউকের প্রেমিকাকে ইলোপ করে নিয়ে যেতে চায় সেখান থেকে। বোনের কাছে সে তার মনের গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করল না। ড্যাচিস তখন তাকে বলল ‘তোমার সব কাজেই আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে দেখ, ডিউক যেন ঘৃণাক্ষরেও জানতে না পাবে, এ ব্যাপারে আমার মত আছে।’

‘তুমি নিশ্চিতে থাকতে পারো বোন কাক পক্ষীও জানতে পারবে না।’ এই বলে তারপর সে প্রথমেই একটা দ্রুতগামী স্পীড বোটের ব্যবস্থা করল অত্যন্ত গোপনে। ডিউকের বাগানবাড়িটা ছিল সমৃদ্ধের ধারেই। কনস্ট্যান্ট তার কিছু অনুচরদের স্পীড বোটটা পাহারা দিতে বলে বাকী লোকদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে গেল। ডিউকের সম্মত্বী বলে খাতির করলেও অনুচররা তার ওপর নজর রাখতে ভুললো না। মেয়েটির এক পরিচারিকা মারফৎ সে খবর পাঠাল ডিউকের কাছ থেকে একটা গোপন বার্তা সে বহন করে নিয়ে এসেছে। স্বাভাবিক কৌতৃহলবশত মেয়েটি কাছে আসতেই তার অনুচররা মেয়েটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। কনস্ট্যান্ট তাদের দিকে তলোয়ার উচিয়ে হমকি দেয় ; মৃত্যু যদি না চাও তো এক পাও আর নড়বে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। যতক্ষণ না আমার স্পীড বোটটা তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে না যায়। ডিউকের রক্ষিতাকে হরণ করার উদ্দেশ্যে আমার নয় তবে সে আমার বোনের যে ক্ষতি করেছে সেটা প্রৱণ করার জন্যেই আমি একে নিয়ে যাচ্ছি বুবালে?

কিছু দূরে গিয়ে তারা অগেক্ষা করে, স্পীড বোটে উঠে যাত্রা শুরু করল। কয়েকদিন পরে তারা চিরসে গিয়ে পৌছাল। জ্যায়গাটা নিরাপদ মনে করে কনস্ট্যান্ট সেখানে থেকে গেল কিছুদিন। মেয়েটিকে চুরি করে আনার খবরটা সেখান থেকে বাবার কানে গিয়ে পৌছবে না অঙ্গত, ভাবল সে। কয়েকদিন ধরে মেয়েটি তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেঙে কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন সে কনস্ট্যান্টের আহানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারল না। আগের মত সে তার ভাগ্যকে মেনে নেয় নতুন ভাবে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে আনিদে মেতে উঠল। ডিউকের কথা ভুলেই গেল সে একদিন। কিন্তু মেয়েটির নতুন জীবন, ঘর সংসার বেশীদিন স্থায়ী হল না আগের মতন। ভাগ্যদেবী আবার তার ওপর অপ্রসন্ন হলেন।

আবার সে হাত বদল হল, অন্য এক পুরুষের উপভোগের সামগ্ৰী হল সে। তারপর একে একে আরো অনেক পুরুষের হাত বদল হতে হল তাকে। তার দেহ নিয়ে অনেক পুরুষই ছিনিমিনি খেলল তারপর। সুন্দরী হওয়ার অভিশাপ যে কি, মেয়েটি বাস্তবে সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল।

বারবার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করে মেয়েটির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের

একেবারে শেষ অধ্যায়ে আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে প্যানফিলো আবার বলতে শুরু করল।

সাইপ্রাসের সতদানার প্রথমে তাকে বোনের মতো গ্রহণ করল তার দৃঢ়ের কাহিনী শুনে। কিন্তু জাহাজে পাড়ি দিতে গিয়ে তার কেবিনে মেয়েটিকে একদিন নিভৃতে পেয়ে তার রূপ আর ঘোবন দেখে ভাইবোনের সম্পর্ক আর টেনে নিয়ে যেতে পারল না। তার সব ধৈর্য ভেঙে রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়ল। আর মেয়েটিও বহুদিন পুরুষ সঙ্গ না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিল। বলতে গেলে একরকম ষেচ্ছায় সে তার কাছে ধরা দিয়ে ফেলল। তারপর একদিন সাইপ্রাসের বন্দর প্যাফোসে নামল শ্বাসী-শ্বাসী হিসেবে।

একদিন প্যাফোসে অ্যান্টিগোনা নামে এক বয়স্ক লোক এল। মেয়েটির বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে একদিন। তখন সাইপ্রাসের সেই সতদানার বাড়িতে ছিল না। ব্যবসার কাজে আরমিনিয়ায় গিয়েছিল সে তখন। মেয়েটিকে জানালার সামনে দেখতে পেয়ে অ্যান্টিগোনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, কোথায় যেন সে দেখেছে মেয়েটিকে। ঠিক ওর মতন সুন্দরী মেয়ে, তার মুখটা মনে আছে, কিন্তু পরিচয়টা ঠিক খেয়াল করতে পারছিল না সে। মেয়েটিও তাকে দেখে ভাবছিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় লোকটাকে দেখে থাকবে সে, বাবার কাছে লোকটা এসেছিল কোনো একটা কাজে। লোকটাকে দেখে কেন জানি তার মনে হল সে বোধহয় তার বাড়ি ফেরার পরামর্শ দিতে পারে; লোকটার সাহায্যে তার দৃঢ়ের অবসান হতে পারে। মেয়েটি তার একজন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে পাঠাল, লোকটি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ‘আপনাকে ফেমান্ট্টার অ্যান্টিগোনা বলে মনে করলে আমি কি ভুল করব?’

‘না’, অ্যান্টিগোনা চটজলদি উত্তর দিল, ‘বিন্দুমাত্র নয়। আমিও ভাবছিলাম, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু এখন তোমার নামটা খেয়াল করতে পারছি না। কি তোমার পরিচয় বল তো?’ মেয়েটি এবার নিশ্চিত হল, এই মানুষটিকেই সে খুঁজছিল। তার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু বাদল নামল। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি এবার ভুকরে কেঁদে উঠল। অ্যান্টিগোনোর বুক থেকে অশ্রুসিঙ্গ মুখ তুলে এক সময় মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি আমাকে কখনো আলোকজান্দ্রিয়ায় দেখেন নি।?’

অ্যান্টিগোনা এবার তাকে চিনতে পারল—সুলতানের মেয়ে আলটিয়েল সে। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার সবাই জানে সুলতানের সুন্দরী কল্যা সমুদ্রে জাহাজভুবি হয়ে মারা গেছে। অ্যান্টিগোনা তাকে খবর দিল, ‘মিশরের সমস্ত লোক জানে, তুমি সমুদ্রে ডুবে মারা গেছ। বহু বছর তোমার কোনো খবর না পেয়ে তাদের সেই ধারণটা আরো বদ্ধমূল হয়ে গেছে।’

‘তাদের ধারণা ঠিকই। কিন্তু তারা তো জানে না, কি ভয়স্ক দুর্বিষহ জীবন

আমাকে কাটাতে হয়েছে।'

'তুমি যদি কিছু মনে না কর, এই দীর্ঘ কয়েক বছর তুমি কিভাবে কাটালে বলবে?' অ্যান্টিগোনা জিজ্ঞেস করল।

'অ্যান্টিগোনা', আলটিয়েল উভয়ে বলল, 'আপনাকে দেখেই কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন আমার নিজের বাবাকে দেখছি। অনেকদিন থেকে আমি আমার প্রিয়জনকে খুঁজছিলাম, যাকে আমার জীবনের দৃংশ্যের কাহিনী বলা যেতে পারে, যা আমি এর আগে কাউকে বলিনি, মানে বলতে পারি নি। হ্যাঁ, আপনাকেই সে সব কথা বলা যায়। সব শোনার পর যদি মনে করেন, আমি আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারব। আর যদি মনে করেন, তা সম্ভব নয়, তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি, কাউকে বলবেন না, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, আমার সম্পর্কে কোন কথা আপনি শুনেছেন।'

মেয়েটি তার দৃংশ্যের কাহিনী এক এক করে সব বলে গেল, কোনো কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু অ্যান্টিগোনা ভাবল, এ কাহিনী শুনলে, সুলতান কিংবা আলগারভ-এর রাজা তাকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই অ্যান্টিগোনা তখন মেয়েটিকে পরামর্শ দিল, সে যেন তার জীবনের তিক্ষ্ণ ঘটনার কথা গোপন রেখে সৎ জীবনযাপনের গল্প ফেঁদে বসে। এরপর অ্যান্টিগোনা আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মেয়ের বেঁচে থাকার খবর দিতেই তিনি আনন্দে উৎফুল্প হয়ে তখনুনি লোক লক্ষ্যের পাঠালেন মেয়েকে দেশে ফিরিয়ে আনার। আলাটিয়েলের দৃংশ্যের জীবন তখন শেষ হয়ে এসেছিল। সুলতান তখন আলগারভ-এর রাজার কাছে চিঠি লিখে তাঁর মেয়ের সাময়িক বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তখনো তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি আছেন? আলগারভ-এর রাজা খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোক লক্ষ্যের পাঠিয়ে আলটিয়েলকে তাঁর দেশে আনতে পাঠালেন। মেয়েটি অতঃপর আটজন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার পর কুমারী মেয়ে হিসেবেই তার সত্যিকারের স্বামীর ঘর করতে আলগারভ-এ চলল। বহু বছর ধরে মেয়েটি সুখে দিন কাটাল আলগারভ-এর রাজার রানি হয়ে। এর থেকেই বোৰা যায়, চাঁদের কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাই বলে চাঁদ তো তার সৌন্দর্য হারায়নি?"



ଲାଭ ଅୟାନ୍ ସେକ୍ର ଅଫ ଏ ଗୁଡ ଗାର୍

ନ୍ୟାଳି ଫ୍ରାଇଡେ

“ମର ନାରୀର ପ୍ରେମ ଭାଲବାସା ଆର ଯୌନତା ନିଯେ ନ୍ୟାଳି ଫ୍ରାଇଡେ ଯେ ଗଲ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖେଛେ—ସେଗୁଲି ଅନେକ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସାହିତ୍ୟକଦେର କାହେ ଅଶ୍ଲୀଲ ବଲେ ମନେ ହେଁଥେବେ— କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାଯନେ ଫ୍ରାଇଡେର ଗଲଗୁଲି ଅବଶ୍ୟାଇ କାଲୋତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ। ଯୌନ ଚେତନାୟ ଅନଭିଜ୍ଞ ଏକ ଯୁବତୀର କଥା ନିଯେଇ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଧର୍ମୀ ଗଙ୍ଗଟି।

ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ରାତେ ସଥିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଦେର ହାଟ ବସେ, ତରୁବୀଥି ସେରା ସୁବାସିତ ଉଦ୍ୟାନେ ଏକା ଏକା ଘୁରେ ବେଡ଼ାନୋର ସମୟ ହଠାତ୍ ଅତର୍କିତେ ଯଦି କୋନୋ ଯୁବକ ସଦ୍ୟ କୈଶୋରୋତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ମେଯେକେ ପିଛନ ଥେକେ ଦୁଃଖରେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ କୋନୋ କଥା ନେଇଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଁ ତାର ମୁଖଟା ମେଯେଟିର ମୁଖେର ଉପର ନାମିଯେ ଏନେ ତାର ତୃଷ୍ଣିତ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ମେଯେଟିର ଉଷ୍ଣ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟେର ଉପର ଚେପେ ଧରେ ଚମୁ ଥାଯ, ସ୍ମୁରିତକ ଚୁପ୍ଚନେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦେଇ ତାର ପ୍ରେମିକାର ଓଷ୍ଠ, ଆର ସେଇ ଚୁପ୍ଚନେ ବୃଷ୍ଟି-ପଡ଼ା କଦମ୍ବର ମତୋ କଟକିତ ହୁଏ ତାର ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ, ତଥନ ମେଯେଟି କି କରେ ବୁଝବେ ଯେ, ସେଠା ତାର ଯୌନ ଅନୁଭୂତି, ଆର ସେଇ ହେବେ ତାର ଚୁପ୍ଚନେର ପ୍ରଥମ ଶୃତି ! ତାର ସଦ୍ୟ ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତ ଦେହ ଓ ମନେ ଏହି ଯେ ଏଥିନ ଏହି ମହୁର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସବ ଭାବାବେଗ ଆର ସଂବେଦନ ଥେକେ ଯୌନାନୁଭୂତିକେ ଆଲାଦା କରେ ରାଖାର ପ୍ରୋଜନୀୟତା, ଏରକମ କିଛୁଇ ଘଟନୀ ଏର ଆଗେ ତାର ଜୀବନେ । ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ତାକେ ଏଭାବେ ହାହାକାରର ଓ କରତେ ହୁଣି । ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ହଲେ ପୁରୁଷଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହେଁ ଓଷ୍ଠେ ତାଦେର ସେଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତାଦେର ସ୍ତନବୃଣ୍ଡର କାଠିନ୍ୟଲାଭେର ମାଧ୍ୟମେ । କିନ୍ତୁ ଅୟାନିର ଶରୀରେ ସେରକମ ଭାବ କଥନେ ଦେଖା ଯାଇନି ଏର ଆଗେ । ଏଠା ଯୌନତା ପ୍ରକାଶର ଲକ୍ଷଣ, ଏରକମ କୋନୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାର ଦେହ କଥନେ ଦେଇନି, ଏମନ କି ଅପର ଭାବାବେଗ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଏସବେର ସଙ୍ଗେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବା ଉପଲବ୍ଧି ବଲତେ ଯା ବୋଧାୟ, ସେରକମ କିଛୁଇ ଛିଲ ନା ।

ଯୌନ ବ୍ୟାପାରେ ଅୟାନି ଛିଲ ଏକେବାରେ ଅନଭିଜ୍ଞ । ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷେର କି ସମ୍ପର୍କ, ଉଭୟେର କାହେ ଉଭୟେର ଦେହେର ପ୍ରୋଜନୀୟତା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋଜନେର ସମ୍ବ୍ୟବହାରେ ଯେ ଏକ ଅନାସ୍ଥାଦିତ ସୁଧାନୁଭୂତି ଜାଗେ ଉଭୟେର ଦେହ-ମନେ ଏସବ କିଛୁଇ ଜାନା ଛିଲ ନା ଅୟାନିର । ଏର ଜନ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ତାକେ ମିଳାପ ଆଖ୍ୟା ଦିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସତ୍ୟେର ଅପବାଦ ହେଁ, କିଂବା ପ୍ରକୃତିକେ ଅବମାନନା କରା ହେଁ ଏହି କାରଣେ ଯେ, ସମୟେ ନାରୀ ପୁରୁଷେର

দেহ-মনে যৌনানুভূতি জাগাটা কোনো সামাজিক অপরাধ নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মে তাকে বলা যায় অক্ষম অঙ্গ কিংবা নিষ্ঠিয় যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। আর যদি কোনো নারী পুরুষের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব চলতেই থাকে চিরদিন, তাহলে সৃষ্টির বিনাশ ঘটবে, নতুন প্রজন্মের জন্ম আর হবে না। একটা পরিবার, একটা জাতির তথ্য একটা দেশের অস্তিত্ব তখন বিলুপ্তপ্রায় হয়ে দাঁড়াবে।

এমন অনেক মেয়ে আছে, যৌন ব্যাপারটা যার কাছে একেবারে অস্তুত, ঘৃণ্ণ এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একটি মেয়েকে আমি জানি, বিয়ের জয়েও যে তার স্বামীর সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হওয়া দূরে থাক এমনকি স্বামীর সঙ্গে একই শয়্যায় তার সঙ্গে নী হয়নি বিয়ের পর অস্তত ছ’মাস পর্যন্ত তো বটেই। যৌনবিদ তথা মনস্তত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির যৌন সংসর্গে আতঙ্কের প্রধান কারণ হল, তার যৌনজ্ঞানের অভাব। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে জানত না নারী-পুরুষ তথা স্বামী-ত্রীর সম্পর্ক কি, সে জানত না বিয়েটা নারী ও পুরুষের অবাধ দেহ মিলনের একটা আইনসিদ্ধ ছাড়পত্র, আর সেই ছাড়পত্রের র্যাদা দেওয়া উচিত প্রতিটি নারী ও পুরুষকে। এই জ্ঞান মেয়েটি উপলক্ষ্মি করেছিল এক অস্তুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তার স্বামী ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসার। বিয়ের ছ’মাস পরে মেয়েটি তার ফরেস্ট অফিসার স্বামীর সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। তার স্বামীর বাসস্থান ছিল জঙ্গলসংলগ্ন একটা বাংলোয়। সেখানে এক পূর্ণিমার রাত্রে মেয়েটি তাদের শয়নকক্ষের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় তাদের বাংলো সংলগ্ন উদ্যানে এক জোড়া হরিণ-হরিণী মেথুন ক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল, তারা তখন সৃষ্টির নেশায় বিভোর। মেয়েটি সেই প্রথম যৌন-সংসর্গের দৃশ্য চাক্ষুস করে, আর সেই প্রথম সে বাস্তবে উপলক্ষ্মি করে দেহ-মিলনের প্রয়োজনীয়তা। হরিণ-হরিণীর দেহ-মিলনের সেই দৃশ্য দেখে মেয়েটি তখন তার দেহে এমন এক অস্তুত উদ্ভেজনা এবং জুলা অনুভব করে যে সেই মুহূর্তে সে তার স্বামী সংসর্গের তাগিদটা ভয়ঙ্করভাবে অনুভব করতে থাকে। তাই সে তখন একরকম ছুটে তার স্বামীর শয়্যাপাশে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে, এবং কিছুক্ষণ গরেই মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিলিত হয়, সেই প্রথম সে মিলনসূখ উপভোগ করে, যে তার কাছে পরম সুখপ্রাপ্তির সামিল বলে মনে হয়। তারপর মিলনে সে আর কখনো তার স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা করেনি। তারা তখন এক আদর্শ সুখী দম্পত্তিতে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে সম্ভবত অ্যানি যখন ছোট ছিল, নয় কি দশ বছর বয়স হবে তার, সেই সময় একদিন তার দুই উরুর সঞ্চিহ্নে তার বালিশটা চেপে ধরতেই এক রোমাণ্টিকর অনুভূতি জেগে উঠেছিল তার দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার মনে হয়েছিল তার উরু সঞ্চিহ্ন থেকে যেন আগনের স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে, যে আগন তার পক্ষে একা নেভান সম্ভব নয়, তার তখন একজন পুরুষ সঙ্গী চাই, যে তার দেহের আগন নিভিয়ে দিতে পারবে। এই উষ্টুট কল্পনা প্রায়শই মেয়েদের মনে যখন জাগে তখন

তাদের বয়স খুবই কম। খারাপ পাইরেটের মতোই সেই কল্পনা তাদের নিষ্পাপ মনটা দখল করে নেয়, আবার এমন কিছু বদ লোক আছে যাদের এমন কিছু কিছু কল্পনা আছে যা নিষিক্ষ, যা মেয়েদের দেহ-এন কল্পিত করে দিতে পারে, অপবিত্র করে দিতে পারে, সেসব অনুভূতিগুলোই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিজ্ঞাপিত করে থাকে। তবে তাই বলে এ ধরনের অনুভূতিগুলোকে কেউই যৌন বা কামজ বলে ভাবে না। কেউ ভাবে না মাত্র ন'বছর বয়সের মেয়ের মনে কাম ভাব জেগে উঠতে পারে। তগবান না করুন, একটি চার বছর বালিকার মধ্যেও আবার প্রথম যৌন অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠার কথাটা যেন সত্যি না হয়, যিথে বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবুও এটা একটা ঘটনা, সেই সব বালিকাদের অভিভাবকদের বড় ভাবনা, বড় দৃশ্যিষ্ঠ।

কোনো মেয়ে কি ভাবছে, কি অনুভব করছে নিজের কাছেই তার কোনো তাষা নেই বর্ণনা দেওয়ার মতো, তবুও সেই সব নোংরা কথাগুলো জানতে চায় না সে, কারণ ইতিমধ্যেই ভালো মেয়ে হিসাবে সুস্থানি পেয়েছে সে তার অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিশোর বয়সেই সব মেয়েদেরই বিশ্বাস, সব রকমের বেদন, সংবেদন, ভালোবাসার মাধ্যমে সারতে হবে। তবে দেহকে বাদ দিয়ে কোনো ভালোবাসাই যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, সেটা জানতে তাকে অপেক্ষা করতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তি পর্যন্ত, যৌবনের পূর্ণতাই তাকে তার দেহ ও মনের সঠিক পথের নিশানা দিয়ে দেবে।

এখন দেখা যাক ছেলেটি কোনো মেয়েকে চুম্ব খেলে তার কি অতিক্রিয়া হয়। ছেলেটি মেয়েটির মনে এই সব মনোভাব জাগিয়ে তোলে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা সে রপ্ত করেছিল যৌন উভ্যেজক গানের কথা আর সুর থেকে। রোমান্টিক উপন্যাসের পরিচন থেকে, ছায়াছবির প্রেমের দৃশ্য থেকে। ছেলেরা যখন বহির্জগতে বেরিয়ে নানান ভালোমন্দ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সৎ মানুষের গুণগুলো আহরণ করে সৎ-সাহসী এবং স্বাধীন হওয়ার শিক্ষালাভ করতে থাকে, তখন মেয়েরা অন্দরমহলে থেকে একসাথে থাকার অভ্যাস করা অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচ করা, নিজেদের মধ্যে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া, কি করে পুরুষদের কাছ থেকে দূরে থেকে দেহের পরিত্র বজায় রাখা, এসব অভ্যাসগুলো রপ্ত করতে ব্যস্ত থাকা। এ ধরনের নিশ্চিদ্র বন্ধুত্বের ফলে মেয়েরা বহুর মধ্যে একতা রক্ষা করে চলতে দেখে যেমন তারা তাদের মাঝের সঙ্গে এক হয়ে থাকে, আর এই ভাবটা জিইয়ে রাখার জন্যে তারা বারবার নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করে নিতে থাকে যতক্ষণ না ছেলেরা তাদের গ্রহণ করার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তোলে। আর যদি এই সব ভালো ভালো বন্ধুত্বের মধ্যে একটিও তালগোল পাকিয়ে যায় কিংবা ভগুল হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা কোনো মায়ের পরিত্যক্ত শিশুর বেদনারই সামিল বলা যায়।

এই বিশ্বাস-ভঙ্গতা স্বাবলম্বনে বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোনো

উপকার করতে পারে না। বরং পতনই ডেকে আনে তাদের জীবনে। মেয়েরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার বাইরে কটুকুই বা জানে? তারা তাদের সারটা জীবন ধরে একসঙ্গে থাকা, ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যেই শুধু প্রশংসিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেই সব স্থিতিবস্তু বজায় রাখতে গিয়ে তাদের যে কি পরিমাণ আঘাতবলি দিতে হয় সেটা ঘুণাঘুণেও কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করে না।

তাই তারা পূর্ণ চারের হাটে নিজেদেরকে একসাথে সামিল করেছে আজ। ছেলে এবং মেয়েটি। ছেলেটিকে দেখে মনে হয়, বেচারা নিরীহ নিষ্পাপ, তার সম্পর্কে মেয়েটির ধারণা এই রকমই। এবং এরকম একটা ভালো ধারণা করে নিয়েই সে তাকে স্পর্শ করে, চুমু খায়, সুখ অনুভব করে। এখন দেখতে হবে যুবকরা এই সব মেয়েদের কটুকুই বা জানে? তার একটা হাত তখন মেয়েটির কোমর বেষ্টিত এবং আর অন্য হাতটি তখন মেয়েটির দুই উরুর সঞ্চিহ্ন ছুই ছুই। মেয়েটি আশৈশ্বর যে পবিত্র ভাবধারায় বড় হয়ে উঠেছে, তার কাছে ছেলেটির এমন এক বিসদৃশ ব্যবহার যেন তার কাছে বিনামেঘে বজায়াতের সামিল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে ওঠে। মেয়েটি তখন ক্রুদ্ধ স্বরে ছেলেটিকে তিরক্ষার করে বলে, সে এক জঘন্য চরিত্রের ছেলে। মেয়েটি কেন্দে ফেলে। ছেলেটি কি করে তাকে বাজারি মেয়ে ভাবল? এতদিন সে ভালো মেয়ে হওয়ার সব রকম নিয়ম-নিষ্ঠ পালন করে এসেছে, তার সেই প্রাপ্য মর্যাদা দেবে না ছেলেটি? ছেলেটি তার এই সব ভালো ভালো কাজের পূরক্ষার হওয়ার কথা, তাকে এভাবে নির্যাতন করার কথা নয়। তাছাড়া, তাছাড়া মেয়েটি তার বাহ্যিকনে আবক্ষ থাকার সময় যে রোমান্টিক ভাব অনুভব করেছিল, অপর হাত দিয়ে সেটা সে ধৰ্মস করে দিয়েছে।

ছেলেটি তার ওপর যে অন্যায় ব্যবহার করেছে, তার খেসারত তাকে দিতেই হবে। যদি ছেলেটি আবার তার হাত মেয়েটির গায়ে দিতে চায়, তাহলে সেটা হবে তার শর্তে। কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়ের বন্ধুত্ব স্থাপন করার ক্ষেত্রে মেয়েটির প্রথম শিক্ষাই হল তাকে আভাস দেওয়া এই বলে যে, যৌনভাবটাকে সময় মতো ব্যবহার করার আগে পর্যন্ত প্রশ্মিত করে রাখা। এর জন্যে যদি ছেলেটির মনক্ষুঁষ্ট হয় তাহলে সে নাচার।

আর তার পক্ষে, ছেলেটি এবার মেয়েটির ওপর ভাব দেয়, সে স্থির করুক তাদের মধ্যে কোনো সেৱা হবে কি হবে না। মেয়েটি এর আগে যে ভাবে ছেলেটির ওপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল, সে কথাটা মেয়েটিকে মনে করিয়ে দিতে চাইল সে। ছেলেটিও তাকে এও জানিয়ে দেয় যে, মেয়েটিকে এখনও চায় সে। ভালোবাসার দ্রবাদরি তাকে এমন বিরক্ত হয়ে যে করতে হবে ভাবতেই পারেনি ছেলেটি। তাই এভাবেই না বলা শর্তে তাদের ভালোবাসার ভিত এভাবেই রচিত হল। অতএব নারী ও পুরুষের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের সূত্রপাত।

যদি কখনো মেয়েটি উপলক্ষি করে, যৌনতার অধিকার তার আছে, যৌবনপ্রাপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন কী প্রতিটি লোমকূপে ঘৌনতার প্রকাশ ঘটেছে, যা তার প্রেমিকের কাছে আকর্ষণীয় এবং প্রকৃতির নিয়মে সেটাই কাম্য এই কারণে যে, ঘৌনক্রিয়া একা নারী কিংবা একা পুরুষের শত চেষ্টাকেও সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, সেটা করতে হয় ঘৌনভাবে উভয়ের সম্মতিতেই। তার এই নবলক্ষ উপলক্ষের পরেও কি মেয়েটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয়? হস্তমৈথুন সব কিছুর সমাধান করতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, ভালোবাসা থেকে ঘৌনভাবটাকে কখনোই আলাদা করে রাখা উচিত নয়, প্রেম ও ঘৌন এ দুটি একে অপরের পরিপূরক, তাই এ দুটিকে এক সাথে নিয়েই ঘর করতে হয়। মেলামেশা করতে হয় প্রতিটি নারী পুরুষকে।

মেয়েদের মেয়েবেলার ভাবধারা অন্যরকম থাকে, মায়ের শিক্ষায় অন্য ভাবে তারা নিজেদেরকে গড়ে তোলে। মায়ের শিক্ষা হল, সব সময় নিজের দেহটাকে পরিত্র রাখার চেষ্টা করবে, কুমারীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে, পুরুষের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ঠিক আছে, এই মেয়েবেলা পর্যন্ত, কৈশোর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে যখন সে ঘৌনবনে পা দেবে, তখন সেক্স সম্পর্কে তার শিক্ষা, ধ্যান ধারণা সব বদলে দিতে হবে। তখন তার মায়ের উচিত তাকে বোঝান, এরপর থেকে হস্তমৈথুনে তার রতিত্তপ্তিলাভের প্রয়োজন আর নেই, এখন তাকে সরাসরি তার মনের মতো পুরুষের সঙ্গে দেহমিলনে লিপ্ত হয়ে ঘৌনসুখের সন্ধান করা উচিত। এখন তাকে প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রের সন্ধান করতে হবে, তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে, তাকে জানতে হবে, তার মধ্যে জেগে উঠবে ঘৌনভাব, এবং তার দেহেরও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঘৌনভার প্রকাশ প্রকট হয়ে উঠবে, যেমন মেয়েটি তখন তার স্তনে তার প্রেমিকের চাপ আকাঙ্ক্ষা করবে, প্রেমিকের চুম্বনে সে তার ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ করে তুলতে চাইবে, পুরুষ কৌমার্য হরণ করতে হত তাকে। আর এভাবেই সে উদগ্রস্থ সঙ্গমেছু করে তুলতে পারবে নিজেকে। কৈশোরে সে তার মায়ের কাছে সেক্স থেকে দূরে থাকার শিক্ষাটা এখন বদলাতে হবে, নিজেই নিজেকে সেক্স সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, এবং হস্তমৈথুনের প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেতে হবে তাকে। নিজেকেই ঘৌন জীবনে অভ্যন্ত করে তুলতে হবে, তা না হলে তার বিবাহিত জীবন সুখের হবে না, অসময়ে অপমৃত্যু ঘটতে বাধ্য! তবে এক্ষেত্রে ছেলেদেরও একটা ভূমিকা আছে। দায়িত্ব আছে মেয়েটিকে ঘৌনসুখী করে তোলার, তাকে ঘৌন জীবনে নিয়ে আসা। তবে ছেলেটির সর্বপ্রথম কাজ হবে তাকে ভালোবাসতে হবে, তার গভীর ভালোবাসা দিয়ে মেয়েটিকে বোঝাতে হবে ভালোবাসা আর সেক্স এ দুয়ের সম্পর্ক ঠিক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মতো। কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে। আর তাতেই সাফল্য পাবে সে, মেয়েটিকে তার সঙ্গে ঘৌন-মিলনে রাজি করাতে পারবে।



টম জোস

হেনরী ফিল্ডিং

“হেনরি ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাস টম জোস-এর জন্য সৃপরিচিত, এলবাট ফিনি এবং সুমানা ইয়ার্ড এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। এই কাহিনী তাঁর প্রারম্ভিক উপন্যাস থেকে নেওয়া। এই লেখাটি মনে করিয়ে দেয় ফিল্ডিং-এর বিচিত্র ধরনের সুন্দর রসবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা এবং স্বাভাবিক উদারতাবোধ। সুন্দরী পরিচারিকার সঙ্গসুধে এক অনাবিল তৃপ্তির স্বাদ পাওয়া, যার আনন্দময় কৌতুক মেয়েটি নিজেই অস্তীকার করতে পারে না, শরীরী মিলন তাকে সুখ প্রাপ্তির প্রচুর সুযোগ করে দিয়েছিল, সেই ক্ষণিকের ঘোন অভিজ্ঞতা বারবার তার দেহ-মনে একটা নিরবিচ্ছিন্ন কৌতুহল জাগিয়ে তুলতো রাতের পর রাত...”

সব সময়েই ওর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যঙ্গতা, এ ঘর থেকে ও ঘরে, একজনের হাদয় থেকে অন্য একজনের হাদয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান, এতো সব ব্যঙ্গতার উপলক্ষ্য তো সেই একটিই মেয়ে বেটি। সুন্দরী, তরী ও যুবতী, এসব ছাড়াও আরও কিছু ভালো ভালো গুণ ছিল, যা উল্লেখ না করলে ওর প্রতি ভয়ঙ্কর একটা অবিচার করা হয়ে যাবে। ওর মধ্যে ছিল একটা ভালো স্বভাবের লক্ষণ, মহসুবোধ এবং অপরের দৃংশ্যে সমবেদনা জাগাবার সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ওর দেহ-মনের বিন্যাস যে সব উক্ত মিশ্র ধাতুতে গড়া, তাতে আশ্রম-বালিকার পবিত্রতা হয়তো বেশ সুন্দর অর্থচ অন্তর্ভুক্ত যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু একটা সরাইখানার পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার সময় সেখানকার আবহাওয়া এবং পরিস্থিতিতে ওর মনের সব দৃঢ়তা কেমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে, তখন ও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। বিচলিত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

সরাইখানায় কত রকম চরিত্রের লোকেরই যাতায়াত, এখানে এলেই এখানকার পরিচারিকাদের এক একজন কত সহজেই না প্রেমিক হয়ে যাও, তার ওপর যদি কোনো পরিচারিকা সুন্দরী এবং বলা বাস্ত্ব্য যুবতী হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম নিবেদন। তারপর সরাইখানায় খদের হিসাবে ধরে রাখতে সময়ে-অসময়ে তাদের আদর-আবদারও সহ্য করতে হয়, শয়া-সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতেই হয়, যে মেজাজ বা মনোভাবেরই লোক হোক না কেন সে। এমনকি কখনো কখনো সামরিক বিভাগের কোনো কোনো সুন্দর সভ্য-ত্ব্য ভদ্রলোকের বিপজ্জনক আহানেও সাড়া দিতে হয় ওকে, তাকে খাতির করতে সারাটা বছর ধরে তার সঙ্গী সাড়া দিতে হয় ওকে, তাকে খাতির করতে সারাটা বছর ধরে তার সঙ্গী হতে হয় বৈকি। এসব ছাড়াও সময় সময় পথচারী, কোচওয়ান কিংবা সরাইখানার পরিচারকদের মনোরঞ্জন করতে হয় ওকে। এইসব সামরিক বাহিনীর ক্ষণিকের প্রেমিক-অতিথিরা তাদের প্রেমের অঙ্গ হিসেবে ওর ওপর ব্যবহার করতে চায় চুম্বন, মিথ্যে আশার প্রলোভন, উৎকোচ প্রদান এবং প্রেমের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যত রকম অন্ত্র আছে সবই ওর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চায় তারা।

একুশ বছরের যুবতী বোট আজ তিন বছর হল এই বিপজ্জনক অবস্থায় বাস করছে, এই সময়ে বেশ ভালোভাবেই নিজেকে সেই সব বিপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। আবার এই সময়েই বেটি ওর জীবনে এমন এক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল যে কিনা ওর হাদ্যে একটা গভীর ছাপ ফেলে দিতে পেরেছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই বেটির মধ্যে একটা অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিল, যে আগুন একবার সেই প্রেমিকটিই নেতাতে পারতো। এ এক বিচিত্র প্রেমের জ্বালা। বেটি যখন ওর সেই প্রেমিক প্রবরাটির জন্যে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে, ওর হাদ্য জুলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তখন বহু পুরুষ আবার ওকে না পাওয়ার জ্বালায় জুলে-পুড়ে মরছে। সামরিক অফিসাররা, পশ্চিমাঞ্চলে অমণত যুবকেরা, মহিলাদের নিরীহ সঙ্গীরা এমনকী কবর খননকারীরা পর্যন্ত ওর তীব্র আকর্ষণে ছটফট করতে থাকে।

অবশ্যে বেটি ওর প্রথম অসুখী আবেগের প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠার পর চিরহায়ীভাবে কৌমার্যব্রত গ্রহণ করার জন্যে শপথ নিল। বেটি প্রেমিকদের সমস্ত দৃঢ়-কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখেও বোবা বনেছিল দীর্ঘদিন ধরে। এভাবেই ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলছিল। এই সময় পাশেই একটা মেলায় সরাইখানার অশ্বরক্ষক জন-এর বক্তৃতা ওর ওপর দ্বিতীয়বার প্রভাব পড়ল। লোকটির মাথায় স্ট্র-হ্যাট এবং বগলে মদের একটা বোতল।

যাইহোক, এই উপলক্ষে বেটি ওর আগের প্রণয়ের ফলস্বরূপ সেরকম কোনো উন্নেজনা বা উন্নাপ অনুভব করেনি। এমনকী সেই একজন বিচক্ষণ যুবতী তার প্রেমিকের আদর ও সোহাগের নিরঙুশ প্রশ্রয় থেকে আগে ভাগে টের পেয়ে গেছিল, আর এর থেকে ওর সতর্ক হওয়াটাই ওকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। পরে অবশ্য বেটির মধ্যে একটা অস্তুত পরিবর্তন লক্ষ করা

যায়, জন-এর প্রতি ওর আনুগত্য, ভালোবাসায় একটু ঘাটতি কিংবা বলা যায় অবিচলিত না থাকার দরুন, জন-এর সঙ্গে কোচওয়ান টম হইপওয়েল এবং যখন তখন এক একজন তরুণ ভৱণার্থীদের অনুগ্রহ করে সে।

মিষ্টার টো-উজ কিছুদিন ধরে এই যুবতীর ওপর কৃদৃষ্টি ফেলে রাখছিল। সুযোগ পেলেই ওর কানের কাছে ভালোবাসার বুলি আওড়াতো। ইনিয়ে-বিনিয়ে কখনো বা কু-প্রস্তাব দিতেও ছাড়তো না, কখনো বা জড়িয়ে ধরে ওর গাল টিপে দিত, স্তনে চাপ দিয়ে মোচড় দিত, আবার এক এক সময় ওঁর ঠোটে চুমু খেতো। মিসেস টো-উজের জন্যে তার সেই আবেগের প্রচণ্ডতা একটু প্রশংসিত হলেও, তার বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বেশী সময় লাগে না। যেমন এক জায়গায় নদীর প্রবাহিত জলের স্নোতে বাধা সৃষ্টি করলে স্বভাবতই সেই স্নোত অন্য দিকে বাঁক নিতে বাধ্য। ওদিকে মিসেস টো-উজ হয়তো উপলব্ধি করে থাকবে, অন্য নারীর প্রতি তার স্বামীর আসক্তি। এবং স্বভাবত তার মেজাজের স্বাভাবিক মিষ্টতায় স্বামীর এই অন্যায় খেলায় তেমন কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না, কারণ প্রতিদিন সূর্য ওঠার মতোই স্বামীর কাছে তার স্ত্রী ধ্রুব সত্য। স্ত্রী যেমন উজ্জুল হয়ে উঠতে, স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে উঘতা অনুভব করতে সমান পারদর্শনী সে। আসলে তার সব বক্তব্যের একটাই মূল সূত্র হল, যেমন আকর্ষণে স্বামীরা পর-নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিংবা অন্য নারী তাদের চুল ছলাকলা দেখিয়ে পর-পুরুষদের আকর্ষণ করার ফাঁদ পেতে থাকে, সেগুলো যদি তারা নিজেরাই যে যার বাড়িতে বসে তাদের স্বামীদের দেখাবার চেষ্টা করে, মনে হয় এতে তারা ফল পেতে পারে হাতে হাতে। স্ত্রীরাই যদি স্বামীদের চাহিদা মতো অন্য নারীর অভাব পূরণ করে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে কেনই বা তারা বহিমুখী হতে যাবে?

যোসেফের আবির্ভাবের পর থেকেই ভয়ক্রিয়াবে তাকে পছন্দ করার ভাব প্রকাশ করতে থাকে বেটি। ওর এই আকর্ষণবোধ উন্নতোভর বাড়তে বাড়তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। বিস্ফোরক পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে যেমন দেশলাই কাঠির প্রয়োজন হয়, তেমনি এই মুহূর্তে বেটির বিস্ফোরক দেহে বিস্ফোরণ ঘটাতে প্রয়োজন একজন পুরুষের, মনের মতো পুরুষ দেশলাই কাঠির মতো সেই কাজ করবে ওর দেহে অগ্নিসংযোগ করে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে। আর সেই দেশলাইকাঠিটা এখানে যোসেফ। ওদিকে যোসেফেরও জায়গাটা ক্রমশই ভালো লাগছিল, এক অনাস্থাদিত আকর্ষণবোধ করছিল। সে আকর্ষণের গৃঢ় অর্থ বোধহয় যোসেফ নিজেই জানতো না, তা বেটি কি করে জানবে? সব কিছুই অজানা তখন বেটির। ও তখন জানতো না কোন পথে পদক্ষেপ করতে চলেছে ও। শ্রেফ মোহে, হাঁ একটা মোহের আবর্তে পড়ে ও তখন লাটুর মতো পাক খেতে চাইছিল ওর স্বপ্নের রাজকুমার যোসেফের চারপাশে। সরাইখানার

পরিচারিকা হিসাবে বেটির কাজ ছিল বোর্ডারদের ঘর পরিষ্কার রাখা এবং বিছানাপত্তর গোছগাছ করা। সেদিন সেই ভয়ঙ্কর রাতটা ছিল প্রচণ্ড শীতলতম। যোসেফের বিছানাটা তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা, তাই তার বিছানাটা গরম করতে গরম-প্যান ব্যবহার করছিল ও। যোসেফের বিছানা গরম করতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ও নিজেই এতই গরম হয়ে উঠছিল, এবং ওর আবেগ এমনি চরম পর্যায়ে পৌছে গেছিল, এবং এমন নির্বৃত তাবে পরিকল্পিত হয়েছিল ওর বিনয় ও ন্যূনতার গুণে যে, অনেক ব্যর্থ আকার-ইঙ্গিত এবং পরোক্ষ ইশারা সঙ্গেও যোসেফ যখন সাড়া দিল না, অবশেষে ও তখন গরম-প্যানটা নিচে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দুঃহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল যোসেফকে, ওর মধ্যে প্রচণ্ড কামনা-বাসনা, বেটির উচ্ছাস তখন এমনি এক পর্যায়ে পৌছে গেছিল যে, যোসেফ তখন ওর কাছে যেন এক রাজপুত্র, পৃথিবীর সেরা সুপুরুষ যাকে ও আগে কখনো দেখেনি। তাই যোসেফকে একান্তে কাছে পেতে সবকিছু করতেই প্রস্তুত, এমন কি যদি সে চায় তার সামনে সম্পূর্ণ নম্ব হয়ে দাঁড়াতেও প্রস্তুত ছিল বেটি তখন। তাবা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না, এই সেই বেটি যে কিনা যোসেফের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের সতীত্ব রক্ষার্থে অবিচল ছিল, কোনো পুরুষ ওকে স্পর্শ করা দূরে থাক, কোনোরকম থলোভনে অলুক পর্যন্ত করতে পারেনি ওকে। বিচিত্র নারী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তার মন!

ওদিকে যোসেফ কিন্তু এ সবের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বেটি যে অমন এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে, সেটা ছিল তার ধারণার অতীত, কল্পনার বাইরে। সে তখন ভয়ঙ্কর বিভ্রান্ত, হতভস্ব, দ্রুত বেটির আলিঙ্গন ছিন্ন করে লাফিয়ে উঠল। তারপর ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার পর স্পষ্টতাই বেটির অমন সৃষ্টিহাড়া আচরণের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দ্যুর্থহীন ভাষায় বলে উঠল, একজন যুবতী মেয়েকে অমন ন্যূনতা, শালীনতা বিসর্জন দিতে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত সে। এমনটি সে আশা করেনি বেটির মতো মেয়ের কাছ থেকে।

বেটির কিন্তু তাতে কোনো রকম ঝাক্ষেপ নেই, যোসেফের কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিল। শুধু কি তাই, ও তখন এমনি এক কঠিন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সেখান থেকে পিছু হটে আসা সন্তুষ্ট নয়। এবং বেটি তখন এমনি এক অভব্য ব্যবহার করল যে বেটির অপ্রত্যাশিত প্রেম-নিবেদনে সাড়া দেবার পরিবর্তে যোসেফ ওর এমন অশালীন ব্যবহারের বিরোধীতা করে ওকে দুঃহাত দিয়ে ধরে কার্যত ধাক্কা দিয়ে তার ঘর থেকে বার করে দিল। এবং ভেতর থেকে নিজের ঘরটা বক্স করে দিল।

যদি কোনো পুরুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা থাকে এবং তার সংযম সব সময়েই নিজের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তার আনন্দ কত যে অপরিসীম

হয় তা বোবাতে কোনো অসুবিধে হয় না। ঠিক এই কারণেই যোসেফের দৈহিক শক্তি সব সময়েই সক্ষম থাকে বলে নিজেই প্রতিরোধ করতে পারে, যেমন সহজেই বেটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারল। আর তাই কি বেটির মতো দুর্বল চিন্তার একজন নারী তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে তাকে ওর সঙ্গে সেই মিলনে লিপ্ত করতে পারল না!

এমন হতাশায় বেটি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। দুর্বার ক্রোধ, আবেগ আর কামলালসা ওর হৃদয়টাকে ছিন্ন বিছিন্ন করে দিয়েছে। যেমন দু'টো দড়ির প্রাণ দু'টি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হলে যা হয়। একটা মুহূর্তে যোসেফের বুকে ছুরি বাসিয়ে দেবার কথা ভেবেছিল বেটি। আবার পরমুহূর্তেই তাকে নিজের দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং চুমায় চুমায় তার ঠোঁট রাঙিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল এবং পরের আবেগটা অত্যন্ত ব্যাপক। তারপর ওকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবল। কিন্তু ওর উপায় হিসাবে জলে ঢুবিয়ে, গলায় ফাঁস দিয়ে কিংবা বিষপ্রয়োগ করার কথা ভাবছিল, তখন ওর বিক্ষিপ্ত মন কোনো সিদ্ধান্তেই উপনিত হতে পারল না।

এইরকম একটা অস্থির ভাবাবেগের মুহূর্তে আকস্মিকভাবে বেটির মনে পড়ে গেল, ওর মনিবের বিচানা পাতা হয়নি ; অতএব ও তখন সোজা জনের ঘরে চলে গেল। সেই সময় সে তখন তার টেবিলের সামনে বসে নিজের কাজ করতে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখা মাত্র ও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হল। কিন্তু সে তখন ওকে ফিরে আসতে বলল। তারপর বেটির একটা হাত ধরে ওকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর স্তনজোড়া চটকাবার ফাঁকে ফাঁকে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে প্রেমের বুলি আওড়াচ্ছিল। আর এক সময় বেটিকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বেটির ঠোঁটের ওপর তার ঠোঁট চেপে ধরে চুমু খেতে থাকল। বেটি তখন সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। বেটির দেহমনে আগেই আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এমনটিই চাইছিল ও, জন ওকে পরাভূত করুক, বলপূর্বক কৌমার্য হরণ করুক। এবং বেটি মনে মনে চাইছিল ধৰ্মিতা হওয়ার জন্যে। আর তাই কি ও নিজেকে সঁপে দিল জনের কাছে, ও এখন জনের হাতের পুতুল, সে ওকে যেভাবে নাচাবে, সেভাবে ও নাচবে। সনাতন প্রথায় সে যদি বেটিকে তার নিচে না শুইয়ে বলে, তুমি আমার ওপরে শোও, ও তাই করবে নীরবে। বেটির এখন একটাই উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক জনকে পাওয়া, নিজের দেহকে তৃপ্ত করা, আর সেটা যদি বিপরীত বিহারে হয়, শক্তি কি!

জন-এর তরফ থেকে কেন এই বৈপরিত্য? আমার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন, একটু আগে বেটি যখন স্বেচ্ছায় ওর দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে তুলে ধরেছিল যোসেফের সামনে, সে তখন ওকে গ্রহণ করা দূরে থাক। উপরন্ত

ওকে একবকম গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ যেন বেটির মনিবের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা। না, ঠিক তা নয়, আসলে সেই সময় মিসেস টো-উজ অভাবনীয়তাবে তার ঘরে ঢুকে পড়ে, এবং সেই মাত্র জন তার স্ত্রী সঙ্গে মিথুন-লগ্নে প্রবৃত্ত হয়, আর এটাই হল বিপ্রাণ্তির কারণ যা আমরা একটু আগে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বর্তমানে এ নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই এই কারণে যে, জন বেটিকে গ্রহণ করেছে সর্বাঙ্গকরণে। আমাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র আভাস না পেলেও আমি অন্যায়ে বলে দিতে পারি যে, প্রতিটি পাঠক-পাঠিকা, সে যে ধরনেরই হোক না কেন, কিংবা তার অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন, যদিও সে বিবাহিত নয়, সহজেই অনুমান করে নিতে পারবে। এর পরিণতি হল, জন-এর সঙ্গে মিলনে ওর স্বর্গসুখ প্রাপ্তি ঘটেছিল। তবে সেটা সম্ভব হয়েছিল তার স্ত্রীর বদন্যতার দরুণ। মিসেস টো-উজ-এর সঙ্গে তার শামীর বোঝাপড়া হয় এই পর্বে যে, ভবিষ্যতে জন এ-ধরনের ব্যবহার আর কখনোই করবে না, অর্থাৎ পরনারীর প্রতি আসক্ত হবে না সে।

সব শেষে এখন তার এমনি একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তার জীবনের অবশিষ্ট অধ্যায়ে দিনে একবার কি দু'বার তার শর্ত ভাঙ্গার দায়ে আয়ুক্ষিত্য করার কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তাকে। তবুও তাতে কোনোরকম জ্ঞাপন বা অনুশোচনা নেই। তার মনোভাব এখন এই রকম : অপরাধ করবো আবার জরিমানা দেব, জরিমানা দিয়ে সেই অপরাধের সুর অনেক।



ରୋମାନ୍ ଅୟାନୀସ ନୀନ

“ପ୍ରାରିସେ ବିଶ୍ଵ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ ଓ ତିରିଶ ଦଶକେ ଅୟାନୀସ ନୀନେର ବୋହେମିଆନ ଲାଇଫ୍‌ସ୍ଟାଇଲ ଆଜ ଆର ଅପରିଚିତ ନୟ ପାଠକ ପାଠିକାଦେର କାହେ । ସେଇ ସଙ୍ଗେ ବହ ବିତରିତ ପ୍ରଛେର ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ହେନରି ମିଲାରେର ସଙ୍ଗେ ତାର ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କେର କଥାଓ ସର୍ବଜନବିଦିତ । ଯାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୟ ହେନରି ଏଣ୍ଡ ଜୁନ ଛବିତେ । ସେଇ ଅୟାନୀସ ନୀନ ଆମେରିକାଯ ପାଡ଼ି ଦିଯେ ଏକେର ପର ଏକ ଇରୋଟିକ ଗର୍ବ ଲିଖେ ଯାନ, ଯାର ସମ୍ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଛିଲ ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ଏକ ଡଲାର । ସେଇ ସବ ବିଶ୍ଵ-ବିଖ୍ୟାତ ଇରୋଟିକ ଗଞ୍ଜେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଗଞ୍ଜଟିଓ ଅନ୍ୟତମ ।”

ଫରାସୀ ଦେଶେର ଏକଜନ ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ବୀର ଏବଂ ନାଇଟ୍ ଏକ ସମୟ ଏକଜନ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାର ପ୍ରେମେ ପଡ଼େ ଯାନ, ଆର ସେଇ ମହିଳାଟିଓ ନାଇଟକେ ସମ୍ମାନ କରି ଦିଲେନ, ଏମନ କି ନାରୀର ସବ ଥେକେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସତୀତ୍ୱ—ସୋାଓ ତିନି ଖରଚ କରେ ବସେଛିଲେନ ନାଇଟ୍‌ଟରେ ଜନ୍ୟେ । ଭଦ୍ରମହିଳା ତଥାନ ନାଇଟ୍‌ଟରେ କାହେ ସମ୍ପଦଲୋଭ୍ୟ ହୟେ ଓଠେନ, ନାଇଟ୍ ଯା ଚାନ ତାଇ ଦେନ ତିନି, ନା ଚାଇତେଇ ନିଜେର ଥେକେ ତିନି ତାର ଦେହରେ ନୈବେଦ୍ୟ ସାଜିଯେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଥାକତେନ ପ୍ରତି ରାତ୍ରେ । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ରାଜାର ହୁମେ ନାଇଟକେ ଯୁଦ୍ଧେ ଯେତେ ହଲୋ ସ୍ପେନ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର । ସୁନ୍ଦରୀର କାହୁ ଥେକେ ବିଛିନ୍ନ ହେଯାର ପର ମନ ଖାରାପ ହଲେଓ ଯୁଦ୍ଧେ ଗିଯେ ନାଇଟ୍‌ଟରେ ସୁନାମ ଆରୋ ବେଢେ ଗେଲ । ରାତାରାତି ଆରୋ ବିଖ୍ୟାତ ହୟେ ଉଠିଲେନ ତିନି । ଯୁଦ୍ଧ ଶେବେ ତିନି ବୀର ନାୟକେର ମତୋ ଦେଶେ ଫିରେ ଏଲେନ ।

ଶୁଦ୍ଧିକେ ନାଇଟ୍‌ଟରେ ଅନୁଗ୍ରହିତିତେ ତାର ପ୍ରେମିକା ଆର ଅପେକ୍ଷା କରେ ଥାକତେ ପାରଲେନ ନା । ଜୀବନେର ନିଃନୃତ୍ୟ କାଟାବାର ଜନ୍ୟେ ତିନି ଏକଦିନ ବିଯେ କରେ ବସଲେନ ଏକ ବୟକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଦ୍ରଲୋକକେ । ରାଜଦରବାରେ ଦାରଣ ଖାତିର ତାର । ଭଦ୍ରଲୋକ ମହା ଖୁଶି । କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିତେ ଫିରଲେ ତାର ସେଇ ଖୁଶିର ଆମେଜଟା ନିମ୍ନେସେ କର୍ପୂରେର ମତୋ ଉବେ ଯାଯ । ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଙ୍ଗ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁ ବୋଖେ ନା । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାନେ ନା, ସେଙ୍ଗ ଛାଡ଼ାଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କିଛୁ ଦିଯେଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତୋଳା ଯାଯ । ସ୍ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗେ କିଛୁଦିନ ଘର କରିବାର ପରେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେନ ବୁଝାତେ ପାରେନ ତାର ମତୋ ଜାନୀ-ଶୁଣୀ ମାନୁଷେର ଯେ

ধরনের বউ পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পাননি।

নাইট দেশে ফিরেই তাঁর প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে প্রথমে একটু মুষড়ে পড়লেও একটুও দমলেন না, কিংবা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেন না। একদিন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে, বর্তমানে ভদ্রলোকের স্ত্রী, দেখা করতে গেলেন তাঁর স্বামীর বাড়িতে। ভদ্রলোক দারুণ আলাপী এবং অমায়িক। নাইটকে তিনি খুব খাতির করে আপ্যায়ন করলেন। সোজা তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাকে সম্মানিত অতিথির মতো। পরে নেশভোজের পর দামী মদ খাওয়ালেন। নাইট দারুণ তঞ্চ। তবু যেন কিসের অভাব! তা তাঁর সেই অভাবটা পূরণ করতে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী, নাইটের প্রাঙ্গন প্রেমিকা। ভদ্রমহিলা নাইটকে আদর আপ্যায়ন করতে চাইলেন ঠিক আগের মতো। একটুও বদলাননি তিনি।

ভদ্রমহিলার মনের ভাবটা টের পেয়ে আড়ালে তিনি তাঁর প্রাঙ্গন প্রেমিকার কানে কানে ফিসফিস করে আগের মতো প্রেম নিবেদন করে বললেন, ‘মানুষের ইচ্ছে থাকলে একটা না একটা উপায় ঠিক হয়ে যায়। তোমার স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার ঘরে চলে এসো।’

‘অস্বীকৃত! ভদ্রমহিলা দু পা পিছিয়ে গিয়ে হতাশার সুরে বলে উঠলেন, “ওর ঘুম ভীষণ হাস্কা। তাছাড়া মাঝে মাঝে আমার গায়ের ওপর হাত রেখে ঘুমোন। তাই আমার আশঙ্কা, ঘুমের মধ্যে আমাকে না পেলে একটা কেলেক্ষারি হয়ে যাবে।”

“আছা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?” নাইট জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার স্বামী কি শুধু তোমার গায়ে হাত দেন, না অন্য কিছুও করেন?”

“না, এ বয়সে অন্য আর কি করতে পারেন?” বলে ভদ্রমহিলা রহস্যময় হাসি হাসলেন।

নাইট বুঝলেন, ভদ্রমহিলার বয়স্ক স্বামী বয়সের ভারে তাঁর যৌন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন বোধহয়। ভালই হয়েছে, নাইট সঙ্গে সঙ্গে খুশি হলেন এই ভেবে যে, ভদ্রলোক তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেও তাঁর প্রেমিকার দেহ খুন করতে পারে নি। আর তার প্রেমিকাও তাঁর অক্ষত সতীত্ব রক্ষা করে আসছে তার জন্যে। এইসব কথা ভেবে নাইট এবার তার প্রেমিকাকে বললেন, ‘তাহলে তো ভালই হলো প্রিয়তমা। তুমি অন্য একটি মেয়েকে ওর পাশে শোয়াতে পারবে না? তোমার বাড়ির পরিচারিকা কিংবা অন্য কোনো মেয়ে যে কিনা তোমার হয়ে প্রের্ণ দিতে পারে!’

“উত্তম প্রস্তাব!” ভদ্রমহিলা আনন্দে নেচে উঠলেন। চট্টজলদি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর ব্যক্তিগত তরুণী পরিচারিকাকে কাছে ঢেকে বললেন, “তোমার জন্যে আমি তো অনেক কিছু করেছি। এবার তুমি আমার একটা উপকার করবে?”

“বেশ তো কি করতে হবে বলুন,” পরিচারিকা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে বলে উঠল, “আপনার হৃকুম মতো কাজ করতে আমি এক পায়ে খাড়া।”

“তাহলে শোনো বাছা, ভদ্রমহিলা অতঃপর তাঁর কাজের কথাটা চটপট সেবে নিতে চাইলেন”, এ যে নাইট ভদ্রলোককে দেখছ, “দূরে নাইটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন তিনি, “আজ উনি আমাদের অতিথি হলেও শুর সঙ্গে আমার ভালবাসা দীর্ঘদিনের। ঘটনাচক্রে, বলতে পারো আমার অধৈর্যপনার দরকাই শুর সঙ্গে আমার বিয়েটা হতে পারে নি। তাই শুর সঙ্গে আমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে হবে, আর সেটা আমি গোপনে সারতে চাই, আজ রাতেই। সেজন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, আজ রাতে বিছানায় আমার জায়গায় তুমি শোবে। আমার স্বামী, মানে তোমার মনিব, রাতে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে আমার গায়ে একটু হাত রেখে থাকেন, তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। হ্যাঁ, উনি যখন তোমার গায়ে হাত রাখবেন, তুমি একটুও নড়ে না। কথাও বলবে না, শ্রেফ চুপটি করে শুয়ে থাকবে। দেখো, এমন কোনো কাজ করবে না, মানে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো! আমার স্বামীর স্পর্শ সুখ পেয়ে উত্তেজনাবশে এমন কোনো কাজ করবে না যাতে তিনি টের পেয়ে যান, আমি তার পাশে শুয়ে নেই, আমার বদলে তুমি”

পরিচারিকা জিভ কেটে বলে, “ছিঃ ছিঃ আমি কেন অমন খারাপ কাজ করতে যাব? তাহলে তো আপনার সঙ্গে বিষ্ণ্঵স-ঘাতকতা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আমার তরফ থেকে কোনো অন্যায় কাজ হবে না।” এই কথা বলে রাজী হয়ে গেল পরিচারিকা।

রাতে ভদ্রমহিলার স্বামী এবং প্রেমিক নাইট যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শেষ করে আর এক দফা মদ্যপান সাঙ্গ করে এ ওর কামরার দিকে পা বাঢ়ালেন।

মনিব পত্নীর নির্দেশে অঙ্ককারের মধ্যে ভদ্রলোকের শয়নকক্ষে পরিচারিকাটি লুকিয়ে বসেছিল। এক সময় সেই ভদ্রলোক রোজকার অভ্যাস মতো বিছানায় শুয়ে পড়লেন ঘরের আলো নিভিয়ে। পরিচারিকাটি প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘরের আলোটা নিভে যেতেই শুটি শুটি পায়ে বিছানায় উঠে ভদ্রলোকের পাশে শুয়ে পড়ল একটু পরেই। ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়তেন। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। পরিচারিকাটি ভয়ে সিঁটকে রইল, তখন তার মনিব ঘুমের ঘোরে তার গায়ে হাত রাখলেন, তাকে চিনতে পারলেই সমৃহ বিপদ, কেলেক্ষারির একশেষ একেবারে।

ওদিকে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়ামাত্র ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তার প্রেমিক নাইটের ঘরের উদ্দেশ্যে। একটু পরেই দেখা গেলো নাইটের পাশে ভদ্রমহিলা এবং স্বামীর পাশে পরিচারিকা শুয়ে আছে। ভদ্রলোক প্রায় সারাটা রাত ঘুমিয়ে কাটালেন। নাইট কিন্তু সারা! রাত জেগে রইলেন, ভদ্রলোকের স্ত্রী মানে তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে স্ফুর্তি করে প্রায় সমস্ত রাতটাই কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু—

ভদ্রলোক অভ্যাস মতো নিজের স্ত্রী ভেবে ভোর রাতে হাত রাখলেন তরুণী

পরিচারিকাটির গায়ে। আজ হঠাৎ তাঁর হাতটা গিয়ে পড়ে পরিচারিকার বুকের ওপরে। চমকে উঠলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ঘূম গেলো ভেঙে। অঙ্ককার ঘর, কিছুই দেখা যায় না। তবে সেই অঙ্ককারেই মেয়েটির বুকে হাত রেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়েটির স্তন দুটি, সুউচ্চ চূড়ার মতন আর একটু যেন মাংসল। খানিক পরেই তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে স্তনের বৃন্ত দ্বয় আরো বেশি শক্ত হয়ে উঠলো। কেমন যেন সন্দেহ হলো ভদ্রলোকের। তিনি তাঁর সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্যে মেয়েটি বুকের ওপর রাখা হাতটা ধীরে ধীরে নিচে, নাভীর অনেক নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন, একেবারে মেয়েটির গোপন অঙ্গের প্রান্ত ভাগে তাঁর চখ্বল হাতটা এসে ঠেকলো এক সময়। মেয়েটির দুই উরুর সঞ্চিহ্নল অসম্ভব ফোলা-ফাঁপা, একটু বেশি মাংস যেন সেই জায়গাটায়। সেখানে হাত রেখে তিনি বুঝলেন, না, কোনো মতেই এ তাঁর বৌ হতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ভাবলেন ওরা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে চালাকি করেছে। মনে মনে তিনি ভাবছেন, একটু ধৈর্য ধরে দেখা যাক, ওরা কি করে—

ওরা দুজনে এমন কি করতে পারে সেটা অনুমান করে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে না থেকে তিনিও সুন্দর করে একটা চুমু দিলেন মেয়েটির সিঙ্গ ঠোঁটে। মেয়েটি প্রথমে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকলেও ভদ্রলোকের ক্রমাগত চুমুর প্রত্যুষ্মারে বুঝি বা সে-ও একবার তার মনিবের ঠোঁটে চুমু খেয়ে ফেলল। শুধু তাই নয়, দু'হাত দিয়ে সে তার মনিবের গলা জড়িয়ে ধরল আবেশে, উত্তেজনায়। তরুণী পরিচারিকার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে এরপর ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক যা যা করতেন, মেয়েটির সঙ্গেও ঠিক তাই করতে শুরু করলেন এক এক করে। প্রথমেই মেয়েটিকে পোষাকমুক্ত করে নিজেও তিনি পোষাকমুক্ত হলেন। তারপর দুটি দেহ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভূমিকম্পের মতো দুজনের দেহ থরথর করে কেঁপে উঠতে থাকল, সেই সঙ্গে বিছানাটাও !

সেই অবস্থায় চৰম উত্তেজনাময় মুহূর্তে উপনীত হওয়ার আগে ভদ্রলোক চিৎকার করে বলে উঠলেন, “নাইট মশাই, আপনি কোথায় ? কি করছেন ! আপনিও কি আমার মতো—”

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন নাইট। সেই সঙ্গে ভদ্রমহিলাও আঁতকে উঠলেন। তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন স্বামীর কাছে। তাহলে এবার কি হবে ?

সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক আবার জোরে হাঁক দিলেন, “কথা বলছেন না কেন নাইটমশাই ?”

“নাইট এবার জবাব দিলেন, “কেন, কি হয়েছে ?”

আমি আপনাদের একটা সুখবর দিতে চাই, এ ধরনের বিনিময়ে আমি খুব আগ্রহী, আমি খুব তৃপ্তি পাচ্ছি !”

“কিসের বিনিময়ে ?” নাইট তো শুনে থ।

“কেম, এই সহজ কথাটা বুবলেন না ? এই যে বিনিময় করেছেন আজ
রাতে ! একটি প্রোটা, বিবৰ্ণ, অসতী, বহুব্যবহৃত মহিলার বিনিময়ে যে টাটকা, তাজা,
আমার কথার বাধ্য আর আমার মনের মতো মেয়েটিকে দিয়েছেন, তার জন্যে আমি
ধন্যবাদ জানাচ্ছি । সত্য কথা বলতে কি জানেন নাইটমশাই, বিয়ের পর এতো আনন্দ
আমি কখনো পাইনি । এই অভূতপূর্ব আনন্দ পাইয়ে দেবার জন্যে আর একবার
আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।”

ওদিকে তরুণী পরিচারিকাটি হতবুদ্ধি হয়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলো ভদ্রলোকের
ভারী শরীরের নিচে । এটাই তার প্রথম এ ধরনের সুখ প্রাপ্তি । তাই স্বভাবতই
ভদ্রলোকের থেকে একটু বেশি অভিভূতা সেও ।

তোর হয়ে আসছিল । নাইট তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ে কোনো রকমে
গায়ে পোষাক চাপিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন । তারপর এক লাফে তাঁর
ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন নিম্নে । এমন কি ভদ্রলোক ও
ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলেন ।

